সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal
ISSN:2394 4889,
Vol. : 1, Issue : 1, 21 February 2015

Chief Editor : ***Dr. Jaygopal Mandal***
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Sub-Editor : ***Dr. N. K. Singh (Hindi) & M. K. Pandey (English)***

Advisory Board :
Dr. Tapas Basu, Dr. Sudha Goswami, Dr. Subrata Kumar Pal, Dr. Prakash Kumar Maity, Dr. S. P. Singh, Dr. Suranjan Middey, Dr. Sudip Basu, Dr. J. M. Lugun, Dr. K. Bandyopadhyay.

Editorial Board :
Dr. Sharmila Banerjee, Dr. Sanjay Kumar Singh, Raju Ram, Rajeev Pradhan, Dr. Bhrigunandan Singh, Dr. G. K. Pathak, Sharmistha Acharyya, Sabyasachi Mandal, Sukumar Mahanta, Satyam Chatterjee, Dr. Ratna Kumari, Sumita Das, Suresh Singh Munda, Vijay Aind, Rajani Sukeshi Bera.

© Dr. Jaygopal Mandal

Type Setting :
Manik Kumar Sahu
Kolkata - 152
Phone : 9830950380

Price : *₹ 150.00*

Published by :
Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand
Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
Website : www.sahityaangan.com

CONTENTS

BENGALI VERSION :

1. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ঃ দেবতারে প্রিয় করি — ড. শোভনা ঘোষ /9
2. ie›`bv‡_i wekcwiµgvq nv‡½wi—†mŠMZ g‡Lvcva¨vq /17
3. প্রকৃতি ও স্থাপত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে— শর্মিলা ব্যানার্জী /23
4. ÔmeRcÎÕ- ce t ie›` †QvUM‡í cwZev`—¯cb Kgvi Avk /31
5. বিশ্ব-ছোটগ-ল্পর ধারা ও রবীন্দ্রনাথ—পীযূষকান্তি অধিকারী /37
6. জাতীয়তাবোধের উৎস সন্ধানে বাংলা উপন্যাস—দেবাশিস মল্লিক /46
7. উনিশ শত-কর কলকাতার কড়চা ও হু-তাম প্যাঁচার নকশা—মিষ্টু সামন্ত /51
8. জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প ঃ আরো এক বিপন্ন বিস্ময়—উত্তম গিরি /58
9. শব্দচয়নে অনন্যতা ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে—ড. প্রকাশ কুমার মাইতি /67
10. বোধ ও অস্তিত্বের তটরেখায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়—সোমা মুখার্জী /70
11. আল মাহমুদের 'নীল নাকফুল' ঃ সিঃসঙ্গ প্রেমের অনুরণন—নাসিরউদ্দিন পুরকাইত /74
12. 'মিথ'-এর কাব্যরূপ—পুতুল বৈদ্য /78
13. Kwe †gwnZ P‡Ævcva¨vq I Zvi wbewPZ KweZvi wbweo-cvV I we‡k-lY—¯ivR Kgvi `vk /84
14. অলঙ্কার-এর সহজপাঠ—ড. জয়গোপাল মণ্ডল /90

HINDI VERSION :

1. **संथाली भाषा–साहित्य और जीवन का इतिहास–सुरेश सिंह मुंडा** /101
2. **सुभद्राकुमारी चौहान के कथा–साहित्य में राष्ट्रीय चेतना–डॉ0 संजय कुमार सिंह**/109
3. **सूरदास एवं नंददास के साहित्य में ब्रजभाशा का स्वरूप–निलेश कुमार सिंह**/120
4. **ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में यथार्थवादी चेतना–डॉ० राजू राम** /128

ENGLISH VERSION :

1. **Romantic Tradition and Shelley–Dr. Gagan Kumar Pathak** / 133
2. **Challenges in Teaching English Language at Under-Graduate level in Jharkhand–Vijay Aind / 140**
3. **Humanitarian Compassion and Humanistic Conviction in Mulk Raj anand's Novels : Untouchable an Coolie–Mantosh Kr. Pandey /148**
4. **Dr. Bhabani Bhattacharya as a Novelist– Kamruddin Miyan/150**
5. **Environmental Awareness in Classical Sanskrit Literature–Rajeev Pradhan /155**

EDITORIAL

Literature is the mirror of the mind of Individuals; It reflects the feelings and emotions. Journal is the medium of those expression. From the 19th century literatary critics developed and enriched through the periodical Journals (Samaik Patra). By the blessing and application of modern technology edition of Periodical journals are at large number. ''Sahitya Angan", a trilingual Journal is an addition to this chain. The feelings, emotions, creation and criticism of literature will be published in Bengali, Hindi and English. In the first edition importance has been given to the all section of literature.

The system of joint family collapsed and nuclear system of families has been formed due to the respectable ladies, who are our mother and sister are harassed sexually and other aspects every day, now and then, individuals are becoming selfish & opportunist. At this juncture the reestablishment of literary criticism and new fundamental creativity can be able to force the individuals from loneliness and make him polite, selfless and also social being in true sense of the term.

Linguistic differences and emotions create a division among citizens of our country. So need of the hour to established morality, harmony and coordination among all languages and people of our country. This journal, "Sahitya Angan", we started a journey to bridge the gap among International, National and provincial Languages. Put your life in the lives my friends with painful heart, as the moonlight in the moon in the sky at night, the life-boat in the dream water with tears beside the river, as the baby plays with silence in his mother. So I speak in my language :

জীবনে জীবন রাখ বন্ধু আমার ব্যথা ভরা কলসে
চাঁদের মাঝে চাঁদনি যেমন রাতের আকাশে,
স্বপন-জলে মানস-তরী কান্না-ভেজা নদীর খোলে,
মায়ের গর্ভে শিশু যেমন নীরবে খেলে।

ফুলের কুড়ি নতুন প্রাণে তিলক-ধ্বনি বাজে
উথাল পাথাল রাধা যেমন কৃষ্ণ প্রেমে মজে,
বৃষ্টি হবে জেনেই তো চাতক পাখি কাঁদে
সকাল সন্ধ্যে আমরা দেখি রঙীন সূর্য ফাঁদে।

উদয়-অস্ত রক্ত লেখায় মেঘ ফাটা ফাগুনে
চাষের মাটি খড়ের গাদা জ্বলে বীজ আগুনে,
নাড়ীর যোগ আলগা এখন ভাসে সমুদ্দুরে
বে-লাগাম মুখের ভাষা গ্রামকে খায় শহর-রে।

থাক তুমি বিশ্বাসে তারা যেমন আকাশ ভরে
ঘন্টা ফন্টা থাক পড়ে বন্দীশালা আঁধার ঘরে,
রক্তমাখা হিংসা ভরা শকুন-ওড়া মৃত্যু-ক্ষেতে
আপন বিবেক সজীব করো বিবেক-চেতন স্রোতে।

Dr. Jaygopal Mandal
Chief Editor
21st February, 2015

BENGALI VERSION

।। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ঃ দেবতারে প্রিয় করি ।।

ড. শোভনা ঘোষ

বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি শক্তিশালী সাহিত্য-শাখা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই প্রাণবন্ত সাহিত্য-ধারাটি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে একেবারেই শুকিয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী সমাজ পদাবলীকে চর্চার যোগ্য বলেই মনে করতেন না। ফলে এ সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অতুল ভাব ও ভাষার ভান্ডার একরকম অনাদরেই পড়েছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার সম্ভব হয়েছিল। এরমধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি পড়েই রবীন্দ্রনাথ পদাবলী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর নিজের কথায় "আমার বয়স যখন তেরো-চোদ্দ, তখন থেকেই আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করত।"[১] সেই কিশোর বয়স থেকেই তিনি পদাবলীর উৎসুক পাঠক ছিলেন। পদাবলীর ধ্বনি-সৌন্দর্য, ছন্দ-তরঙ্গ ও চিত্রময় শব্দ জগৎ কিশোর কবিকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর রূপসম্পদ ও ভাবসম্পদ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যে মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গ, ভাবানুষঙ্গ কিম্বা গভীর, নিভৃত উপলব্ধি। কিশোর বয়সে মূলত পদাবলীর বহিসৌন্দর্য্য, বিশেষত ব্রজভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করে। তারই ফলশ্রুতি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এক মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশে তাঁর লেখনী চিত্রিত করল পদাবলীর অপার্থিব, মায়াময়, সুন্দরের কল্পলোক—"গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৮৮৪ খ্রীঃ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। মোট কুড়িটি খন্ড কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি একই সময়ে লেখা হয়নি। কবির ষোল থেকে চব্বিশ / পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে এগুলি রচিত। কবি জানাচ্ছেন—"ভানুসিংহের পদাবলী ছোট বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। পদের মধ্যে ভাল-মন্দ সমান দরের নয়।"[২] এই কবিতাগুলি কবির অল্পবয়সের আবেগ ও মুগ্ধতা থেকে জাত। তাই পরিণত বয়সে তিনি এই কাব্যের একজন নির্মম সমালোচক। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কাব্য বিষয়ে আপন সঙ্কোচ প্রকাশ করেছেন। যেমন—'জীবনস্মৃতি'-তে বলেছেন—"ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।" আবার, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থের সূচনায়ও একই নিন্দার সুর—"একথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমতো নকল করতে হলে শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। ... এইজন্য ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সঙ্কোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করি।"

ভানুসিংহের কবিতাগুলি কি সত্যিই মেকি। অক্ষম অনুকরণ ! কেবল পদাবলীর রূপসৌন্দর্যকে নকল করেছেন ! সত্যিই কি তার অন্তর্গত সুরে কোনো খাঁটিত্ব নেই ! কুড়িটি পদ পাঠ করে কিন্তু এই পদাবলীকে কখনোই এমন নকল বা সস্তা বলে মনে হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর বসন্ত, বর্ষা, চন্দ্রালোকিত রাত্রি, গহন অরণ্য, উচ্ছল যমুনা, সুসজ্জিত কুঞ্জকুটীর—ঊনবিংশ শতাব্দীর এক কিশোর পদকর্তার কলমে যথার্থ চিত্রায়িত হয়েছে। আনন্দে - আবেগে - বিরহে - অভিসারে - বিষন্নতায় - অভিমানে - আক্ষেপে রাধা পদাবলীর সেই আদি-অকৃত্রিম বৃন্দাবন-বালিকা। বরং কয়েকটি পদে রাধার স্বাতন্ত্র্য গতানুগতিকতার মধ্য থেকে অশনিসংকেতের মত ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ কালের নারীব্যক্তিত্বের আভাস দিয়ে যায়। তাঁর ভাষা, ছন্দ কখনো বিদ্যাপতি, কখনো গোবিন্দদাস,

এমনকি কখনো জয়দেবকেও মনে করিয়ে দেয়। পদাবলী সাহিত্যের নিপুণ গবেষকের চোখে নবীন পদকর্তা ভানুসিংহের অনেক দোষ-ত্রুটি ধরা পড়বে। কিন্তু সাহিত্য উপভোক্তা অবশ্যই এই পদগুলির মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় পদাবলী সাহিত্যের অপার সৌন্দর্য জগৎ, তাল-তমাল ঘেরা ছায়াঘন বৃন্দাবন পল্লী প্রান্তর, এক রাখাল বালকের প্রাণ - কেমন করা বাঁশীর সুর, সর্বোপরি প্রেমপরিপূর্ণা, আনন্দ-অশ্রুসজল এক ব্রজবালিকার সন্ধান পাবে। আর সেটুকু সন্ধান করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থটির কুড়িটি কবিতাই স্বতন্ত্র কবিতা। পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে তিনি লেখেননি। তবে কবিতাগুলি পড়লে কোনটিতে অনুরাগ, কোথাও অভিসার, মান, মিলন, মাথুর, আক্ষেপ, কোথাও বা প্রেমবৈচিত্ত্যের ভাব ভাবনাকে অনুভব করা যায়। প্রথম পদ থেকে ষষ্ঠ পদ পর্যন্ত পদগুলিতে একটি ঘটনা ও ভাবক্রম, সপ্তম পদ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত অরেকটি এবং ত্রয়োদশ থেকে বিংশতি পদ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পদ শুরু হচ্ছে বসন্ত বর্ণনা দিয়ে। প্রকৃতি জুড়ে বসন্ত এসেছে—

বসন্ত আওল রে !
মধুকর গুণগুণ, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে !

এমন বসন্তে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার হাহুতাশ বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়। জয়দেবও 'গীতগোবিন্দ'-এ বসন্তের আবির্ভাবে মদনযন্ত্রণাকাতর রাধার বর্ণনা দিয়েছেন—

বসন্তে বাসন্তী কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈর্ভ্রমন্তীং
কান্তারে বহুবিহিতকৃষানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী।।

বিদ্যাপতির রাধাও কাতর কণ্ঠে বলেছে—

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইবে।
মলয়ানিল হিম শিখরসি ধাবল
পিয়া নিজদেশন আওইবে।।

ভানুসিংহের রাধাও নববসন্তে প্রিয়তমের শূন্যতা অনুভব করেছেন—

কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি বসন্ত সো মাধা ?

কিন্তু ভানুসিংহের রাধা অনেক বেশী আত্মসচেতন। তাঁর আত্মলীন প্রেমানুভূতি এ পদে কম। তিনি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। এই পদের প্রথমাংশে রাধা অনুভব করছেন তাঁর মরমেও বসন্ত এসেছে। সখীকে বলছেন—

শুনশুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জরজর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।।

রাধার এই কৃষ্ণনিরপেক্ষ আত্মভাবনার প্রকাশ দেখা যায় তৃতীয় পদে। সেখানে কৃষ্ণের জন্য রাধা সারারাত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ছিলেন—"বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী, / নহি নহি আওল কালা।" তাই এ জীবন, যৌবন, এই

স্নেহ-প্রেম সবই মিথ্যা। এমন অনুতাপ ব্যথার পরেই রাধা বলছেন—

চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল,
চল সখি চল গৃহকাজে।

কৃষ্ণের অদর্শন ঘটলে রাধা অনায়াসেই চোখের জল মুছে আপন কাজের কথা ভাবতে পারেন। অষ্টাদশ পদেও দেখি, রাধা সখীর সঙ্গে আলোচনা করছেন, তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণ কি রাধার জন্য ব্যাকুল হবেন ! মনে হয় না। কারণ—

না যমুনা, সো এক শ্যাম মম,
শ্যামক শতশত নারী
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।

রাধা - অবর্তমানে কৃষ্ণের যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে এমন অকরুণ প্রেমিকের জন্য দেহত্যাগ করে লাভ কি?

তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে
কাহ তেয়াগব দে ?

এইসব পদে ভানুসিংহের রাধা পদাবলীর রাধার থেকে পৃথক। পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে স্ব-অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারেন না। কৃষ্ণ হৃদয়হীন হলে রাধা মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। চন্ডীদাসের রাধা বলেছেন—

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।

বিদ্যাপতির রাধারও একই কথা—

বড় দুখ রহল মরমে
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।

এই কয়েকটি পদ ছাড়া অন্যত্র পদাবলীর রাধার মত ভানুসিংহের রাধাও কৃষ্ণগত প্রাণা, কৃষ্ণের প্রতি স্নেহে - প্রেমে - মানে - অভিমানে একই করুণ-বিধুর মূর্তি। সখী যখন বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজেও কৃষ্ণকে পায় না, তখন রাধা মাথুরের নায়িকা। তার "কুসুমহার ভইল ভার—হৃদয় তার দাহিছে", "অধর উঠই কাঁপিয়া", তার 'চকিত হৃদয়', 'শিথিল অঞ্চল', 'চোখে অশ্রু'। পদের শেষে (দ্বিতীয় পদ) যখন পদকর্তা বলেন—

কুঞ্জপানে হেরিয়া
অশ্রু বারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে !

তখন রাধার অন্তরের শূন্যতার হাহাকার মনে করিয়ে দেয় বিদ্যাপতির রাধার আকুলতা—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন্য ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি।।

বিরহের পাশাপাশি একই সঙ্গে প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর শোনা যায় তৃতীয় পদটির মধ্যে। শ্যামকে দেখার জন্য ভানুসিংহের রাধার প্রাণ দিনরাত তৃষিত হয়ে আছে। তাঁর "আকুল জীবন থেহ ন মানে / অহরহ জ্বলত হতাশে।" বিদ্যাপতির রাধাও যেমন একই ভাবে বলেন—"পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।" ভানুসিংহের রাধা এরপরেই মিলন সুখ স্মরণ করছেন আর পরক্ষণেই মাধবকে হারানোর আশঙ্কায় আকুল হচ্ছেন—

সজনি, সত্য কহি তোয়,

খোয়ব কব হম শ্যামল প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়।

একই পদে বিরহ, মিলন সুখ স্মরণ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ প্রকাশিত।

চতুর্থ ও সপ্তদশ পদে রাধার সখীর মথুরায় কৃষ্ণের কাছে দৌত্যকার্য, পঞ্চম পদে কৃষ্ণের আগমন আশায় রাধার কুঞ্জসজ্জা ও অঙ্গ-প্রসাধন, ষষ্ঠ ও একাদশ পদে রাধাকৃষ্ণের মিলন—সবই পদাবলীর আবহকে নিখুঁতভাবে ধরে রাখে। মিলনের আনন্দে ভানুসিংহের রাধা বলেছে—

তুঝ মুখ চাহয়ি শত যুগ ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান - অভিমান।

যেমন, গোবিন্দদাসের রাধা অনেক বাধাবিঘ্নসংকুল পথ পেরিয়ে শ্যামকে পেয়ে গভীর আনন্দে বলে ওঠেন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।

একাদশ সংখ্যক পদটি ও মিলনের। এখানে পদকর্তার বাক্‌সংযম প্রশংসনীয়। মধুময় চাঁদনী রাতে রাধা-কৃষ্ণের "বচন মৃদু মরমর / কাঁপে রিঝ থরথর / শিহরে তনু জরজর / কুসুম বনমাঝ।" শুধু এটুকুই। তাদের মিলনের আনন্দ কবি বুঝিয়েছেন পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির হিল্লোলিত বর্ণনা দিয়ে—

ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা হবে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল—
ভানু মরি যায়।

অভিসারের পদরচনায় ভানুসিংহ সুন্দর ও সাবলীল। সপ্তম, অষ্টম ও ত্রয়োদশ পদে রাধার ও চতুর্দশ পদে কৃষ্ণের অভিসার বর্ণিত। সপ্তম পদে চন্দ্রালোকিত রজনী, অষ্টম পদে বসন্তের প্রেক্ষাপট, আর ত্রয়োদশ পদে ঘনঘোর বর্ষা-নিশীথে রাধা অভিসারে বেরিয়েছেন। চতুর্দশ পদে কৃষ্ণ অভিসার করেছেন এক দুর্যোগময় রাত্রে। এইসব পদে পদাবলীর মাধুর্য, সৌন্দর্য—সবই ফুটে উঠেছে। সপ্তম পদে রাধার ত্রস্ত, শিহরিত, আনন্দিত রূপমূর্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি,
শরম ভরম গয়ি দূর।

এই পদের দুটি অংশের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর মিল পাওয়া যায়। সখিকে রাধা বলেছে—

কত কত যুগ সখি, পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তব তো মিলল সখি, শ্যাম রতন মম,
শ্যাম পরানক প্রাণ।

বহু পুণ্যফলে শ্যামকে পাওয়া গেছে, এমন উক্তি বৈষ্ণবপদকর্তাদের রাধা অনেক স্থানে করেছে। যেমন, চন্ডীদাসের অভিসারের পদে রাধা বলেছে—

সই, কি আর বলিব তোরে
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।

আর আছে শ্যামনাম জপের কথা— "শ্যামরে, / শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি / জপত জপত তব নামে ...।" পড়তে পড়তে চন্ডীদাসের রাধার কন্ঠ শোনা যায়—"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো / কেমনে পাইব সই তারে।"

অষ্টম পদটি কবির আদি রচনা। পদটি যেন ফুলের মত স্তবকে স্তবকে সজ্জিত—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাসে লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।

পদটির শব্দবিন্যাস ও ছন্দমাধুর্য গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে তুলনীয়—

শরদচন্দ পবনমন্দ। / বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ।।
ফুল্লমল্লিকা মালতি যূথি। / মত্ত মধুকর ভোরণি।।

নবম পদে ভানুসিংহের ছন্দ জয়দেব অনুসারী—

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষন্ন।।

আর জয়দেব বলেছেন—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়িত শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্।।
ত্রয়োদশ পদে রাধার বর্ষাভিসার।

মেঘমেদুর রজনী। শব্দে-ছন্দে অপূর্ব চিত্র রূপায়িত—

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত,
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুৎ, পথতরু লুণ্ঠত,
থরথর কম্পত দেহ।।
ঘনঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

বর্ষাভিসারের এমন রাতের চিত্র বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস আর গোবিন্দদাসে পাওয়া যায়।

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।। (রায়শেখর)

কিংবা,

ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম মরি যাত।। (গোবিন্দদাস)

চতুর্দশ পদে কৃষ্ণ ও 'বাদর বরখন, নীরদগরজন, বিজুলী চমকন ঘোর' রজনীতে রাধার কাছে এসেছেন। রাধা আনন্দিত, একই সঙ্গে প্রিয়তমের ক্লেশে নিজেও ক্লিষ্ট। তাই কতভাবে যে কৃষ্ণকে তিনি সেবা করবেন, তার কষ্ট লাঘব করবেন—সে চিন্তায় অধীর। এ রাধারও চন্ডীদাসের রাধার মত 'আঙিনার মাঝে' বঁধুয়াকে ভিজতে দেখলে পরাণ ফেটে যায়। গোবিন্দদাসের পদে কৃষ্ণের সংকেত কুঞ্জে বহু কষ্টে রাধা এলে, কৃষ্ণ রাধাকে স্নেহে, সেবায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন—

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি।।

আর ভানুসিংহের রাধা বলেছে—

বইস বইস পহু, কুসুম শয়ন 'পর
পদযুগ দেহ পসারি—
সিক্তচরণ তব মোছব যতনে
কুন্তল ভার উঘারি।

রাধার আন্তরিকতায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। প্রিয়তমের শারীরিক কষ্টে রাধা যেমন কাতর হন, তেমনি তাকে কটুবচনে ব্যথা দিয়ে কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা বেশি ব্যথা পান। পঞ্চদশ পদে রাধা কৃষ্ণকে কপট, ছলনাকারী, মিথ্যাভাষী ব'লে ধিক্কার দেওয়ার পরমুহূর্তেই ব্যথিত হয়ে বলেছেন—

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ
ক্ষমহ গো কুবচন মোর।

ভানুসিংহের কয়েকটি পদে নতুন কিছু উপলব্ধির সুর পাওয়া যায়। যেমন দশম পদে রাধা কৃষ্ণকে আরো নিবিড় ভাবে পাওয়ার জন্য দখিনা বাতাসে প্রাণ মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন, কারণ সে বাতাসে কৃষ্ণের বাঁশী বাজে, রাধা বাতাস হয়ে বাঁশীর মাধ্যমে সর্বক্ষণ কৃষ্ণসঙ্গ পাবেন।

বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়
রাধাময় তব বেণু।

দ্বাদশ পদে কুঞ্জে নিদ্রিত কৃষ্ণের দিকে অপলক নয়না রাধা তাঁর রূপবর্ণনা করছেন। মিলনের পরে কুঞ্জে নিদ্রিত রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা কত কবিই তো করেছেন, কিন্তু দয়িতার চোখ দিয়ে ঘুমন্ত দয়িতের রূপ নিরীক্ষণ ভানুসিংহের কাছেই প্রথম পেলাম—

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধর মে
হাস বিকশিত কায় ?
কোন্ স্বপন অব দেখব মাধব
কহবে কোন্ হমায় ?

ষোড়শ পদটি ভানুসিংহের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ। ঊনবিংশ পদে মরণকে শ্যামের সঙ্গে তুলনা এবং বিংশ পদ 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' ভাবগত দিক থেকে অনবদ্য। কিন্তু ষোড়শ পদটিতে কবিতার আঙ্গিক ও ভাবনা একে

অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এক সখী অন্য সখীকে বলছে, রাধা যখন জানতে পারলেন কৃষ্ণ মথুরায় যাবেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—

রোয়বে না সো, না দিবে বাধা—
কঠিন হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করক বিদায়।

কিন্তু মাধব যখন মৃদুগতিতে তাঁর কাছে এলেন, তখন রাধা অপলক চেয়ে রইলেন, অশ্রু কোনো বাধা না মেনে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ল—

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন পান তছু চাহল রাধা,
তাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দন্ড দন্ড সখি, চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি, নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।

রাধার প্রতিক্রিয়ার এই ক্রমান্বয় বর্ণনা, ছন্দের বিলম্বিত গতি, একই শব্দের বারংবার প্রয়োগ—রাধার ভাব প্রতিমাকে মূর্ত করে তোলে পরতে পরতে। তারপরই সব প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল। উচ্ছ্বসিত আবেগ অশ্রুতে ভেঙে পড়ল—

গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,

কৃষ্ণের আদর বা আশ্বাসবাণী—কোনোটাই রাধাকে প্রবোধ দিতে পারল না। ভূমিতে পড়ে, শ্যামের চরণ ধরে কেঁদে কেঁদে তার রাত ফুরিয়ে গেল। কৃষ্ণকে রাধা বলেছেন—

তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন্ হমার।

রাধার যে কৃষ্ণ ছাড়া আর কেই নেই, সে যে বড় অসহায়—এই পদে ভানুসিংহ সেই আর্তি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পদকর্তার ভূমিকা। ভানুসিংহ রাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। পূর্বোক্ত পদের শেষে কবিও রাধার সঙ্গে চোখের জল ঝরিয়েছেন—"বরখি আঁখিজল ভানু কহে ...।" চৈতন্য পূর্ব কবি বিদ্যাপতি, চন্ডীদাসের ভনিতায় মঞ্জরীভাবের সেবাবাসনার কথা পাওয়া যায় না। চৈতন্যোত্তর কবি গোবিন্দদাসে তা আছে। ভানুসিংহ তাঁর প্রায় প্রতিটি পদে রাধার মানসিক অবস্থার সঙ্গী হয়েছেন। কখনো অভয় দিয়েছেন, কখনো রাধার হয়ে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেছেন, কখনো বা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছেন, এমনকি রাধার অভিসার পথের সঙ্গী হয়েছেন। যেমন, তৃতীয়পদে প্রাণত্যাগে ব্রতী রাধাকে আশ্বস্ত করছেন—"ঐসা বৃথা ভয় না কর বলা / ভানু নিবেদয় চরণে।" চতুর্থ পদে—"তৃষিত নয়ন ভানুসিংহ / কুঞ্জ পথম চাহিয়া।" আর সপ্তম পদে—

নীদ মগন মহী, ভয় ডর কছু নহি
ভানু চলে তব সাথ।

এই ভরসাবাণী শুনিয়েছেন গভীর রাতের অভিসারিকাকে।

যে কুড়িটি কবিতায় এহেন ভাব-পরিবেশ সৃজিত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এত কুণ্ঠা কেন ? কবির নিজের কথায়—"পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।"[৩] বৈষ্ণবপদাবলীতে আঙ্গিকগত শিল্পসৌন্দর্য যেমন আছে তেমনি তার অন্তর্লোকের আধ্যাত্মিক সাধনা ও গভীর ভাবও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের পদগুলিতে সেই বৈষ্ণবীয় রাগানুগা

ভক্তির সাধনা নেই। তাই হয়তো বৈষ্ণবপদাবলীর সাধন সঙ্গীতের একই পংক্তিতে ভানুসিংহের পদগুলিতে ঠাঁই দিতে তাঁর এত কুণ্ঠা।

কিন্তু "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?" বৈষ্ণবীয় সাধনা না থাকায় পদগুলি কি পরিত্যাজ্য ? সমালোচকের উক্তি যথার্থ—"ভানুসিংহের পদাবলীতে প্রাচীন বৈষ্ণবপদকর্তাদের ধর্মীয় সাধনা বা ভাবের আবেগ না থাকলেও কিশোর কবির রোমান্টিক প্রেমচেতনা এখানে রাধা-কৃষ্ণের রূপকের অন্তরালে ব্যক্ত হয়েছে, বৈষ্ণব কাব্যপাঠের প্রভাবে কিশোর কবির মন আরও অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবির ভাবভাষা ও ছন্দের আদর্শ কিশোর কবির অন্তরের প্রেমানুভূতি প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।"[৪]
অ্যাধ্যাত্মিক মূল্য যাই থাকুক না কেন, ভানুসিংহ তাঁর কবিতাগুলিতে দেবতাকে প্রিয় ও প্রিয়কে দেবতা করে তুলতে পেরেছেন।।

।। নির্দেশিকা ।।

১. রবীন্দ্রজীবনী (১ম)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃ.৭১)
২. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (সূচনা)
৩. ঐ
৪. রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম পর্যায়—ড. জলি সেনগুপ্ত (পৃ. ৫৬)

iex›`bv‡_i wekcwiµgvq nv‡½wi

†mŠMZ g‡Lvcva¨vq

1926 mv‡j iex›`bv‡_i BD‡ivc mdi we‡kl ¯§iYxq GB Kvi‡Y †h GB md‡i wZwb hZ¸wj †`k ågY K‡iwQ‡jb AZ¸wj †`kågY GKm‡½ Avi †Kvb mg‡q K‡ibwb| Zvi ågY ZwjKvq wQj BZwj, mBRvij¨vÊ, Aw÷qv, we‡Ub, biI‡q, mB‡Wb, †WbgvK, Rvgwb, †P‡Kv‡k-vfwKqv, nv‡½wi, †µv‡qwkqv, h‡Mvk-wfqv, ej‡Mwiqv, Mxm, BwRÞ, †ivgwbqv cfwZ †`k| GBme †`k¸wj‡Z Avgwš‍Z AwZw_ wn‡m‡e wM‡q †mLvbKvi gvbl‡`i Zvi cwZ fv‡jvevmv †`‡L AevK n‡qwQ‡jb| nv‡½wii evjvUb d‡iW †_‡K Kwe GK wPwV‡Z Zvi GBmg‡qi BD‡ivc mdi m¤‡Ü †ivgv †ivj¨v‡K Rwb‡qwQ‡jb-

In most of the places in Europe where I travelled I was surprised to discover what a great enthusiasm the people have for me. In course of time a bankruptcy of reputation may happen to me in the West where people get angry at their discarded fovourites when they imagine that they had cheated themselves by over payment and yet even if what I have experienced does belong to the moment, it is amazing in itself. I am not ambitious and therefore set much value on my immediate reward. But I feel confident that I have left enough legacy in my own language which has a permanent worth. And therefore in spite of the certainty of a reaction against this sudden popularity of mine, I feel that I have right to what has been offered to me by the West, that most of my work will bear lestimony to the fact that I have truly loved and therefore I can truly claim love not only for today but for the days to come.[1]

†ewkifvM †`‡kB wZwb Le †ewk mgq _vK‡Z cv‡ibwb| ZeI †mBme †`‡k Zvi Dcw¯wZ mwnZ¨ I Ab¨vb¨ †ÿ‡Î cwZwµqvi mwó K‡iwQj| GB me cwZwµqv¸wji †ewkifvMB wQj iex›` AbKj| wKš Zvi weiæ‡× cwZKj Av‡jvPbvI wQj| Gi g‡j iex›`mwnZ¨ I Rxeb m¤úwKZ AÁZv‡KB `wq Kiv hvq|

1926 mv‡j iex›`bv‡_i BD‡ivc åg‡Yi mgq nv‡½wi md‡ii w`‡K GKSjK `wócvZ Kiv †h‡Z cv‡i| GB md‡i Kwei m½x wQ‡jb cÎ i_›`bv_, cÎea cwZgv †`ex, Zv‡`i cwjZv wkï bw›`bx, mi‡ji wgt jvj, †MŠi‡Mvcvj †Nvl, wÎcivi ivRKgvi (whwb jvjKZv bv‡g cwiwPZ wQ‡jb), ckvšP›` gnjvbexk, ckvšP‡›`i ¯x wbgjKgvix (ivYx) gnjvbexk cgL|[2]

Kweiv BZwj, mBRvij¨vÊ, Aw÷qv, we‡Ub, biI‡q, mB‡Wb, †WbgvK, Rvgwb, †PKvk-vfwKqv N‡i nv‡½wi‡Z †cŠQvb| eWv‡c÷ kn‡ii Zid †_‡K †mLvbKvi wgDbwmc¨wjwU Kwe‡K wbgšY Rvbvq| Kweiv nv‡½wi‡Z _v‡Kb 26 A‡±vei †_‡K 13 b‡f¤i chš | 26 A‡±vei Kweiv eWv‡c÷ kn‡i(AviI wbLZfv‡e ej‡Z †M‡j ce eWv‡c‡÷i Keleti Palyaudvar) †cvQvb| Kwei m‡½ i‡q‡Qb cwZgv †`ex, ckvšP›` gnjvbexk, ivbx gnjvbexk Ges nv‡½wii cwÊZ e¨w³ Ferenc Zajti| Kwe‡K Af¨_bv Rvbv‡Z G‡jb eWv‡c÷ wmwU KvDwÝ‡ji cwZwbwa Dr Jeno Lobmayer, miKwi Uwi÷ Awd‡mi wW‡i±i Dezso Zilahi, Magayar Kulugyi Tarsasag(Hungarian Society of Foreign Affairs)-Gi †m‡µUwi Dr Jozsef Nezsi,

Zsolt Harsanyi cL¨vZ †jLK whwb Association of Hungarian Playwrights-Gi †cwm‡W›U| Harsanyi Zvi e³Zvq ej‡jb, ÔÔ It seems to us as if a dear relative has come to pay a visit to his relatives who had changed their residence long back." Petofi Tarsasag (Petofi Society), hviv Kwei nv‡½wi md‡ii cavb e¨e¯vcK wQj,Zv‡`i c¶ †_‡K Ferenc Zajti e³Zv w`‡jb| eWv‡c‡÷i me‡P‡q wejvmeûj †nv‡Uj Hotel Gallert-‡Z Kwe‡`i _vKvi e¨e¯v Kiv nq|

27 A‡±vei Kwe Concert Hangversenyvallalat R.T. bv‡g GKwU e¨w³MZ msMxZ ms¯vi e¨e¯vcbvq Civilization and Evolution e³ZwU w`‡jb| e³Zvi Av‡M Ferenc Zajti Kwei cwiPwZ `vb K‡ib Ges nv‡½wiqvb †jLK Gyorgy Kemeny Abev`‡Ki fwgKv cvjb K‡ib| e³Zvi †k‡l cie« †_‡K GKwU KweZv wZwb c‡o †kvbvbGes RbMYgb Awabvq K Rq †n MvIqv nq|

28 A‡±vei Kweiv kni †`L‡Z †ei nb| e`vi ci‡bv `‡Mi Fisher Bastion RvqMvwU †_‡K Kweiv kn‡ii m›`i `k¨ Dc‡fvM K‡ib| Gw`b nv‡½wiqvb PEN Club-Gi †cwm‡W›U Antal Rado Kwei m‡½ †`Lv K‡ib| Rado wQ‡jb GKRb Amvavi Y Abev`K| `v‡š, †cÎvK, †kKmcxqvi, †W‡dv, evqib, IqvBì, ivwmb, †M‡U, wkjvi cg‡Li iPbv Abev` K‡i‡Qb| wZwb MxK, jwUb, BZvwjqvb, Rvgvb, Bs‡iwR, divmx Ges cwmqvb fvlvq mcwÊZ wQ‡jb| wZwb Firdausi-Gi Shahname-i wKQ Ask Abev` K‡iwQ‡jb| eWv‡c÷ kn‡ii cwZwbwa I nv‡½wii ivRawbi wkí‡`i Zid †_‡K Kwei m¤§v‡b Hotel Gellert-†Z we‡kl Abôvb I wWbv‡ii e¨e¯v Kiv nq| Abôv‡b Otmar Sagodi-i ev`¨ mn‡hv‡M Ilona Hollos The Gardener †_‡K KweZv cvV K‡ib| ci‡bv n‡‡½wiqvb †jvKMxwZ MvB‡jb Imre Pallo Ges Mrs Izabella Nagyl Denes Sziji tarogato bvgK GKwU ev`¨hš ewR‡q †kvbvb| Miss Bella Body Ges Miklos Szegedy-Tatar bZ¨Kjv c`kb K‡ib| wRcwm wKs Bella Radic †envjv ewR‡q †kvbvb| Kwe GKwU evsjv KweZv cvV K‡ib, †hwU ZLbI †Kv‡bv we‡`wk fvlvq Abw`Z nqwb| †jLK Gyula Pekar, whwb 1920 mvj †_‡K Petofi Tarsasag-Gi ‡cwm‡W›U, Kwe m¤ú‡K Bs‡iwR‡Z e³Zv K‡ib| nv‡½wi miKv‡ii c¶ †_‡K (under-secretaries of state) Robert K. Kertesz Ges Pal Petry Dcw¯Z wQ‡jb|

HwZn¨gq w_‡qUv‡ii Kwe Feszek Klub-GKwe‡K 30 A‡±vei mÜ¨vq AvgšY Rvbv‡bv nq Hungarian PEN Club Ges Association of Hungarian Playwrights-Gi c¶ †_‡K| Kwe †mLv‡b GK N›Uv KvUvb| Antal Rado Ges Mneyhert Lengyel-Gi m‡½ mv¶vr K‡ib| †mLv‡b wewkó Professor Gyula Germanus Dcw¯Z wQ‡jb|[3]

Awekvg cwik‡g Kwei kixi `ej n‡q c‡o| GLvbKvi weL¨vZ Wv³vi e¨vib †KvivYx Kwe‡K cwZw`b †`L‡Z Avm‡Zb| W. I‡q¼ev‡Ki g‡ZvB mviv BD‡iv‡c †KvivYxi L¨vwZ wQj| Kwei ¯v¯¨ D×v‡ii Rb¨ evjvUb d‡i‡Wi KZc¶ Kwe‡K †mLv‡b Avgš¿Y K‡i wb‡q Av‡mb|GLv‡b Kwe‡K w`‡q e¶‡ivcY Kiv‡bv nj (8 b‡f¤i) hv wQj LeB m¤§v‡bi welq| GB Dcj‡¶ Kwe GKUv KweZv wj‡L w`‡qwQ‡jb †hwU GL‡bv Kwei Aveÿ gwZi GKav‡i †Lvw`Z Av‡Q,

†n Zi, G aivZ‡j iwne bv h‡e,

†mw`b em‡š be cj-‡e-cj-‡e

†Zvgvi ggi aŸwb cv_‡K‡i K‡e
fv‡jv †e‡mwQj Kwe †e‡PwQj h‡e|[4]
Avi GKwU dj‡K †Lv`vB Kiv Av‡Q Kwei e³e¨,

I am planting this tree in resemblance of my stay here, for nowhere else was I given what I received here. It was more than hospitality. It was the awakening of the feelings of kinship. I sense and I have come to the land of a nation which is emotionally akin to India.[5]

Kwei ¯v‡¯¨i DbœZ n‡j wZwb GLv‡b _vKvKvjxb Rvgvb cKvk‡Ki Rb¨ Bs‡iwR I evsjv Dfq fvlv‡ZB Zvi A‡UvMv‡di msKjb †jLb m¤úY K‡ib|[6]evjvUb d‡iW †_‡K eW‡c‡÷ wd‡i Kwe †mLvbKvi eo bwms‡nvg wj‡MU m¨wb‡Uwiqv‡g AwZw_ wn‡m‡e Avgš¿Y cvb|[12] b‡f¤i e¨w³MZfv‡e nv‡½wii ZrKvjxb Mfbi Miklos Horthy Kwe‡K Avgš¿Y Rvbvb| †`‡ki Lvivc Ae¯vi K_v wZwb iex›`bv‡_i m‡½ Av‡jvPbvI K‡ib|

iex›`bv‡_i 1926 mv‡ji BD‡ivc åg‡Yi K_v wjwce× K‡iwQ‡jb wbgjKgvix gnjvbexk Zvi Kwei m‡½ q‡iv‡c M‡š| GB M‡š Kwe †h Drmv‡ni m‡½ m¤waZ n‡qwQ‡jb Zvi weeiY cvB| wKš GB m¤abvi Avov‡jI wQj mgv‡jvPbvi KvUv, †hUv Kwe ev wbgjKgvixi c‡i Rvbv m¤e wQj bv| cieZxKv‡j 1961 mv‡j Kwei Rb¨kZel Dcj‡ÿ¨ Kwe †hme †`‡k ågY K‡iwQ‡jb †mBme †`‡ki fvi‡Z Aew¯Z we‡`k `ßi¸wj (Embassy) ågY msµvš wewfb KvMRcÎ evi Ki‡Z ïi“ K‡ib| †mBm‡½ iex›`bv‡_i ågYKvjxb mg‡q †mBme †`‡ki ivR‰bwZK-A_‰bwZK-mvgwRK cwiw¯wZi m‡½ iex›`bv_ I iex›`mwnZ¨ m¤úwKZ wµqv-cwZwµqvi Av‡jvPbvi GKUv c‡Póv ïi“ nq|

GB m‡Î iex›`bv‡_i nv‡½wi ågY‡K nv‡½wii wfb wfb e¨w³‡Ëi wfb wfb cwZwµqvi m‡Î wePvi Kivi †Póv Kiv †h‡Z cv‡i|

†bv‡ej cvBR cvevi ci we‡ki `k‡K BD‡iv‡c iex›`bv_ inm¨gq/ Ava¨wZ‡K cv‡P¨i Kwe, mva, ag¸i“ (Ck‡ii evYxi cPviK ev e¨vL¨vZv)GgbwK mš wn‡m‡eI m¤waZ nb|Zvi †Pnviv Ges †cvkvK nq‡Zv cvðv‡Z¨i gvb‡li Kv‡Q Zvi GB i‡c Dc¯wcZ K‡iwQj| †mBm‡½ MxZvÄwj‡K gigx KweZvi msKjb wn‡m‡e e¨vL¨vUvI Gi wcQ‡b wQj|

nv‡½wi‡Z iex›`bv‡_i †bv‡ej cvB‡Ri †h LeiwU c_g Qvcv nq †mLv‡b Zv‡K m½xZÁ ivRv †mŠix›`‡gvnb VvKi bv‡g fj Kiv nq|

The Nobel Prize for literature, this year, was awarded by the committee to Rayen Dranatto Tagore. Tagore is a musical composer and a historian of music. He lives in Calcutta and heis eighty-two. (*Világ* 14 Nov. 1913)[7]

Gi `-mßvn ci wewkó Kwe Mihály Babits cKZ Z_¨ cwi‡ekb K‡ib| wZwb Bs‡iwR †_‡K iex›`bv‡_i wZbwU KweZvi M`¨ Abev` K‡ib Ges iex›`bv_ m¤ú‡K GKwU ceÜ †j‡Lb| wKš A‡Pbv GB Kwei bv‡gi D”PviY nv‡½wi‡Z Av‡jvPbvi welq n‡q DVj| gvZvj †jv‡K‡`i wPwýZ Kivi Rb¨ GB bvg D”PviY Ki‡Z †`Iqv nZ| †h bvg D”PviY Ki‡Z cvi‡Zv †m †bkvM¯ bq e‡j wPwýZ nZ|

iex›`KweZvi `wU w`K Ñ cvP¨ I cvðvZ¨ ms¯wZi wgjb Ges KweZvi Aa¨vZ‡ev` `‡UvB

cvVK‡`i Kv‡Q K`i †cj| University of Budapest-Gi c_g cwmqvb c‡dmi Sándor Kégl (1862–1920)Zvi †jLvq Rvbvb,

It is obvious that he did not read European poetry in vain, yet he is following the way of his ancestors. Although it gained enrichment, Tagore is strongly permeated by the spirit of old Indian poetry. He is almost completely occupied with that one strong feeling, the deepest possible for an easterner: religious mysticism. This makes the reading of his poems tedious for a European, and they will mostly be enjoyed sporadically in anthologies.[8]

Czechoslovakia †_‡K cKwkZ bvgx nv‡½wiqvb Rvbvj *Kassai Napló*-G nv‡½wii Ab¨Zg †kô GK Jcb¨vwmK Sándor Márai, Darmstadt-G Keyserling-Gi 'School of Wisdom'-G ie›`bv‡_i e³Zv †kv‡bb| wZwb Kwei g‡a¨ †`L‡Z cvb Mfxi Ávb I `tL| wZwb Kwei Pvicv‡k PvUKvi‡`i wfo †`‡L Ges Kwe‡K wb‡R‡`i c‡qvR‡b e¨envi Kivq ÿä n‡qwQ‡jb|[9]

1924 mv‡j Diogenesz KvM‡Ri GKwU ce‡Ü Zvi Rbwcq Zvi e¨vL¨vq ejv nq,

Tagore is a descendant of Brahmins brought up on old humanist morals... He is a brilliant writer who took the style of his writing, the structure of his conceptions, the problems, the human conflicts and even the nature of his characters from the framework of European culture. However, he is penetrated by philanthropy, which is nobler, warmer, truer and more radical than that of the Europeans. ... Rabindranath Tagore is the heir of the ancient Brahma wisdom whom contemplation made capable of unutterable sensitivity and has a capacity of differentiation.[10]

nv‡½wi‡Z Kwei eB `vi"Y Rbwcq Zv ARb K‡i| KweZvi eB¸wj me‡P‡q †ewk Rbwcq nq| 1920 mvj †_‡K 1925 mv‡ji g‡a¨ TheGardener, Gitanjali, The Crescent Moon, Fruit Gathering, Lover's Gift, Stray Birds, Crossing cfwZ KweZvi eB; Chitra, Sacrifice, The King of theDarkChamber, The Post Office PviwU bvUK; wZbwU Dcb¨vm The Home and the World, The Wreck, Gora; PviwU bvUK; wZbwU Dcb¨vm, Auspicious Moment, Hungry Stones, Homecoming †gvU KwowU Mí Ges Sadhana, The Inspiration of the Soul, Nationalism, My Reminiscences ceÜ Mš cKwkZ nq| Mš¸wji g`Y msL¨v K‡qK‡kv †_‡K `nvRvi Gi g‡a¨ wQj|[11]

ie›`we‡iwaZvi miwUI Pvcv wQj bv| K¨v_wjK Ges †cv‡U÷›U Dfq PvPB ie›`we‡iwaZvq †b‡g c‡o| Jesuit †jLK Béla Bangha ie›`bv_ m¤ú‡K e‡jb,

Certain admirers of the heathen East make efforts to introduce this pantheistic cult of nature, erring in its concept of beauty and badly underdeveloped, as a new light predestined to renew Europe's spiritual and moral life.[12]

wZwb †mBme e¨w³‡`i AvµgY K‡ib hviv ie›`bv_‡K ag¸i" i‡c, bZb Av`kev‡`i evnK i‡c Z‡j aivi †Póv KiwQj| wKš ie›`bv‡_i KweZ kw³‡K wZwb A¯xKvi bv K‡i e‡jb,

Rabindranath Tagore is a true gem and we are free and right to study him as we do with the pagan poets of the Ancient Age.[13]

K¨v_wjK agZËwe` István Záborszky iex›`bv_ m¤ú‡K GKwU Mš' iPbv K‡ib| wZwb Kwei Av`k‡K cvðvZ¨ Av`k I agZ‡Ëi m‡½ wgwj‡q wePvi K‡ib Ges K¨v_wjK Pv‡Pi wei"× gZev`¸wj‡K LÊb K‡ib| cvq mg¯ K¨v_wjK RvbvjB Rbwcq K¨v_wjK wmwiR Szent István Könyvek-†Z cKwkZ István Záborszky-i †jLwUi cksmv K‡i|[14]

Georg Lukács bv‡gi GK e¨w³ I iex›`bv_‡K Zxe AvµgY K‡ib| wZwb Kwei AvšRwZK L¨wZi †cQ‡b wewUk‡`i lohš †`L‡Z cvb| iex›`bv_‡K wZwb wewUk‡`i B‡›U‡jKPqvj G‡R›U e‡j wPwýZ K‡ib| Kwei †bv‡ej cvwß Avm‡j Bs‡iR‡`iB `vb|

The British bourgeoisie... is repaying its intellectual agent in the struggle against the Indian freedommovement.[15]

wek kZ‡K nv‡½wii †kô c¨viwW iPwqZv Frigyes Karinthy iex›`bv_‡K e¨½ K‡i †h †jLwU †j‡Lb †mwU Zxe weivMcY| Palyazom a Nobel-dijra (I am applying for the Nobel Prize) bvgK †QvÆ †jLwU‡Z wZwb MxZvÄwji Bs‡iwR Abev‡` fviZxq kã ev fviZxq ms¯wZi Abl‡½i Afve‡K Abev‡`i mvd‡j¨i KviY e‡j‡Qb| Zvi †jLwUi wKQ Ask D×Z Kiv †h‡Z cv‡i,

I can write without any fear that I am applying for the Poetry Prize of the Nobel Foundation and I can tell in what capacity I intend to apply. The committee in all probability does not know Hungarian. These days the committee only knows the Hindu language since they have given the Nobel Prize to the Hindu poet RabindranathTagore who was in this way declared to be the greatest poet of the world.

I have been eager for the Nobel Prize since my early childhood and my poemshave been published under the pseudonyms Pet?fi, Heine, Baudelaire,Maeterlinckand others. I imbibed my poems with that universal human what's-it-called that wasexpected as a condition by the founder of the Nobel Prize. I have tried in all livinglanguages but I did not get the prize. Instead of me, Rabindranath Tagore, the Hindupoet, received it.

–Why did the Hindu poet receive it? - you are asking, respected madam. Towhatextent does this Hindu poet represent my or your sentiments, re-spected madam? Orthose of the European gentlemen who decided, as a committee, to give him the award?Well, respected madam, I am going to explain it. Here is a wonderful poem by Rabindranath–

When I first climbed on the tamarix-tree in my childhood, my little heart was still like an akaju-boabob, on which the drugho-bird is chirping.

But now it is not the drugho-bird that sings in my heart but the great Mahad?- Biskaja and it says: pivi-pivi.[16]

Pwj-‡ki `k‡Ki †k‡li w`K †_‡K cÂv‡ki `k‡Ki c_gva chš nv‡½wi‡Z KwgDwb÷‡`i Kv‡Q iex›`bv_ evZ¨ ‡_‡KwQ‡jb| KviY Zv‡K Ø›ØgjK e¯ev‡`i Øviv wVK e¨vL¨v Kiv hw"Qj

bv| ie›`RbkZe‡l nv‡½wi‡Z Zv‡K Avevi cbiwe®v‡ii †Póv †`Lv hvq| ZZxq we‡k cvðvZ¨ mvgvR¨ev‡`i wei“‡× Zvi Ae¯vb KwgDwb÷‡`i Kv‡Q Zv‡K MnY‡hvM¨ K‡i †Zv‡j|

MnY eRb BZ¨w`i ga¨ w`‡qB ie›`bv‡_i ¯wqZ| nv‡½wi‡ZI ie›`PPv Gfv‡eB GwM‡q P‡j‡Q| 1926 mv‡j ie›`bv‡_i ågYm½x wbgjKgvix M‡š Avgiv ie›`-m¤abvi D”QvmwUB †`L‡Z cvB| wKš ie›`bv_‡K AvµgY Gi Avov‡j XvKv c‡o †M‡Q| m¤abv ev wei‡c mgv‡jvPbv Dfqw`K †_‡KB ie›`bv_ PwPZ n‡”Qb| wei‡c mgv‡jvPbv Kivi ga¨ w`‡q ie›`bv_‡K ¯xKvi K‡i †bIqvB n‡”Q e‡j Avgiv g‡b Kwi|

nv‡½wi ågY wb‡q ie›`bv‡_i †QvÆ †jLwU w`‡q ceÜwU †kl Kiv †h‡Z cv‡i|

(wbgjKgvix gnjvbex‡ki Kwei m‡½ q‡iv‡c Mš †_‡K MnxZ)

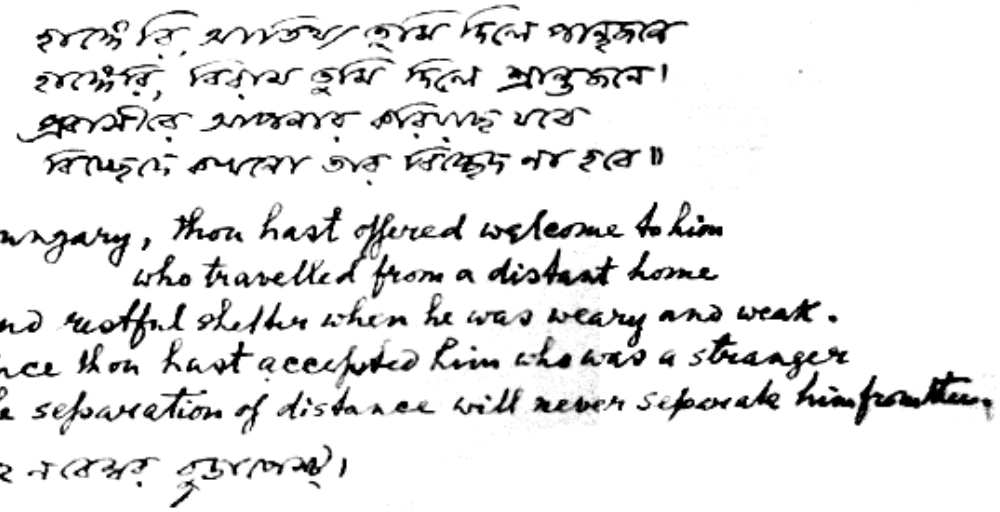

Z_¨mÎ

1| L¨wZ AL¨wZi †bc‡_¨, ie›`bv_ I †ivg¨v †ivjv, †mŠix›` wgÎ, Avb›`, †KvjKvZv, wØZxq ms¯‹iY 1995, c 376|

2| Kwei m‡½ q‡iv‡c, wbgjKgvix gnjvbexk, wgÎ I †Nvl, †KvjKvZv, 1376 e½vã|

3| *Rabindranath Tagore in Hungary*, Gyula Wojtilla, ed. by Istvan Major, Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, pp 9-22.

4|Kwei m‡½ q‡iv‡c, wbgjKgvix gnjvbexk|

5| *Rabindranath Tagore in Hungary*, Gyula Wojtilla.

6| Z‡`e, c 20|

7| *Rabindranath Tagore and Hungarian Politics*, Imre Bangha, Parabaas, Sept 2008, pp 3.

8| Z‡`e, c 3, 9| Z‡`e, c 4, 10| Z‡`e,c 4, 11| Z‡`e, c 5, 12| Z‡`e c 7, 13| Z‡`e c 7, 14| Z‡`e c 7, 15| Z‡`e c 8|

16| *From 82-year-old Musiocologist to Anti-imperialist Hero: Metamorphoses of the Hungarian Tagore in East Central Europe*, Imre Bangha, Asian and African Studies XIV, 1(2010), pp 57-60.

প্রকৃতি ও স্থাপত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে

শর্মিলা ব্যানার্জী

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে কবি লিখিত চিঠিপত্রের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। সারাজীবন কবি অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলি সবই নিছক চিঠি নয়, তার মধ্যে কবির মননশীল মনের এবং জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই গুণটি পেয়েছিলেন।

পত্র মানুষের অণুভবের সবচেয়ে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। কবি তাঁর দীর্ঘজীবনে যে সমস্ত চিঠি লেখেন তার সংখ্যাও প্রচুর। এগুলিকে কবির জীবন দর্শন বা জীবন দর্পণ বলা যেতে পারে। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যখন যা প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তা-ই চিঠি মারফৎ প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর পত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলেন—

"চিঠির সাহিত্য ধরা দেয় লেখকের কাছ ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি, আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্য প্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।" (ভূমিক; পথে ও পথের প্রান্তে / পৃঃ ৩)

আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি সংবাদ বহনের বাহক হিসেব যেমন সার্থক, তেমনি চিন্তাশীল কবি মনের বিশিষ্ট অভিব্যক্তির স্বাক্ষর। অবশ্য একথাও সত্য যে কর্তব্যের প্রয়োজনে অনেক সময় কবিকে চিঠি লিখতে হয়েছে, যেমন ভ্রমণ বিবরণের চাহিদা মেটাতে সম্পাদকের অনুরোধে তাঁকে পত্র-প্রবন্ধ রচনা করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবির সরস মন্তব্য—

"পাখি-ওড়ায় আর ঘুড়ি ওড়ায় তফাৎ আছে। আমি ওড়াচ্ছি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি, কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা। কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।" ('জাভাযাত্রীর পত্র'; পত্র সংখ্যা-৮, পৃঃ সংখ্যা-৫১৬, রবীন্দ্ররচনাবলী দশম খণ্ড সুলভ সংস্করণ)

বাল্যকাল থেকেই কবি প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করতেন। প্রকৃতির বাণী, প্রকৃতির আহ্বান যেন তিনি শুনতে পেতেন—প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই প্রকৃতিকে তিনি দেখেছিলেন 'সোনালী পাড় দেওয়া নতুন চিঠির' মতো, লেফাফা খুলে বিশ্ব প্রকৃতির সেই চিঠি পড়তে তিনি কোনো দিনও ভুলে যাননি—"সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টি কর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই।.... আমি একটা গর্ব করে থাকি, ঐ চিঠি লিখিয়ের চিঠি পড়তে পারতপক্ষে কখনো ভুলি নে।.....('জাভাযাত্রীর পত্র', পত্রসংখ্যা-২ পৃঃ ৫০৪দশম খণ্ড)/রবীন্দ্ররচনাবলী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে বারংবার প্রকৃতির কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সেই প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় রচিত স্থাপত্যের কথাও বলেছেন। কবি যে 'পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসতেন' সেই পৃথিবীর গাছপালা, নদী, মাঠ, নিস্তব্ধতাকে পরিপূর্ণরূপে কাছে পেতে চাইতেন, সেখানে তিনি বাসস্থানের দেওয়ালকে বাধা বলে মনে করতেন, তাই উন্মুক্ত গৃহ তাঁর খুব পছন্দ ছিল। য়ুরোপ ভ্রমণকালে সেখানের গৃহগুলি যেমন তাঁর না-পসন্দ ছিল, তেমনি জাপানের গৃহস্থাপত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—'জাপান যাত্রী'তে সেখানের গৃহস্থাপত্য দেখে তিনি লিখেছিলেন—

"এদের কড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেওয়াল, কড়ি, বরগা, জানলা, দরজা যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়নি, সম্পূর্ণটা। তার আয়ত্তের মধ্যে।"

কবি যখন পূর্ববাংলায় জমিদারীর তত্ত্বাবধানে আসতেন, সেখানের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘনিষ্ঠভাবে

উপলব্ধি করতেন। সেখানের অবারিত প্রকৃতিকে দেখেছিলেন বিনা বাধায় এবং মেতে উঠেছিলেন সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দে। সেই আনন্দের উৎস ছিল সবুজ প্রকৃতি ও উন্মুক্ত বাসগৃহের অবাধ আলো বাতাস। এখানে 'মানুষ ঘেঁসা' মানবিক পরিবেশ, এবং প্রকৃতি ঘেঁষা পল্লী পরিবেশ কবির মনে গভীর আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ জাগাতো। 'মস্ত ইঁটের খাঁচা' স্বরূপ কলকাতা শহরের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে কবি সবুজ বাংলার অবাধ প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে যেন নবজীবন লাভ করলেন।

শিলাইদহের প্রকৃতি ও মানুষ কবির মনে এক বৃহত্তর জীবন বোধের জন্ম দেয়। যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল শিলাইদহের বাসগৃহ ও কুঠিবাড়ির অঙ্গন। সেখানের গৃহসংলগ্ন আম-কাঁঠালের বাগান, পুকুর মিলিয়ে যে সামগ্রিক স্থাপত্যটি গড়ে উঠেছিল; তাই ছিল পরবর্তী কালের শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ রূপ। কর্মের কারখানা ঘরে বদ্ধ, কবির মন যখন হাঁপিয়ে উঠতো, তখন স্মৃতির মেদুর স্পর্শে ছিল কবির সান্ত্বনা। ১৯৩৫ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল রাণী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে কবির মনের সেই ভাব প্রকাশ পেয়েছিল—

'মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতলার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাশুল।.....সব নিয়ে ছিল আমার নিভৃত বিশ্ব.....।"

('পথে ও পথের প্রান্তে'; পত্র ৫৪, পৃ ১১৩)

শিলাই দহের আড়াইতলার বাস গৃহটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেখানের মায়াময় প্রকৃতি। এই বাসগৃহটি কবির এতখানি প্রিয় ছিল যে পরবর্তীকালে এই গৃহ-স্থাপত্যটিই একটু ভিন্ন মাত্রায় শান্তিনিকেতনে 'দেহলি'তে রূপ পেয়েছিল। ঠিক তেমনি খোলা বারান্দা, ছাদ, বাগানের গাছগুলি ছাদ বারান্দার কোলঘেঁসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এই কুঠি বাড়ি ও তৎসংলগ্ন প্রকৃতির ছবি রাণুকে লেখা চিঠিতে কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন—

"ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কতগ্রামের আড়াল, সব শেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়।.....

আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি।"

('ভানুসিংহের পত্রাবলী'/ পত্র সংখ্যা-৪৬, পৃঃ সংখ্যা-৯৯)

কবি চাইতেন বাসগৃহ এমন হবে যেখান থেকে চারিদিকের উন্মুক্ত প্রকৃতি কখনও দৃষ্টি পথে বাধা হবে না। উপরে উদ্ধৃত পত্রটিতে আমরা দেখলাম, কবি শিলাইদহের প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সমস্তটুকুই তাঁর বাসগৃহের জানলা, ছাদ বা দক্ষিণের বারান্দা থেকে দেখা।

রবীন্দ্রনাথ একবার রাণীদেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"আমাদের কালস্রোতে ভাসা জীবনের সঙ্গে বাসাগুলোর সামঞ্জস্য থাকে না বলেই টানা ছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্বই থাকা চাই—স্থাবর এবং জঙ্গম।"(৮)

('পথে ও পথের প্রান্তে' পত্র সংখ্যা-২৯/পৃঃ সংখ্যা-২৯)

মনে হয় এই কারণেই কবি স্বয়ং তাঁর বাসভূমিকে স্থাবরও জঙ্গমের মাঝে মুক্তি দিয়েছিলেন, পতিসরে জমিদারী দেখাশোনার জন্য বসবাস কালে কবি অধিকাংশ সময় বোটে বাস করতেন। জল-স্থাপত্যের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল গভীর। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশিষ্ট স্থপতি অরুনেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য জেনে নেবো—

"রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত সুন্দর জল-নিবাসগুলি শিলাইদহ জীবন-পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীতি। ঝড়, জল, তাপদাহ হতেও উত্তীর্ণ সফল সৃষ্টি—চিত্রা, নাগরবোট, আত্রাই ও লাল ডিঙ্গি। একাধারে থাকা, খাওয়া শোওয়া, লেখাপড়া, নানান লোকজন মাঝে কাজের বৈঠকখানা, সঙ্গীতমঞ্চ আরো কত কী! তারই মধ্যে বহু

উপযোগী আসবাব, তাঁর নানান সৃষ্টির আবাস। ভাসমান চলমান স্থাপত্য—এই জল নিবাসগুলি, আপন বৈশিষ্ট্যের, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা 'চরৈবেতি'রই যেন আদর্শরূপ।....স্বয়ং সম্পূর্ণ 'পদ্মা' জল নিবাস স্থাপত্য পরিকল্পনার দিক থেকে অনবদ্য।' (৯) ('শান্তিনিকেতন ঃ স্থাপত্য পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথ'/পৃঃ সংখ্যা-১৩০ অরুনেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।)

এই সময়ে কবি পদ্মানদীতে 'পদ্মা'র আশ্রয়ে বাস করতেন। এছাড়াও 'চিত্রা' ও অন্যান্য আরো কয়েকটি হাউস-বোট রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা—মাফিক তৈরী করিয়েছিলেন।

এই কাজেও প্রাচ্য শৈলী ও জাপানী দারুশিল্পের দক্ষতা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিজস্বতায় চেয়েছিলেন,— সেই সঙ্গে কম খরচে, সহজসলভ্য গ্রাম্য-উপকরণের সাহায্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে কবি বাস্তু শাস্ত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের 'শ্যামলী' গৃহটির স্থাপত্য কৌশল উল্লেখযোগ্য। কবি 'শ্যামলী'র কথা-স্থাপত্য কৌশল উল্লেখযোগ্য। কবি 'শ্যামলী'র কথা উল্লেখ করে রাণী মহলানবিশ লিখেছিলেন—(পথে ও পথের প্রান্তে)

....."মাটির ঘরে প্রবেশ করেছি। ঘরটি যে দেখেছে খুশী হয়েছে—চোখে দেখতে যেমন ভালো, বাসের পক্ষেও তেমনি, ঘরগুলি বিভক্ত অথচ একটি মাত্র ঘর। দরজার নির্বেধ সংকোচ নেই। একটি সাঁওতাল মেয়ে রোজ ঘর নিকিয়ে যায়, সে আমার খুব ভালো লাগে।.....আমার লক্ষ্য এই যে খরচ খুবই কম হবে, অথচ মনের তৃপ্তি হবে পুরোপুরি।"

শ্যামলীর গৃহ নির্মাণে কবি মাটির দেওয়ালের সঙ্গে মাটির ছাত নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পে অভিনবত্ব এনেছিলেন। বর্তমানে দেশে-বিদেশে মাটির স্থাপত্য নির্মাণের প্রচলন শুরু হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে রবীন্দ্রনাথ বহু যুগ আগেই এর ব্যবহার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। শুধু 'শ্যামলী' নয়, নতুন বাড়ি, তালধ্বজ কুটির, প্রাক কুটির, বেনুকুঞ্জ, চৈতিমঞ্চ, কালোবাড়ি নির্মাণেও মাটি ব্যবহার করে কবি সহজ সরলতার সঙ্গে সৌন্দর্য মিশ্রিত করে এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার পথটি নির্দেশ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে প্রতিটি গৃহ নির্মাণে কবি প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে ইট, কাঠ, মাটি, সুরকি ও প্রয়োজনীয় বীম, ইস্পাত ব্যবহার করে কম খরচে বাসগৃহ গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো দুটি বাসগৃহের কথা উল্লেখ করবো, যেগুলির কবির প্রকৃতি ও স্থাপত্য প্রেমের পরিচায়ক।

বর্তমানে Eco Tourism বা পরিবেশ-পর্যটনে 'ট্রি-হাট' বা 'গাছ বাড়ি'র বিশেষ কদর দেখা যায়। এই অভিনব গৃহগুলি বড়ো বড়ো গাছের উপর মূলত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। এমন গৃহ আমাদের দেশে অভয়ারণ্যগুলিতে জাপানী দারু শিল্পী কাসাহারা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীনিকেতনে একটি গাছবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, কবি সেই বৃক্ষনীড়ে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতেন। শুধু তাই নয় পূরবী কাব্যের কিছু সংখ্যক কবিতাও এখানে রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করতে কবি পছন্দ করতেন, এই সময়ে তিনি বেশ কিছু দিন এই 'কবিরনীড়ে' বসবাস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার লিখেছিলেন—

"শ্রীনিকেতনে থাকিবার নূতন আকর্ষণ হইয়াছে বৃক্ষাবাস বা গাছের মধ্যে বাড়ি।..... নূতন ঘর নূতন বাড়ি কবিকে বড়োই আকর্ষণ করে তাই, এবার কয়েকদিন এই বৃক্ষ নীড়ে বাসা বাঁধিলেন।"

(রবীন্দ্রজীবনী—৩য়খণ্ড/পৃ: সংখ্যা—১৬৯, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)

দুটি বটগাছের উপর কাঠের এই গৃহস্থাপত্যটি যদিও বিনষ্ট হয়ে গেছে, তবু এই গৃহটি কবির স্থাপত্য চিন্তার স্মৃতিরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন উপাসনা মন্দিরের পূর্বদিকে একটি প্রাচীন তালগাছকে মাঝখানে রেখে কুটির নির্মাণ করে বাস করতেন। তেজেশচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। এই বাড়িটি

নির্মাণে মাটিকেই প্রাধাণ্য দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরু বিলাসী এই বন্ধুর লোক-স্থাপত্য (Folk-Architecture)কে আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 'বনবাণী' কাব্যের 'কুটিরবাসী' কবিতাটি তেজেশ চন্দ্র ও তাঁর 'তালধ্বজ' কুটিরটিকে চির স্মরণীয় করে রেখেছেন। 'কুটিরবাসী'র মুখবন্ধে কবি লিখেছিলেন।

"তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি। সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার ভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।" (মুখবন্ধ : কুটিরবাসী : বনবাণী/পৃঃ ১০৯, রবীন্দ্ররচনাবলী-অষ্টমখণ্ড)

মুখবন্ধটির শেষে কবি বাসস্থানের অধিকার ভেদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে শহরে শহরে 'হাই-রাইজ' বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। প্রমোটার কবলিত শহরগুলি বেহিসাবী বহুতলের দ্বারা শুধু মাটিকে নয় আকাশকেও কলঙ্কিত করছে। সবুজের অভাব, আর ইঁট কাঠের জঞ্জালে শহুরে মানুষদের দমবন্ধ করা পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নামক সভ্যতা আজ নানান সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি করে মানবজীবনকে তথা প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আজ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত গৃহ স্থাপত্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বহু বছর আগে বিদেশ ভ্রমণ কালে কবি দেখেছিলেন এই অসামঞ্জস্যের চেহারা, রাণীদেবীকে লিখেছিলেন—

"আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে একঝোঁকা করে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েছে, আর তারই পিছনে দিন রাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর বুকের উপর কী অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে। এই সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে উঠে তখন ভেতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে।" ('পথে ও পথের প্রান্তে'; পত্র-৫০/পৃ. ১০৮)

সেই চিরন্তন দাবির মধ্যে বাসস্থান অন্যতম, মানুষের সৃষ্টি ও নির্মাণের মধ্যে লোভ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে, তখন বাসস্থানের পরিবেশও হয়ে পড়ে দূষিত। তাই কবি চেয়েছিলেন পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে বাড়ি রাস্তা ও অন্যান্য নির্মাণ সংলগ্ন করে তুলতে, সেই সঙ্গে বাড়ির অন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন ধরনের গাছ ও লতাপাতার ব্যবহার করে ল্যাণ্ডস্কেপিং ও গ্রীণস্কেপিংকে সম্মিলিত করে স্থাপত্য শিল্পে অভিনবত্ব এনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুক্ত প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে দেখেছিলেন, এই দেখার প্রায় অনেকটাই ঘরের জানলা, বারান্দা বা ছাদ থেকে। প্রথম জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও গবাক্ষদর্শনে, পরবর্তীকালে কবির বহু চিঠি পত্রে আমরা দেখি, যখনই কবি প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তাঁর বাসস্থানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। তেমনি কয়েকটি উদ্বৃতি উল্লেখ করে আমরা দেখবো যে প্রকৃতির সঙ্গে বাসস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি কিভাবে কবির বক্তব্যে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য যে কবি 'শ্যামলী' কাব্যে রাণী দেবীকে উৎসর্গ করে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেখান যে জানলা দিয়ে কবি প্রকৃতির রূপ নিরীক্ষণ করতেন, সেই জানলাটির নাম দিয়েছিলেন, 'নেত্রকোণা'।

"বসি যবে বাতায়নে

কল্‌মি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।

.....বেড়ার উপর মৌসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,

চেয়ে দেখে দেখে জানলার নাম রেখেছি—নেত্রকোণা।" (উৎসর্গ—শ্যামলী; পৃঃ ১৩৭, রবীন্দ্ররচনাবলী দশমখণ্ড)

'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠি, তিরণ থেকে লেখা, যেখানে কবি প্রকৃতির মনোহরণ দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, সেই দৃশ্যটি খোলা বারান্দা থেকে দেখা—

" দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুর বেলার স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম কেদারার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্‌পাউনডের কতকগুলি নারকেল গাছ তার ওদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটু খানি ঝাপসা নীল আভাস।....." (ছিন্নপত্র; পত্র সঃখ্যা/-৩৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৮)

আর একটি পত্রে ইন্দিরাদেবীকে লিখেছেন— "কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে বসেছি, আমার মনের সব গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে।.... সিম্‌লের সেই রৌদ্রতপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণ নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোখের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেই রকমটি মনে হচ্ছে।.....সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন.....। মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে.....।" (ছিন্নপত্রাবলী; পত্রসংখ্যা-১৬৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা / ৩৫৯)

এখানে শুধুমাত্র বোলপুরের দক্ষিণের ঘরটিই নয়, সিম্‌লের বারান্দাটিও স্মৃতির পটে উজ্জ্বল। এমনি আর একটি চিঠিতে বোলপুরের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করতে করতে বহুদিন আগের দেখা হাজারিবাগের ডাক বাংলার কথা মনে পড়েছে কবির—

"জানি না কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম, ডাক বাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্দ্ধশয়ান.....।" ('পথে ও পথের প্রান্তে' পত্র সংখ্যা-২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ষ ৫০ (গ্রন্থ))

শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে কবির গৃহবদলের নেশা ছিল, কিম্বা বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতিকে একান্তভাবে উপলব্ধি করার জন্য ঋতুবদলের মতো কবি স্থান পরিবর্তন করতেন—'এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে বাস করে এসেছি—কোথাও স্থায়ী হতে পারিনি'—এই স্থায়ী হতে না পারার জন্যই বারবার গৃহ বদল করতেন। রাণীদেবীকে একটি পত্রে তারই উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

"আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোট ঘর। এই রকম ছোট ঘর আমি ভালোবাসি.....। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তা তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়।.....এই ছোট ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে, টেবিল আছে, চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত করে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাই নে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ভাবে..... এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে।" (পথে ও পথের প্রান্তে; পত্র-২৬ পৃঃ ৫১)

বিদেশ ভ্রমণকালে কবি প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেখানের বাস গৃহের অলিন্দ থেকে। ইজিপ্টে বসবাসকালে সেখানের বাসগৃহের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"আমাকে তাঁদের যে বাগানবাড়ীতে রেখেছিলেন, সে অতি সুন্দর। সে বারান্দাগুলো খুব দিলদরিয়া গোছের—একদিকে বাগান, আর এক দিকে নীল সমুদ্র, আকাশ মেঘ শূন্য, সূর্যের আলোয় শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করছে। সমস্ত দিন নিস্তব্ধ নির্জন অবকাশের অভাব ছিল না।"

ঐ চিঠিতেই আবার লিখছেন—

"পরদিন কায়রোর পালা।..... এভার হোটেল।....খুব বড়ো হোটেল—খুব মস্ত খাঁচা।" (পথে ও পথের প্রান্তে; পত্র সংখ্যা-৫, পৃঃ ১৫ (গ্রন্থ))

'হোটেলের খাঁচায় ছিলেন দিন তিনেক'—এমন মন্তব্যও 'জাভাযাত্রী'র পত্রে আমরা শুনেছি। এর থেকে বোঝা যায় যে কবি চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি উদার উন্মুক্ত প্রকৃতিকে বাসস্থানের দেওয়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে চাননি, তাই এমন ঘর বানাতে চেয়েছিলেন, যেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপটি নিরীক্ষণে কোন বাধা না থাকে। শান্তিনিকেতনের গৃহস্থাপত্য কবির সেই বাসনার বাস্তবরূপ।

শিলংয়ে বসবাসকালে কবি সেখানের প্রকৃতিকে দেখেছিলেন জানলার ভিতর দিয়ে, এ যেন সেই শৈশবের 'গবাক্ষ-দর্শনে'র ভিন্ন রূপ। শিলংয়ের ব্রুকসাইডের সেই বাড়ির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"আমার এখানকার লেখার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়োঘর—নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণা জানলাগুলো, সমস্তই শার্সির তার ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ-বেরঙের ফুল যে ফুটেছে তার ঠিক নেই—কত চামেলি, কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল।" ('ভানুসিংহের পত্রাবলী'; পত্র সংখ্যা ঃ ৩৯, পৃঃ সংখ্যা ঃ ৮৯)

কবি যখন বিদেশে গেছেন, তখনো সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেখানের বাসস্থানটিরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছে গাছপালা, আকাশ বাতাসের সঙ্গে বাসস্থান মিলেমিশে এক অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেছে। মলাক্কা। থেকে রাণীদেবীকে লিখছেন—

"এটা একজন চানীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশান্ত বারান্দার বেতের কেদারায় বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভরে বইছে পশ্চিমের হাওয়া। .....আপনাকে আপন সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে বসে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ পোয়ানো ঐ ছোটো দ্বীপটির মতো।" ('জাভাযাত্রীর পত্র'; পত্র সংখ্যা ঃ ৫, পৃঃ সংখ্যা ঃ ৫১১ রবীন্দ্ররচনাবলী—দশমখণ্ড)

শুধু গৃহস্থাপত্যই নয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সামগ্রিক ভাবে সমস্ত শহর বা লোকালয়গুলি প্রকৃতির আবেষ্টনের মাঝে গড়ে উঠুক। তাই শান্তিনিকেতনের সম্পূর্ণ ভৌগলিক পরিসীমাকে তিনি সবুজ স্থাপত্য দিয়ে ভরে তুলতে চেয়েছিলেন। কবি এমনই একটি সবুজে মোড়া। নগরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বালি দ্বিপে। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন—

"মুণ্ডক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাংলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে অংশে ঘুরেছি সমস্তই চাষ করা, বাস করা জায়গা; লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, সজনে গাছের ঘন শ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলং পাহাড়ের মতো। নীচে স্তর বিন্যস্ত ধানের যেত; পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূর সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়।.....নিকটের পাহাড়ের ঘন সবুজ অরণ্যের পরে রৌদ্র পড়েছে; দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত..... ঐ কাজেই গিরি বক্ষ সংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরিগাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলছে।....নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপরে, সামনে পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়.....'। (জাভাযাত্রীর পত্র; পত্র : ১২, পৃ:৫২৯-৩১ রবীন্দ্ররচনাবলী—দশমখণ্ড)

কবি স্বয়ং নগর উন্নয়নে প্রকৃতিকে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন, তাই দেশে—বিদেশে যেখানেই তিনি প্রকৃতির মাঝে মানব নির্মিত নগরের রূপ দেখেছেন, সেখানেই তাঁর প্রকৃতি সচেতন মন মুগ্ধ হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রেখেও নগরায়ন সম্ভব। কবি ভারতবর্ষের উদার প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন

এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মানুষ একদিন প্রকৃতির সেই উদারবাণী শুনবে এবং প্রকৃতিকে ভালোবেসে তাকে রক্ষা করবে। এই বিশ্বাস থেকেই স্বয়ং পথিকৃৎ রূপে তিনি আমাদের কাছে প্রকৃতি নির্মিত স্থাপত্য চিন্তার আদর্শ তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতির অবারিত, উন্মুক্ত ও উদার বাণীরূপটিকে কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মানব নির্মিত স্থাপত্যের মাঝে। রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন, যে 'মানুষ, তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার অবদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘত্মন ঘটছে। সে ইঁট কাঠের একান্ত ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে.....', কবি সেই ব্যবধান ও বিচ্ছেদকে দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে গৃহস্থাপত্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রাচীন কালের ওঙ্কার ধ্বনিকে তিনি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্মিলিত করে, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রাণ প্রকৃতির যে রসে সিঞ্চিত হয়েছিল সেই রসধারাই স্থাপত্য নির্মাণে প্রবাহিত হয়েছিল। এইভাবেই কবি প্রকৃতি ও স্থাপত্যকে একত্রে মিলিয়ে দিয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। (পৃ: ৩৭৩, আমার বিশেষ দেখো)

রবীন্দ্রনাথের পত্র সাহিত্যের চিঠিগুলি যেন সবুজ প্রকৃতির বাণীরূপ। কবি দ্রষ্টা রূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির রূপ—সেই রূপটিকেই কবি তাঁর পত্র সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছবির মতো এঁকেছিলেন। সেখানে কবির কলমে চিত্রিত হয়েছিল 'সবুজ পাড় দেওয়া গেরুয়া নদী', 'সাদা মেঘের ছিটে দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল ঐশ্বর্যময়ী ধনী', অথবা 'প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে—আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে, তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে।"—এই ছবি পাঠকের মনে প্রভাব ফেলার জন্য নয়, কবি যে আনন্দের অংশীদার হয়েছেন, সেই আনন্দের ভাগ দিতে কখনও কার্পণ্য করেননি। "বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে 'আমি দেখেছি' এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তা হলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুশী হয়ে উঠবে।'—এই ভাবেই কবি তাঁর দেখাকে, তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন পত্রসাহিত্যের মধ্যে।

'চিঠি' রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে। কবির কথায়—"চিঠিটা জিনিসটা ছোট্ট; মালতী ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে আকাশে ফুটে উঠে সেই আকাশ মালতীলতার মতো বড়ো।"

চিঠি তাঁর কাছে শুধুমাত্র সংবাদ বহনের মাধ্যম নয়, চিঠি হল মানবের অন্তরের কথা, সেই অন্তরের কথা যখন আন্তরিক ভাষায় প্রকাশ পায়, তখন তার রূপ সীমার গন্ডীকে ছাড়িয়ে অসীমের বার্তা বহন করে। কবি সেই বার্তাকেই তাঁর চিঠির মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে প্রকৃতিকে তিনি 'সোনালী পাড় দেওয়া' চিঠির মতো দেখেছেন। 'লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।'..... কবি পেয়েছিলেন সেই খবর, পড়েছিলেন প্রকৃতির মনের কথা, তাই প্রকৃতিকে এমন একান্তভাবে ভালোবেসেছিলেন। কবি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধরণীর কাছেও বিশ্ববিধাতার চিঠি এসে পৌঁছায়—সে চিঠি সৌন্দর্যের রঙে লেখা, তার ভাষায় বাণীতে প্রকৃতির বিচিত্রলীলার উচ্ছাস। এই সুদৃশ্য চিঠিই ধরণীর কাছে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের বার্তা বহন করে আনে। কবির দেখা চিঠি-পথের নিরন্তর যাত্রায় রচিত হয়েছে উপসংহার—

"সমুদ্রের দূরত-তীরে যে ধরণী আপনার নানা রঙের আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানা চিঠি পড়ল খসে কোন উপরের থেকে। সেই চিঠি খানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল তমালের নিবিড় বনছায়া পিছনে রইল এলিয়ে; নুয়ে পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুলে.....। এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত; যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে। সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের

জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দূর নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না।..... দিতে আর পেতে চাওয়ায় উত্তর প্রত্যুত্তর এ পারে ও পারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টির তরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতু পর্যায়, কখনো গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা, এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা, ...যাকে চোখে দেখা যাায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশ পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়;.....।" ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়রী' পৃ: ৪৬০, রবীন্দ্ররচনাবলী'—দশমখণ্ড)

তথ্যসূত্র ঃ

১। রবীন্দ্ররচনাবলী : সুলভ সংস্করণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত)

২। রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

৩। রবিজীবনী— প্রশান্তকুমারপাল

৪। রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলী; গোপাল চন্দ্র রায়

৬। শান্তিনিকেতন; স্থাপত্য পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথ; অরুনেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। স্মরণিকা; নির্মল কুমার মহলানবিশ

৮। দেশ পত্রিকা

ÔmeRcÎÕ- ce t ie›` †QvUM‡í cwZev`

¯cb Kgvi Avk

AvRxeb ie›`bv_ cwZev`ceY| Zvi KgRxeb I mwnZ¨Rxe‡bi wewfb †¶‡Î wZwb Ab¨vq, AmZ¨ I AwePv‡ii wei“‡× cwZev`x KÚ, †jLbx, gbb, †eva I wPšvfvebv‡K RvMZ †i‡L‡Qb| ie›` - KíZi“i e¨wß‡Z, we¯v‡i, djc‡®úi AKÚ `v‡b evsjvi mvi¯Z mgv‡Ri GKvsk †hgb Av‡gw`Z, n‡lvrdj- n‡q D‡VwQj, †Zgwb GK`j gË n¯xi cv`fv‡e e½ fviZxi Dceb Kjw lZ n‡qwQj| djZ, ie›`-we‡iwaZvi GK kvm‡ivax A¯v¯¨Ki cwi‡ek ^Zix n‡qwQj, hvi mÎcvZ Dwbk kZ‡Ki †kl `k‡K| 1913 mv‡j †bv‡ej cwß Dcj‡¶¨ e‡½i GK`j wkwZ iYkxj ¯ve‡Ki Dj-v‡m ¶ä wei³ ie›`bv‡_i gše¨‡K †K›` K‡i gË n¯xi cbivq Avùvjb ïi" nq| ie›`bv_‡K j¨ K‡i Kwjgv wb‡c I we`“c we‡lv`Mv‡i evsjvi Z_vKw_Z wkwZ ÔnvDBÕ mgvR mgih‡Á †g‡Z I‡V| Avgv‡`i g‡b Kwi‡q †`q 1914 mv‡ji wek gnvh‡× Aïf kw³i iY- DbËZvi K_v| hvB †nvK, ie›`bv_‡K A¯xKvi I AMv‡n¨i ga¨ w`‡q †h fvO‡bi †Ljvq Giv †g‡Z wQ‡jb, Zv‡K cwZnZ Ki‡Z GwM‡q G‡jb ïf ew×m¤úb GK`j mwnZ¨‡meK| GB mg‡q gwYjvj M‡½vcva¨vq, cg_ †PŠaix-iv ie›`-Abiv‡M I ie›`-FY ¯xKvi K‡iI ie›`bv_ †_‡K m‡i Avmvi mvabvq wbgM n‡jb| ZvB, meRcÎ cKv‡ki D‡`¨vM-c‡e Zv‡`i Aej¤b, Avkq I civgk`vZvi fwgKvq ie›`bv‡_i Avšwi K AskMnY we‡kl ZvrchcY| ie›`bv_ D‡`¨v³v‡`i Rwb‡q w`‡jb †h, Ggb cwÎKv cKvk Ki‡Z I †mLv‡b Ggb wKQ wjL‡Z hv‡Z _v‡K ms¯vi ewRZ wb‡gvn g³ wPšv, fvevjZvnxb, D”QvmkY¨, cwigwRZ I FR cKvk fw½| GB wb‡`k ¯úó K‡i †`q †h, iYkxj mvi¯Z mgv‡Ri côKÊq‡bi wei“‡× cwZev‡`i gÂ ^Zvi Ki‡Z mvsMVwbK D‡`¨vM‡K ie›`bv_ mvM‡n mg_b Rvbv‡jb| GiB dj k“wZ‡Z, 1321 e½v‡ãi 25 ‰ekvL cg_ †PŠaixi m‡hvM¨ m¤úv`bvq ÔmeRcÎÕ cwÎKvq c`xß I cvYgq Awefve| 1334 e½v‡ãi fv` msL¨v chš cvq 14 eQi e¨vcx (KLbI KLbI cKvk AwbqwgZ n‡q‡Q) ÔmeRcÎÕ evsjv mwnZ¨PPvi RM‡Z GK Abb¨ MwZ I behM môv| c_g msL¨vi ÔgLcÎÕ-G meRcÎ cKv‡ki D‡`¨vM I D‡Ïk¨‡K cg_ †PŠaix wØavnxb fv‡e D‡j-L K‡i‡Qb -

Òevsjvi gb hv‡Z Avi †ewk Nwg‡q bv c‡o, Zvi †Póv Avgv‡`i AvqËvaxb| gvbl‡K SwK‡q †`evi gZv Aí we¯i mK‡ji nv‡ZB Av‡Q, †m gZvi c‡qvMwU †Kej cewËmv‡c| ...BD‡iv‡ci ¯ú‡k Avgiv, Avi wKQ bv †nvK, MwZ jvf K‡iwQ, A_vr gvbwmK I e¨enwiK mKj cKvi RoZvi nvZ †_‡K K_wÂr gw³ jvf K‡iwQ| GB gw³i wfZi †h Avb›` Av‡Q †mB Avb›` n‡ZB Avgv‡`i be mwn‡Z¨i m"wó| ...Ó

e¯Z, cvðvZ¨ mwnZ¨v`k, e¨w³¯vZ‡š¨i aviYv, MwZa‡gi cmvi, wekh×-ce Aw¯i D™vš hegvbm, ¯wei civZb‡K †hŠe‡bi RjZi‡½ AcmviY Kivq mZxe evmbv, RvZxq Av‡›`vj‡bi D`¨gnxb †bZZ, m‡evcwi bemói cvYgq ZwM` meRc‡Îi Awefv‡ei Ab‡ciYv| GK K_vq, ÔmecÎÕ-Gi AvZ‡cKvk cej cwZev‡`i Av‡Mq ewZKv m‡½ K‡i| †h †hŠeb ag I ¯weiZvewRZ g³ RxebQ‡›`i, c_vbM‡Z¨i cwie‡Z e¨w³i cMwZkxj fvebv I RoZcvß

civZb‡K Z¨vM K‡i MwZgq cvYPÂj bZb‡K Mn‡Yi A½xKvi K‡i meRc‡Îi hvÎv ïi“| †mB c‡_i hvÎx nevi Rb¨ c_g †PŠaixi cig mü`, AvZ¥xq ie›`bv‡_i I wPihev cw_K cvY e¨vKj n‡q DVj| KggLi wewPÎ Rxe‡b bvbv e¨¯Zv m‡ËI M‡í, KweZvq, bvU‡K, Dcb¨v‡m, ce‡Ü, c‡Î ÔmeRcÎÕ-‡K ie›`bv_ mg× Ki‡jb|

fviZx I mvabvi c‡i ie›`bv‡_i mwnZ¨Rxe‡b ÔmeRcÎÕ Afvebxq MwZ I cfve we¯-vi K‡i| GB c‡ei we‡kl D‡j-L‡hvM¨ n‡jv ie›`bv‡_i †QvUMí¸wj| ÔmeRcÎÕ-Gi c_g msL¨v †_‡K 1324 e½v‡ãi †cŠl msL¨v chš- 10 wU Mí meRcÎ‡K D¾xweZ K‡i‡Q| welq fvebvi w`K †_‡K ie›`bv‡_i AwfbeZ I ¯KxqZv bRi AvKlY K‡i| AwaKvsk M‡í ie›`bv‡_i cwZev`x fvebvi cwZdjb j¨ Kiv hvq| mgvR I Abkvm‡bi Pv‡c cxwoZ gvb‡li Aš‡e`bv Ges †mB e¨e¯'v †_‡K g³ nevi cvYcY msMvg I cwZ¯úav GB Mí¸wji (nvj`vi‡Mvôx, †evógx, ¯xicÎ, cqjv b¤i, AcwiwPZv) gjmi| wbtm‡›`‡n, fv‡e, i‡m, i/‡c GB Mí¸wj bZbc‡Îi hvÎx I w`kvix|

1321 e½v‡ãi ˆekvL msL¨vq cKwkZ nj Ònvj`vi‡MvôxÓ MíwU cwZev`x †PZbvq mg×| D‡j-L¨ †h, GB msL¨v‡ZB cKwkZ nq ie›`bv‡_i †jLv Ôme‡Ri AwfhvbÕ kxlK KweZv I Ôwe‡ePbv Awe‡ePbvÕ bvgK ceÜ| ¯weiZv I c_vbM‡Z¨i wei“‡× †hŠeb Z_v MwZa‡gi e›`bv K‡i ie›`bv_ Av‡jvP¨ KweZvq `iš, Rxeš, Akvš, cPÛ, cgË, cg³ cvYkw³i Agi DÌvb cZ¨vkv K‡i‡Qb| GB M‡íi gjm‡ii m‡½ KweZvi Avš-i mv`k¨ `jf¨ bq| D³ ce‡Ü ie›`bv_ Zvi“‡Y¨i Rq †NvlYv K‡i e‡j‡Qb - Òcw_exi mg¯- e‡ov e‡ov mf¨ZvB `tmvn‡mi mwó| kw³i `tmvnm, ew×i `tmvnm, AvKvoLvi `tmvnm| ... GB `tmvn‡mi g‡a¨ GKUv cej Awe‡ePbv Av‡Q| ... †mB `al Awe‡ePbvi D‡ËRbv‡ZB AvRI gvbl Zlvi‰`‡e¨i cvnviv GovBqv KL‡bv DËi †gi“ KL‡bv `wY †gi“‡Z †KejgvÎ w`MweRq Kwievi Rb¨ QwUqv Pwjqv‡Q| ... †mLv‡b Zvi“‡Y¨i Rq nDK| Zvnvi cv‡qi Zjvq R½j gwiqv hvK, RÄvj mwiqv hvK, KvUv `wjqv hvK, c_ †Lvjmv †nvK, Zvnvi Awe‡ePbvq D×Z †e‡M Amva¨mvab nB‡Z _vKÓ| Ônvj`vi †Mv‡ôxÕ M‡í I GB `tmvnwmK cvYkw³i we‡`v‡ni mi aŸwbZ n‡q‡Q| nvj`vi cwiev‡ii m`m¨‡`i wPšvfvebvq, AvPi‡Y, Rxebhvc‡b c_vbMZ¨ wQj cej| mvgšZwšK KvVv‡gvq `xNw`b a‡i hv P‡j Avm‡Q, Zv‡K wbwØavq wbØ›` †g‡b †bIqvi ¯fve wQj g¾vMZ| eskxjvj, wKiY‡jLv mK‡jB ¯xKvi I wk‡ivavh K‡i wb‡q‡Q wPivPwiZ e¨e¯'vcbv| cRv‡kvlY I cRvcxo‡bi wbgg c‡_ P‡j G‡m‡Q Rwg`vixi gnr KvR| g‡bvnijv‡ji Avg‡jI Zvi e¨Z¨q N‡Uwb| djZ, `óew× bv‡qe bxjK‡Úi nxb Pµv‡š ga‰Ke‡Z¨i wf‡U-gwU DRvo n‡q hvq| †kvbv hvq, ga‡K Kwji mvg‡b ewj w`‡q Qvjvq eÜ K‡i Mv`vq Wwe‡q †`Iqv n‡q‡Q| Gw`‡K, †R‡ji g‡a¨ RvgvBlôxi wbgšY iv K‡i envj Zwe‡q‡Z wd‡i Avmv bxjK‡Úi Dci Mvgevmxi fxwZwgwkZ k×v Av‡iv ew× †cj| KviY, nvj`vi cwiev‡ii hveZxq KKwZi †nvZv bxjKÚ KZv g‡bvnijv‡ji Hkh¨ fvÛvi ÔgwZgvb `vf‡i g‡Zv cvnviv †`qÕ| Rwg`viZ‡ši ekxfZ nvj`vi cwiev‡ii hveZxq KKg I Ab¨v‡qi APjvqZ‡bi wei“‡× cwZev` K‡i g‡bvn‡ii eo †Q‡j e‡bvqvixjvj| cwievi Z‡ši `geÜ Kiv cwi‡e‡k †m cg³ cvYkw³i AwaKvix| Kw¯, wkKvi I ms¯'Z PPv - kixi I g‡bi Abkxj‡b †h nvj`vi †Mvôx Ab¨vb¨ m`m¨‡`i †_‡K wfb gv‡Mi| cwiev‡ii wbawiZ MwÛ, Abkvmb, wewawb‡l‡ai wei“‡× Zvi mQ›` c`PviY nvj`vi ewoi Kv‡Q †eLvàv †egvbvb| e‡bvqwii m`p ¯wbqwšZ e¨w³Z, gwRZ i“wP‡eva I gvbweKZvi m‡½ mvgšZš kwmZ cwiev‡ii

we‡iva I msNvZ Awbevh n‡q I‡V| cRv‡kvlY I cxo‡bi bviKxq c_ †m mn¨ I mg_b Ki‡Z cv‡iwb e‡j cwZev` K‡i‡Q| GB cwZev‡` †m Zvi fvB eskxjvj ev ¯x wKiY‡jLvi mvnvh¨ I mg_b cvqwb| KviY, Zviv †MvmvB M‡Äi nvj`vi ewoiB Ask| Zvi e¨w³Z GKK c‡Póvq Fedal Sstem-Gi wei“‡× †M‡Q|

Zvi †`vn‡PZbvi mwweK ewntcKvk N‡U‡Q M‡íi cwibv‡g| wcZvi gZ¨i ci Zvi Kvjvcvnvox AvPi‡Yi Rb¨ m¤úwË †\_‡K ewÂZ n‡q wbQK `Ô‡kv UvKvi gwmK †cbmbvi wnmv‡e w`bhvc‡bi Acgvb I M-wb e‡bvqwii e¨w³Z‡K cejfv‡e AvNvZ K‡i‡Q| †m wKiY‡jLv‡K m‡½ K‡i KjKvZvq wM‡q ¯Zš fv‡e DcvRb Ki‡Z †P‡q‡Q| GLv‡bI †m ¯xi KvQ †\_‡K cZ¨vL¨vZ n‡q‡Q| ga¨Ke‡Zi wbi“‡Ïk I DB‡ji NUbv †klchš e‡bvqwi‡K nvj`vi †Mvôxi wbivc` wbi“c`‡e¨i †Niv‡Uvc †_‡K g³ K‡i‡Q| nvj`vi †Mvôxi ÔAvagivÕ m`m¨‡`i ÔNvÕ †g‡i †m evPv‡Z cv‡iwb; wKš Zvi cPÛ cvYkw³ nvj`vi ewoi Ab I Ab¨vq mn¨ K‡iwb| e¨w³i m‡½ †Mvôxi msNv‡Z Zvi e¨w³Z we‡`vn †NvlYv K‡i‡Q|

ˆngšxi ¯fvewbwnZ g³wPšv I D`vqZvq Zvi ¯vgx Ac wew¯§Z I g³ n‡q ¯xKvi K‡i‡Q - ÒGB wMwibw›`bx m‡Z‡iv ermi Kvj Aš‡i ewn‡i KZ e‡ov GKUv gw³i g‡a¨ gvbl nBqv‡Q| Kx wbgj m‡Z¨ Ges D`vi Av‡jv‡K Zvnvi cKwZ Ggb FR ïå I mej nBqv DwVqv‡Q|Ó A\_P, Zv‡`i cwiev‡ii kvm‡ivax cwi‡e‡k ˆngšx ÒAš‡i Aš‡i gn‡Z gn‡Z gwi‡ZwQjÓ| ¯vgxi ¯fv‡ei `ejZv, e¨w³‡Zi `xbZv I †cŠi“‡li wb‡ðóZv Ges cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i e¨v`we`“c Am`vPiY ˆngšxi Rxeb‡K AcwPZ K‡i‡Q| cPwjZ mgvRe¨e¯vi k¶Lj †\_‡K gZ¨i wngkxZj AÂ‡j gw³ bvixi cwZev`x ¯i‡K ¯Zš gvÎv G‡b w`‡q‡Q|

Ô†evógxÕ M‡í (1321, Avlvp) cwZwbô Avb›`x cÎ we‡qv‡Mi `:L, †kvKZvc fj‡Z Ômv`vÕ ¯fv‡ei ¯vgxi wb‡`‡k ¸i“‡mevi ¸i“ `wqZ wb‡qwQj| wKš, †hw`b ¸i“VvK‡ii Ae`wgZ Kvgbv jvjmvi K`h I KrwmZ ewn:cKvk NUj| †mw`b Avb›`xi AvZ¥`kb I mZ¨`kb n‡jv| Zvi AvnZ AcgwbZ bvixmËv M"nZ¨vM‡KB †kq e‡j g‡b Kij| GB MnZ¨vM Avb›`xi cwZev`x †PZbviB ewntcKvk|

1321 e½v‡ãi kveY gv‡m †eij Ô¯xi cÎÕ| GB Mí bvixgw³i A‡gvN evbx, bvixi ¯vaxbZwcqvmx gvbwmKZvi AvfÁvb| A‡bK c‡i, 1928 mv‡j ÔmejvÕ KweZvq Kwe bvixi Revbx‡Z †j‡Lb -

ÒbvixK Avcb fvM¨ Rq Kweevi
†Kb bwn w`‡e AwaKvi
†n weavZv?
bZ Kwe gv_v
c_ cv‡š †Kb ie RwM
Kvš ˆah cZ¨vkvi ci‡Yi jwM
ˆ`evMZ w`‡b|Ó

GB `ß I AvZ¥cZ¨qx ¯i †kvbv †Mj 1914 mv‡j †jLv Ô¯xi cÎÕ M‡íi gY‡ji K‡Ú| gYvj m¤ú‡K iex›`bv_ e‡jb - Òc_g Awg †g‡q‡`i c¶ wb‡q ¯xi cÎ Mí evj| wewcb cvj Zvi cwZev` K‡ib|Ó ev¯weK, mgv‡Ri iYcšx‡`i Øviv G M‡íi welqfvebv KwVb e¨½ we`"‡ci wb›`vc‡¼ fvlZ nj| So DVj mgv‡jvPbvi| wKš', S‡oi †Lqvq mIqvi nIqv meRcÎ I

iex›`bv_ wbfxK| cÎ Aw½‡K DËg ci"lxq X‡O †jLv MíwU cwZev`-D‡Øj bvix mËvi we‡`v‡ni evZven| 27bs gvLb eovj †j‡bi kvm‡ivax cwi‡ek I cwiev‡i G‡m Dcw¯Z nj gYvj weev‡ni c‡i| msmv‡ii ^`bw›`b KvRKg I Ab¨vb¨‡`i AeÁv, gvbwmK jvÃbv, we`"c, KUw³ mn¨ K‡i LvIqv civi ¯v"Q‡›`¨i ga¨ w`‡q †m KwU‡q w`‡q‡Q| wKš, 27 bs ewoi cv‡Uvqwi ew×m¤úb m`m¨‡`i †_‡K ¯vfweK ew×evËi †Rv‡i gYvj wQj ¯Zš ÒH ew×Uv Avgvi GZB ¯vfweK †h †Zvgv‡`i NiKbvi g‡a¨ GZKvj KwU‡qI AvRI †m wU‡K Av‡Q|Ó GQvov, gYv‡ji Avi GKwU ¯vaxb †Î wQj| g‡bi wbfZ †Kv‡Y Av‡eMgq Abf‡e †m KweZvKÄ ^Zwi K‡iwQj - ÒAwg jwK‡q KweZv wjLZg| †m QvBcvk hvB †nvK-bv, †mLv‡b †Zvgv‡`i A›`ign‡ji cwPj I‡Vwb| †mB Lv‡b Avgvi gw³; †mB Lv‡b Awg Awg|Ó

g"Yv‡ji 27 bs-Gi e× Rxebhvc‡b gw³i AeKvk G‡b w`‡qwQj ¶wY‡Ki gvZ‡Zi Av¯v`| wKš' ÒmÜ¨vZvivi g‡Zv ¶YKv‡ji R‡b¨ D`q n‡qB Zvi MfRvZ Kb¨wU gvi †Mj|Ó djZ, gv nevi `:LUK †c‡j I gv nevi wPi¯vqx gw³UK Zvi Kv‡Q Aaiv †_‡K †Mj| ci"lkwmZ mgv‡R msmv‡i cwZe‡Z¨i K‡Vvi Av`k‡K wk‡ivavh K‡i e‡ov Rv‡qi g‡Zv KwU‡q w`‡Z civZ| Ôgw³Õ (1325 e½v‡ãi ^ekvL msL¨v, meRcÎ) KweZvi nZfwMbx bvixi g‡Zv gYvj I ej‡Z civZ - ÒAwg †Kej Rwb / ivavi c‡i LvIqv, Avevi LvIqvi c‡i ivav / evBk eQi GK - PvKvB‡ZB evavÓ| wKš, gYv‡ji N‡iB Gj Ôemš KvjÕ| we›`i Awefv‡e gvLb eovj †j‡bi `geÜ Kiv cwi‡e‡k gYvj †hb cvY †cj - ÒAvgvi msmv‡ii cvKv e‡›`ve‡¯i gvSLv‡b †Qv‡Uv GKULwb Rxe‡bi KYv †Kv_v †_‡K D‡o G‡m cojÓ| e‡ov Rv‡qi GB gv giv †evbwU fv‡q‡`i Abv`i AZ¨vPvi mn¨ Ki‡Z bv †c‡i gYv‡ji kïiewo‡Z Avkq wb‡jv| GLv‡bI mK‡jB D‡cv AeÁv K‡i, GK cKvi Av¯vK‡oiB †hb †m Dch³| Ggb Ae¯vq cig †mb‡n ggZvq gYvj Zv‡K N‡i I ü`‡q Avkq w`j| †mI Abfe Kij we›`i Abwej Ôfv‡jv evmviv `tmn †eMÕ - ÒGB fv‡jvevmvi wfZi w`‡q Awg Avcbvi GKwU ¯i/c †`Ljg hv Awg Rxe‡b Avi †Kvbw`b †`wLwb| †m Avgvi g³ ¯i/cÓ|

ci"l kwmZ mgvR bvixi ¯Zš AvZ¦cKvk I ¯vaxbZv‡K ¯xKvi Ki‡Z Pvq bv, gvb‡Z Pvq bv bvixi ü`qv‡eM‡K, Zvi g³ cv‡Yi Dj-vm‡K| cwZ c‡` c‡` †m ^Zwi K‡i ms¯vi, Abkvmb I bxwZwbq‡gi `jsN¨ ksLj I cvPxi| ci"l kvixwiK kw³i †kô‡Z Kv‡qg Ki‡Z Pvq GKwaZ¨| GB GKZidv †RviRei`w¯ gjK e¨e¯'vq mbvZb mgvR e¨e¯v ZiZwi‡q P‡j e‡U; wKš bvixRwZi GB Pig Aegvbbvq gvbemf¨Zvi PigZg Ae‡qi G GK wPi¯vqx e‡›`ve¯ bq wK? ¯xi c‡Îi gYvj ci"l RwZi Rei`w¯i cvKv e‡›`ve‡¯i wei"‡× I `vm‡Zi ksL‡ji wei"‡× cwZev` K‡i‡Q| kïiewoi †jvK‡`i nvZ †_‡K †m AvcvY †Póv K‡iI we›`‡K evPv‡Z cv‡iwb| cvMj ¯vgx I kïiewoi AZ¨vPvi cxob AeÁv mn¨ Ki‡Z bv †c‡i wbi"cvq Avkqnxb we›` c‡o g‡i gZ¨i †Kv‡j Avkq wb‡q‡Q| we›`i ggwšK cwiYwZ‡Z gYv‡ji mZ¨`kb n‡q‡Q| kïiewoi Kxe m`m¨‡`i AgvbweKZv, AmviZ I fÛwgi ¯i/c D‡b¥wPZ n‡q‡Q| ZvB, mvZvk b¤i gvLb eov‡ji A›`ign‡ji BUKv‡Vi AšivjeZx mg¯ evav wbqg, evav Af¨vm, evav ewj, evav gv‡qi bvMcvkeÜb‡K Z"Q, AMvn¨ I jsNb K‡i gYvj P‡j Gj - ÒAwg Avi †Zvgv‡`i †mB mvZvk b¤i gvLb eov‡ji Mwj‡Z wdie bv| Awg we›`‡K †`‡LwQ| msmv‡ii gvSLv‡b †g‡q gvb‡li cwiPqUv †h wK Zv Awg †c‡qwQ| Avi Avgvi `iKvi †bBÓ| e¯Z, mvZvk b¤i ewoi gvb‡li i³P, kvmb, KUv I m‡evcwi Rei`w¯ gYvj‡K µgk AÜKv‡i †V‡j w`w"Qj| we›`i

Av‡jvi g‡Zv ¶wY‡Ki A_P c`xß Awefve I AvKw¯§K cqv‡Y PwK‡Z msmv‡ii cPwjZ e¨e¯vi dwK aiv coj| cvq g‡i - _vKv gYvj we›`i gZ¨‡Z Rxe‡bi RqcZvKv Do‡Z †`‡L‡Q| ZvB, kx‡¶‡Î D`vi bxj AvKvk I Avlv‡pi †gN c‡Äi (MíwU kveY-G cKwkZ nq) mvg‡b `wo‡q gYv‡ji AvZ¥cZ¨qx ewjô bvixKÚ †NvlYv K‡i‡Q ÒAvR evB‡i G‡m †`wL, Avgvi †MŠie ivLevi Avi RvqMv †bB| Avgvi GB Abv`Z i¡c hvi †Pv‡L fv‡jv †j‡M‡Q, †mB m›`i mg¯- AvKvk w`‡q Avgv‡K †P‡q †`L‡Qb| GB evi g‡i‡Q †g‡RveDÓ| Abš- AvKvk Z‡j GB ckvš- gv³‡Z gYvj †g‡Rv‡eŠ wnmv‡e msmv‡ii cvZ¨wnK w`bhvc‡bi M-wb †g‡b wb‡Z cv‡iwb| ci"lkwmZ ci"lwbqwšZ cwievi I mgv‡Ri Avkq †_‡K weh³ nevi ¯úwaZ B"Qv cKvk K‡i e‡j‡Q - Ò†Zvgv‡`i PiYZjvkqwQbÓ| PiYZ‡ji Avkq Avm‡j c``wjZ I Acgv‡bi Avkq| GB Acgv‡bi I AeÁv †_‡K gv³i evmbv g"Yvj‡K cwZev`x bvix wnmv‡e Dcw¯Z K‡i‡Q| M‡íi †hLv‡b †kl †mLvb †_‡K Ôbvixô gYv‡ji bZb Rxe‡bi c_ Pjv Avi¤|

A‰ØZPi‡Yi msmv‡i Avmvi ci †_‡K †MwK, †eMm, Be‡mb, A‰ØZm¤c`vq, gv‡Qi KPwi I wewjwZ Avgovi PvUwbi Pv‡c c‡o Awbjvi e¨v³mËv Aj‡¶¨ bwfkvm ZjwQj| Rxe‡bi mnR ¯vfweK Q›` I ùwZ e¨vnZ nj| ¯vgx wnmv‡e A‰Ø‡Zi e¨v³Z I gvbwmKZvi `xbZv Awbjv‡K µgk AšgLx K‡i‡Q| †m c‡iwn‡Zi nvZ †_‡K Awbjv‡K †c‡j I Zvi weavZvi nvZ †_‡K Zv‡K MnY Kivi †Kv‡bv gj¨B †m †`qb| djZ: Zv‡`i `v¤úZ¨ m¤úK A‰ØZPi‡Yi wbqšYvax‡b hwšK n‡q †M‡Q| Awbjvi Aw¯Z msmv‡ii MÛx‡Z G‡Kev‡i †n‡kj e›`x| ¯vgxi ûKg cvjb Ki‡Z Ki‡Z †K‡U †M‡Q Rxe‡bi 8 wU eQi ivavi ci LvIqv Avi LvIqvi ci ivav| nVvr GKw`b cqjv b¤i ewo‡Z †`Lv †Mj wmZvsï‡gŠjxi cvYPÂj Dcw¯wZ| Zvi †jLv ¯§wZfiv wPwV Ges fvB m‡iv‡Ri AvZ¥nZ¨v Awbjv‡K Ni msmvi †Q‡o †h‡Z eva¨ K‡i‡Q| †m KvD‡KB aiv bv w`‡q wbi"‡Ïk n‡q‡Q, Dfq‡KB cZ¨vLvb K‡i‡Q| wKš, †m Ni Qvovi Av‡M MnYv mn h_vme¯ GgbwK wmwK `qwbwU †i‡L †M‡j I maev bvixi wPý nv‡Zi kvLv I †bvqv m‡½ wb‡q‡Q| gYvj Ô†gReDÔ g‡Q †d‡j ¯vgxi PiYZjvkqwQb n‡Z †c‡i‡Q| cvš‡i Awbjv wK weevne¨e¯'v‡K ¯xKvi K‡iI Ni †Q‡o‡Q? DËiUv Ab"QwiZ I A¯úó †_‡KB hvq| †eva nq, ci"‡li jäZv I D`vmxbZvi wei"‡× mwweK cwZev` Rwb‡q Awbjv Ni †Q‡o Avcb fvM¨Rq Kivi AwaKvi AR‡b m‡Pó n‡Z †P‡q‡Q|

cPwjZ weevn e¨e¯vi g‡a¨ †h AmsMwZ, dwK I bvix‡Zi Am¤§vb i‡q‡Q, Zvi wei"‡× `wo‡q gYvj, Awbjv Ni †Q‡o‡Q| Ab¨w`‡K AcwiPZv M‡íi (1321, KwZK) Kj¨vYx ˆeewnK c_v‡KB A¯xKvi I AMvn¨ K‡i‡Q| we‡qi Avm‡i MnYvi ¸Yv¸b I gj¨gvb wePv‡i cvÎc‡i Agvbwe‡K AvPiY k¤bv_‡K Povš wm×vš Mn‡Y eva¨ K‡i‡Q| we‡eKnxb, †jvfx cwiev‡i †g‡qi weevn bvKP K‡i w`‡q‡Qb we‡qi Avm‡i| Kj¨vYxI †mB c‡_ †n‡U‡Q| †h mgv‡R weevn-e¨e¯v Aw_K †jb‡`‡b, cYc_vi k¶L‡j `wU ü`q I cwievi‡K eva‡Z Pvq, †mB wbqg I e¨e¯v‡K gvb‡Z cv‡iwb Kj¨vYxi mgvRwe‡`vnx gb| Avi cv‡iwb e‡jB Abc‡gi m‡½ m¤Ü †f‡O hvevi ci †m Avi †Kv‡bw`b weevn-eÜ‡b Ave× nqwb| GgbwK, K‡qK eQi c‡i Abcg hLb Zvi gvgvZ‡ši wb‡l‡ai Rvj wQ‡o †ewi‡q G‡m Kj¨vYxi cwY cv_bv K‡i‡Q, ZLb †m Abc‡gi AbZß ü`‡qi Av‡e`b cZ¨vL¨vb K‡i‡Q| GB Abgbxq g‡bvfv‡e Kj¨vYxi ü`qa‡gi cKZ MwZwewa †evSv m¤e nq bv| Z‡e, GUv †ek Av›`vR Kiv hvq †h, †m ci"‡li ev ci"lkwmZ mgv‡Ri B"Qv Awb"Qvi Dci wb‡Ri Rxeb‡K †Q‡o w`‡Z iwR bq| Zvi wbR¯ wPšv fvebvi RMr

Av‡Q| wb‡Ri †evaKwi wb‡Ri AwaKvi AR‡b †m AvZ¥bfikxj n‡Z Pvq e‡jB Ggb K‡Vvi Abgbxq wm×vš| ZvB, bvix‡`i wkv`v‡bi eZ MnY K‡i ev ¯‡`‡ki †mevq mvej¤x n‡Z cqvmx| Awbjv ev gYvj N‡ii †PŠKvV †cwi‡q D`vi AvKvk Z‡j ev evB‡ii RM‡Z G‡jI Gici Zviv †Kvb c‡_ Rxe‡bi Pjv ïi“ Kij| Zvi m¯úó Bw½Z ev Avfvm MíKvi †`bwb| wKš ÔAcwiwPZÕ M‡íi Kj¨vYxi ga¨ w`‡q iex›`bv_ h_v_ GK KgPÂj bvixi Qwe AvK‡jb, †h Avgovi PvUwb ev NiKbvi †eówb‡Z Ave× _vK‡Z Pvq bv| Z‡e, GKUv ck DV‡ZB cv‡i †h, ¯‡`k †mevi m‡½ weev‡ni †Kv‡bv we‡iva wK Av‡Q? meRcÎ c‡e †jLv Mí¸wj‡Z A‡bK‡¶‡Î Ggb A‡bK ckB DwK w`‡Z cv‡i| Z‡e, GKUv e¨vcv‡i iex›`bv_ cvMMmi| weevn, `v¤úZ¨ m¤úK, bvix-ci“l m¤úK cfwZ welq¸wj‡K †K›` K‡i †h mgm¨v I mgva‡bi c_‡iLv Mí¸wj‡Z wb‡`wkZ n‡q‡Q, Zv‡Z AvMvgx w`‡b bvix-gw³ Av‡›`vj‡bi †gŠj ck¸wjI Ašjxb n‡q Av‡Q| hvB †nvK, ÔmeRcÎÕ c‡e iex›`bv_ mgvR I e¨w³i msNv‡Z cwZev`x e¨w³gvb‡mi ¯i¡c‡K †QvUM‡íi Aeq‡e cwZdwjZ K‡i‡Qb|

\ Z_¨mÎ \

1. iex›`iPbvejx (mjf ms¯‹iY) Øv`k LÛ; wekfviZx MšY wefvM; 1397

2. iex›`elcwÄ - cfvZKgvi g‡Lvcva¨vq; †`ÔR cvewjwks; 2007

3. iex›`bv_ I †bv‡ej ci¯‹vi t mgKvjxb Z_¨ - msKjb I m¤úv`bv wewRZKgvi `Ë; cwðge½ evsjv GKv‡`wg; 2005|

4. exiej I evsjv mwnZ¨ - Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq; †`ÔR cvewjwks; 2003|

5. ceÜ msMn, cg_ †PŠaix; wekfviZx Mšb wefvM; 2013|

বিশ্ব-ছোটগ-ল্পর ধারা ও রবীন্দ্রনাথ

পীযূষকান্তি অধিকারী

ছোটগল্প সাহি-ত্যর অতি গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল শাখা। সাহি-ত্য এই ছোটগল্প হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। মানুষ গল্প শুন-ত ভা-লাবা-স। আর এই ভা-লাবাসার প্রবৃত্তিগত অ-মাঘ টা-ন সৃষ্টির কোন্ আদিম ঊষায় ছোটগ-ল্পর উদ্ভব হ-য়ছিল তা বলা অসম্ভব। মানু-ষর চেতনা জাগর-ণর সা-থ সা-থ তার কিছু একটা শুনার আগ্রহ বে-ড়-ছ। এই শুনার বাসনা থে-কই ধী-র ধী-র গল্প শুনবার প্রবৃত্তি জন্মায়। পৃথিবীর সব দে-শই অসংখ্য আদি গল্প প্রচলিত আ-ছ। লোককথা তথা লোকসাহিত্যই আদি গ-ল্পর আঁতুরঘর। অ-পক্ষাকৃত আধুনিক লেখক এইসব আদি গল্পগুলি-ক ভাষারূপ দি-য়-ছন। এইসব লোককথার আকৃতি ও প্রকৃতির ম-ধ্যও অ-নক পার্থক্য আ-ছ। এই গল্প কখ-না প্রচারিত হ-য়-ছ রূপকথার (Fairy tale) আকা-র, কখ-না পশুপক্ষিঘটিত নীতিমূলক কথার (Fable) ম-ধ্য, কখ-না লোকগীতিকার (Ballad) ম-ধ্য, কখ-না লৌকিক পুরা-ণ (Myth), কখ-না জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকায় (Tale),কখ-না বা উপকথা, ধর্মকথার মোড়-ক। ত-ব বিভিন্ন শ্রেনির গল্প বলার এই শৈলীর ম-ধ্য একটা মিল ছিল। আর এই মিল হল কাহিনী রচনার অসীম আগ্র-হ। আস-ল গল্প বলার বিচিত্র বিভাগগুলি হল তৎকালীন সম-য়র গ-ল্পর নানা প্রকরণ।

এরপর সৃষ্টি-পরবর্তী নানা পর্ব অতিক্রম ক-র মানুষ যখন প্রস্তর যু-গ এ-স পৌঁছাল, তখন প্রকৃতিই ছিল তা-দর কা-ছ বড় এক বিস্ময়। এই মহাশক্তি প্রকৃতি-ক কেন্দ্র ক-রই মানু-ষর প্রথম কল্পনা, দেবতাবাদ নানা রক-মর কাহিনি রচনায় সাহায্য ক-রছিল। ''সব-চ-য় বিস্ময়কর ছিল সূর্য। সূর্য প্রাণ, শক্তি, পরমায়ু- সূর্য জগৎ প্রকাশ, তিমিরান্তক তার রশ্মি-লখা। তাই এই দু-লাক বিহারী জ্যোতির্ময় সূর্য-ক ঘি-র দেশ--দশান্ত-র রচিত হল অজস্র কাহিনি।''[১] ঋক্-ব-দ প্রকৃতির প্রতি মানু-ষর মুগ্ধতা শুধু কাব্যরূপ লাভ ক-রনি, বিভিন্ন উপাখ্যা-ন রীতিম-তা পাওয়া যায় গ-ল্পর স্বাদ। যেমন- ইন্দ্র ও বৃ-ত্রর উপাখ্যান, পুরূরবা-উর্বশী আখ্যায়িকা ইত্যাদি। বেদ পরবর্তী উপনিষদ, পুরা-ণ অজস্র নীতি-উপ-দশ থাক-লও তা মুক্ত রসধারার গতি-ক কখ-না রুদ্ধ ক-রনি। তাই-তা আধুনিক গল্পকারগণ তাঁ-দর গ-ল্পর উপাদান সংগ্র-হর আশায় আ-জা দেশ-বি-দ-শর পুরাণ ভূমি-ত সগ-র্ব বিচরণ ক-রন।

লোককথার নানা বিভা-গর ম-ধ্য রূপকথাই কল্পনার ঐশ্ব-র্য সব-চ-য় বেশি সমৃদ্ধ। রূপকথার কল্পনা হা-মশাই পক্ষীরা-জর ঘোড়ায় চ-ড় সাত সমুদ্র তে-রা নদী পার হ-য় দিগন্তবিস্তৃত তেপা-ন্তর মাঠ অতিক্রম ক-র অচীন দে-শর রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাণী, রাজা, রাজার মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র সক-লর স-ঙ্গ শ্রোতা-ক পরিচয় করি-য় দেয়। রূপকথার এক অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দ-র্য্যর জগ-ত মানুষ-ক পৌঁ-ছ দেয়। রূপকথা বিভিন্ন অসাধ্য বাহ্যিক মু-খা-শর আশ্রয় নি-য় শ্রোতার হৃদ-য়র স-ঙ্গ এর প্রকৃত বন্ধ-নর কথা আড়াল কর-ত চায়। ত-ব এই মু-খাশ স-র গে-লই এর প্রকৃত রূ-পর স-ঙ্গ যোগা-যাগ সার্থক হয়। এই রূপকথার ম-ধ্য ছো-টা গ-ল্পর উপাদান যেমন আ-ছ, তেমনি কাহিনির আ-ছ উদার-মুক্ত দিগন্ত প্রসারিত স্বপ্ন। আবার লোকসাহি-ত্যর গীতিকাগুলি (ballads) সুন্দর সুন্দর গ-ল্পর উপাদা-ন সমৃদ্ধ। যেমন-'মৈমনসিংহ গীতিকা'। এটি ষোড়শ-সপ্তদশ শত-কর নাম না জানা কৃষক কবি-দর লেখা গীতি আখ্যায়িকা সঙ্কলন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কাহিনির নাটকীয়তা, বেশ সংহত একমুখী পরিণতি, তীব্র ঘটনা-স্রাতসহ বস্তুমুখী ভাবনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক ছোটগ-ল্পর উপাদানগুলি-ক বারবার স্মরণ করি-য় দেয়।

আধুনিক ছোটগল্পাকারগণ লোকসাহি-ত্যর বিভিন্ন বৈচি-ত্র্যর কা-ছ যেমন অসীম ঋ-ণ ঋণী, -তমনি আমা-দর দে-শর প্রাচীন নীতি-উপ-দশমূলক কাহিনিগুলির কা-ছ কম ঋণী নয়। 'পঞ্চতন্ত্র' রচয়িতা বিষ্ণু শর্মার 'হি-তাপ-দশ' ও 'জাতক' কাহিনিগুলি-ত ধরা প-ড়-ছ দৈনন্দিন জীব-ন মানু-ষর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-

বেদনা, হাসি-কান্নার ছবি, যা-ত আধুনিক ছোটগল্প সৃষ্টির রস-দর সন্ধান দেয়। বৌদ্ধ জাতক কাহিনিগুলি আমা-দর দু-চা-খ আঙুল দি-য় দেখি-য় দেয় গেরুয়া পোশা-কর আড়া-ল সন্ন্যাসীর নগ্ন-ভন্ড রূপটি-ক। মানু-ষর প্রতি সীমাহীন ভা-লাবাসা ও দায়বদ্ধতাই হল এধর-নর মহৎ সৃষ্টির উৎস। আবার গুণা-ঢ্যর -লখা 'বৃহৎকথা', দন্ডীর রচিত 'দশকুমার চরিত' ও বানভ-ট্টর -লখা 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ-ল্পর পর-ত পর-ত ছোটগ-ল্পর বীজ নিহিত আ-ছ। এ প্রস-ঙ্গ বি-শষ ক-র ম-ন প-ড় যায় 'আরব্য উপন্যাস'-এর কথা। পারস্যভাষায় রচিত বিচিত্র চরিত্র ও উপাখ্যা-ন সমৃদ্ধ রোমান্স 'আরব্য উপন্যাস'। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার সূত্র ধ-রই আরব্য উপন্যা-সর উদ্ভব। নিজ স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতি-শাধ নি-ত রাজা শাহরিয়ার রোজ রা-ত একজন ক-র সুন্দরী তরুণী-ক বি-য় ক-র ভোর হবার আ-গই তার শি-রা-শ্ছদ ক-র বিকৃত আনন্দ উপ-ভাগ কর-তন। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় মন্ত্রী কন্যা শহরজাদী নি-জর ইচ্ছায় রাজা-ক বি-য় ক-রন এবং এক হাজার এক রাত্রী ধ-র রাজা-ক মন্ত্রমুগ্ধ কর-তন বিচিত্র গল্প শুনি-য় শুনি-য়। এই অপরূপ গদ্য রোমা-ন্সর বর্ণময় সৌন্দর্য-রহ-স্য ঘেরা পটভূমি, আধুনিক ছোটগল্পাকার-দর প্রেরণা জুগি-য়-ছ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব-ল-ছন : ''কেন জানি-ন, ম-ন হয় এই রকম সোনালি রৌ-দ্র ভরা দুপুর বেলা দি-য় আরব্য উপন্যাস তৈরি হ-য়-ছ---- অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা-আঙু-রর গুচ্ছ, গোলা-পর বন, বুলবু-লর গান, শিরা-জর মদ,---মরুভূমির পথ, উ-টর সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজু-রর ছায়ায় স্বচ্ছ জ-লর উৎস,--- নগ-রর মা-ঝ মা-ঝ চাঁ-দায়া-খাটা-না সংকীর্ণ বাজা-রর পথ, প-থর প্রা-ন্ত পাগড়ি এবং ঢি-ল কাপড়-পরা দোকানী খর্মুজ এবং মেওয়া বিক্রি কর-ছ; প-থর ধা-র বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিত-র ধূ-পর গন্ধ, জানালার কা-ছ বৃহৎ তাকিয়া কিংখাব বিছা-না; জরির চটি, ফু-লা পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলিপরা আমিনা জো-বদি সুফি, পা-শ পা-য়র কা-ছ কুন্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়া-চ্ছ, দরজার কা-ছ জমকা-লা কাপড়পরা কা-লা হাব্সি পাহারা দি-চ্ছ। এবং -সই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দে-শ, এই ঐশ্বর্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসা-দ মানু-ষর হাসি কান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নি-য় কত শত সহস্র রক-মর সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হ-চ্ছ।''[২]

আমরা জানি আরব্য উপন্যা-সর মূল কথাবস্তুর ম-ধ্য রূপকথা, রোমান্স ও বাস্তবতা--এই তিনটি ধারা বি-শষভা-ব লক্ষিত হয়। আর এইসব ধারা ভারতীয় গ-ল্পর উপাদা-ন এ-স নবজন্ম লাভ ক-র। তাই-তা আরব্য উপন্যা-সর কাহিনিগুলি বহু প্রাচীন উপকরণ নি-য়ও যু-গ যু-গ আস্বাদ-ন চির নতুন। অন্যদি-ক আরব্য উপন্যা-সর আদ-ল পারস্য উপন্যাস রচিত হ-লও এ-ত নারীর পুরুষ বি-দ্বষ-কই -দখা-না হ-য়-ছ। কাশ্মীররাজ দুহিতা ফ-রাখনা-জর পুরুষ বি-দ্বষ পারস্য উপন্যা-সর মূল উপজীব্য বিষয়। ত-ব ধাত্রীর মু-খ পুরু-ষর পবিত্র প্রেম ও আত্মত্যা-গর কাহিনি শু-ন তিনি শেষ পর্যন্ত হিরা-টর রাজপুত্র-ক বিবাহ কর-ত সম্মত হ-লন। আর এই সার্বিক প্র-চষ্টার ফলশ্রুতিরূ-প আরব্য রজনীর মোহ নতুন ক-র -দখা দি-য়ছিল নবজাগ্রত ইতালীয় আকা-শ-বাতা-স। আর সেই মোহ হু হু ক-র ছড়ি-য় প-ড়ছিল পশ্চিম ইউ-রা-পর কাব্যকথায় ও রোমান্স কাহিনি-ত সর্বত্র। তা স-ত্ত্বও আধুনিক মানু-ষর জ্ঞা-নর খোরাক -মটা-ত পা-রননি বিষ্ণু শর্মা, মেটা-ত পা-রননি উজ্জয়িনীর উদয়ন-কথাকবিদ গ্রাম বৃদ্ধগণ, মেটা-ত পা-রনি মন্ত্রীকন্যা শহরজাদীর হাজার এক রাত্রির কাহিনিও। আস-ল এখন মানু-ষর জীবন শুধু গ-ল্পর ফ্রে-ম বাঁধা জীবন নয়, এ এক অন্তর্জীবন। আর এই জীব-নর ক্ষেত্র প্রসারিত হল মানু-ষর বিভিন্ন আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও অভিযা-নর মাধ্য-ম। আমরা পেলাম নবজাগ্রত ইতালির বোকাচ্চিওর নবযু-গর গল্প, পেলাম চসা-রর ক্যান্টার-বরির তীর্থযাত্রী-দর, যারা মানব চরি-ত্রর সূক্ষ্ম বি-শ্লষ-ণ সফল। আধুনিক ছোটগ-ল্পর কথামুখ এভা-বই রচিত ও পল্লবিত হ-য়ছিল।

আধুনিক ছোটগ-ল্পর (Short story) বিকা-শ নবজাগ্রত ইউ-রা-পর অবদান অনস্বীকার্য। ইউ-রা-পর রে-নসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ এ-সছিল আনুমানিক চতুর্দশ শত-ক। এই সম-য়র শ্রেষ্ঠ গল্পকার বোকাচ্চি-য়ার

(১৩১৩-৭৫) লেখাগুলি হল Filocolo, Filostrato এবং দেকা-মরণ। অ-নক পন্ডি-তর অভিমত এই যে, দেকা-মরণই আধুনিক -ছা-টাগ-ল্পর প্রথম স্মারক। শতগ-ল্পর সংগ্রহ 'দেকা-মর-ণ' গল্পকার আ-বগ-কল্পনা-নীতি-উপ-দ-শর সরল-তরল প-থ না চ-ল শানিত শ্লেষ মিশ্রিত ভাষায় বিদ্রূপ-কৌতু-কর মাধ্য-ম সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসংগতিগুলির মূ-ল নির্মম কুঠারাঘাত ক-র-ছন। লক্ষ্যণীয় বিষয়, বর্ণনার চাতু-র্য গল্পরস কিন্তু কখ-না এতটুকুও আহত হয়নি। বোকাচ্চিও -য কত বড় মা-পর আধুনিক ছোটগল্পর তা J. M. Cohen-এর বর্ণনায় ধরা প-ড়-ছ এইভা-ব : "All the stories are short and there stings are all in the tail. Boccaccio is a master of the unexpected 'denouement'. Caring less for character and motive than for the turn of event, he can afford to make his people behave arbitrarily. When they are serious they are mere eccentrics! When most lively they are broadly comical."[৩] এরপর জিও-ফ্র চসার (1340 ?—1400) ছোটগ-ল্পর ক্ষেত্র-ক সমৃদ্ধ কর-লন 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা' 'দি লি-জন্ড অব্ গুড উই-মন' এবং অসমাপ্ত 'ক্যান্টার-বরি 'টলস্' গ্রন্থগুলি লি-খ। তাঁর সব-চ-য় উজ্জ্বল সৃষ্টি অসমাপ্ত 'ক্যান্টার-বরি টেলস্'-এ আমরা জান-ত পারি ইংল-ন্ডর বিভিন্ন শ্রেণি ও সমা-জর প্রতিনিধি স্থানীয় বত্রিশ জ-নর ক্যান্টার-বরি নামক তীর্থদর্শ-নর কা-ল যাত্রাপ-থর অভিজ্ঞতার গল্প। আধুনিক ছোটগ-ল্পর বলিষ্ঠ সম্পূর্ণ বিকাশ তাঁর গ-ল্প না থাক-লও কাহিনি-ঘটনা- চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতা, সুগভীর পর্য-বক্ষণ শক্তি, সেই স-ঙ্গ সংস্কারমুক্ত মানবিক জীবন-বাধ তাঁ-ক এবং তাঁর সৃষ্টি-ক অমর ক-র রে-খ-ছ। শ্র-দ্ধয় রথীন্দ্রনাথ রা-য়র মূল্যায়ণ হল : ''ক্যান্টার-বরি টেলস্' কাব্য, কিন্তু কল্পনাবিলাস কাহিনিগুলি-ক আকাশবিহারী ক-র তো-লনি। চসা-রর প্রতিভার স-ঙ্গ ঔপন্যাসিক বা গল্পাকা-রর প্রতিভার একটি আত্মিক সম্পর্ক আ-ছ। ছন্দবদ্ধ কা-ব্য তিনি প্রকারান্ত-র ছো-টাগ-ল্পর অনাগত সম্ভাবনারই ইঙ্গিত ক-র-ছন। তীক্ষ্ম বি-শ্লষণ ক্ষমতা, নিপুণ পর্য-বক্ষণশক্তি, গল্প বলার অনায়াস-সাবলীলতা, সংস্কারমুক্ত উদার জীবন দৃষ্টি 'ক্যান্টার-বরি টেলস্'-কে সার্থক ছোটগল্প সঙ্কল-নর মর্যাদা দি-য়-ছ।''[৪] ইং-রজ সমা-লাচক Ifor Evans ব-ল-ছন : "His quick, sure strokes portray the pilgrims at once as types and individuals true to their own age and, still more, representatives of humanity in general."[৫]

আমরা ইউ-রা-প রে-নসাঁ-সর পদসঞ্চার শুন-ত পেলাম। রে-নসাঁ-সর প্রথম আ-লা এ-স প-ড় ইতালি-ত। রে-নসাঁ-সর আ-লাকছটা ব্যাপক আকা-র আছ-ড় প-ড় ফরাসী দে-শ। সম্রাট প্রথম ফাঁ-সায়ার রাজত্বকালই ফরাসী রে-নসাঁ-সর স্বর্ণযুগ। সম্রাট স-হাদরা নাভা-রর রানী মারগুই-র (১৪৯২-১৫৪৯) বোকাচ্চিওর 'দেকা-মরণ'-এর আদ-ল সাত দি-নর বাহাত্তরটি কাহিনির সঙ্কলন 'হেপ্তা-মরণ' রচনা ক-রন। তাঁর গ-ল্পর রচনা শৈলী ধার করা হ-লও বিষয়বস্তু নির্বাচ-ন মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। সমাজ জীব-নর লাম্পট্য, নর-নারীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, যাজক-সম্প্রদা-য়র নৈতিক আদর্শহীনতা প্রভৃতি ছোটগ-ল্প তু-ল ধ-র তিনি আদর্শ সামাজি-কর ভূমিকা অবলম্বন ক-র-ছন। তিনি প্লে-টানিক প্রেম-দর্শ-ন আস্থা দেখা-লও, বাস্তব ক্ষে-ত্রর স-ঙ্গ এই আস্থার সংঘাত চো-খ পড়ার ম-তা। বস্তুত: মারগুই-র-তর আত্মিক অসীম রহস্যই তাঁর গল্পগুলি-ত ভাষা পে-য়-ছ : " She retains a good deal of the medieval amour courtois ideal; love can only exist outside marriage. At the same time she is enough of a realist to see that life is not like that, and the conflict that goes on in her own mind is dramatized in the members of the band, who each represent a different attitude."[৬]

আবার ফরাসী গদ্য সাহি-ত্যর মুক্তিদাতা হ-লন রে-নসাঁস কা-লর বিখ্যাত লেখক ফ্রাঁ-সায়া র‍্যা-বল (১৪৯৪-১৫৫৩)। সারাজীবন ধ-র অ-নক নিন্দার বোঝা বহন করা এই ব-রণ্য লেখক দৈত্য ও

দৈত্যপু-ত্রর কাহিনি নি-য় পাঁচ খ-ন্ড যে গদ্য মহাকাব্য লে-খন তাহল 'গারগাঁতুয়া ও প্যাঁতা গ্রু-য়ল'। তাঁর পাঁচটি গ্র-ন্থর প্রথম চারটি কুড়ি বছ-রর (১৫৩২-১৫৫২) সাধনার ফসল। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খন্ডটি মৃত্যুর পর ১৫৬৪ সা-ল প্রকাশিত হয়। সম্ভবত অন্য কেউ তাঁর অসমাপ্ত পান্ডুলিপি সমাপ্ত ক-রন। র‍্যা-বল নি-জ ধর্মযাজক ছি-লন। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরি-খ গীর্জা-ম-ঠর জীবন-ক তিনি নির্মম নৈপু-ণ্য তু-ল ধ-র-ছন তাঁর সৃষ্টির ম-ধ্য। কাহিনিকার হি-স-ব তিনি বড়ই দুর্বল ছি-লন। ত-ব সংলাপ রচনায় যাদুকরী ক্ষমতা প্র-য়া-গ তাঁর সাহিত্য এক অন্যমাত্রা পে-য়-ছ। বিশ্বসাহি-ত্যর ঊষাল-গ্ন তাঁর এই গুণ অতুলনীয়। তিনি যে ফরাসী সাহি-ত্য প্রথম আধুনিক লেখক এ-ত কো-না স-ন্দহ নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হল, রে-নসাঁ-সর আ-লাকদ্যুতি প্রথম ইতালি থে-ক ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ড হ-য় ফ্রান্স, ফ্রান্স থে-ক তা সার-ভ-ন্ত-সর (১৫৪৭-১৬১৬) হাত ধ-র ছড়ি-য় পড়ল তামাম স্পে-ন। স্পেনীয় কথাসাহি-ত্যর অগ্রদূত সার-ভ-ন্তস দু'খ-ন্ড লিখ-লন 'ডন কুইক-সাট'। এছাড়া তাঁর ছোটগ-ল্পর সংকলন হল "Exemplary Novels"। এই গ্র-ন্থ উদ্ভট বিলাসী ছা-ত্রর কাহানি, জিপসি মে-য়র আ-বগপূর্ণ গীতি-ধর্মী প্রণয় কাহিনি প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁর সমাজ স-চতন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন ক-র। আর সামগ্রিকভা-ব নতুন যু-গর কথাসাহি-ত্যর বলিষ্ঠ ক্ষেত্র তৈরি হল বোকাচ্চি-য়ার সাবলীল কাহিনি রূপায়-ণ, চসা-রর অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির মহৎ গু-ণ, র‍্যা-ব-লর কৌতুক ও সংলাপ সৃষ্টির যাদুর স্প-র্শ এবং সার-ভ-ন্ত-সর সহজ-সরল-সাবলীল রচনারীতির উপর ভর ক-র দাঁড়ি-য়। এ-কবা-র জ-লর মত সহজ ভাষা প্র-য়া-গর দ্বারা জীব-নর অর্জিত অভিজ্ঞতা-ক তাঁর সৃষ্টির ম-ধ্য তু-ল ধ-র-ছন ব-লই আধুনিক কা-লও তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা প-ড়নি। এখা-নই সার-ভ-ন্ত-সর তুলনা একমাত্র সার-ভ-ন্তস নি-জই। এরপর ইংল-ন্ডর শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রা-ন্স ফরাসী বিপ্ল-বর প্রেক্ষাপ-ট মানু-ষর জটিল জীব-নর বাস্তব চিত্র সামগ্রিক ভা-ব ছো-টাগল্প রচনায় যে পরি-বশ সৃষ্টি ক-র ঊনবিংশ শত-ক তা যৌবনা-বগ পায়।

আধুনিক ছোটগ-ল্পর জন্মলগ্ন ঊনবিংশ শতাব্দী। ফরাসী-দ-শ। কথাসাহি-ত্যর অন্যতম শাখা উপন্যা-সর জন্ম ও পথচলা শুরু অষ্টাদশ শত-ক। রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ণ, জেন অ-স্টন, স্কট প্রমুখ বিখাত ঔপন্যাসি-কর প্রতিভার স্প-র্শ ইং-রজী উপন্যা-সর আদিপ-র্বর প্রাণ প্রতিষ্ঠায় কথাসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ হ-য়ছিল। বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ফরাসীয় ব্যালজাক্ (১৭৯৯-১৮৫০) সর্ব-দ-শ সর্বকা-লর কথাসাহি-ত্যর আকা-শর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় সমান দক্ষ ছি-লন। তাঁর বেশকিছু ছোটগল্প পূর্ণ উপন্যা-সর পূ-র্ব লেখা হ-য়-ছ। তিনি পাঠকবর্গ-ক উপহার দি-য়-ছন 'The Unknown Masterpiece', 'The Fatal Skin', 'An Episode of the Reign of Terror', 'A Passion in the Desert' প্রভৃতি অসংখ্য উ-ল্লখ-যাগ্য ছোটগল্প। আবার ভিক্টর হু-গা, মুস-স (Musset), জর্জ সাঁদ (George Sand) প্রমু-খরা ছোটগল্প লিখ-লও প্রতিভাধর লেখক প্রস্পার মেরি-মর (১৮০৩-৭০) প্রতিভার পরশমণির স্প-র্শ সেকা-লর ছোটগল্পরূপ লোহাখন্ড অমূল্য সোনায় পরিণত হয়। তিনিই হ-লন আধুনিক ছোটগ-ল্পর আদর্শ কৌশ-লর জন্মদাতা। এক-একটি সামান্য বিষয়-ক অবলম্বন ক-র অসাধারণ গল্প-লখার ক্ষমতা ছিল মেরি-মর। সুধী সমা-লাচ-কর ভাষায় : "Great as balzac and Hugo are in General literature, they have not so high a position in the special art of the short as prosper Merimee has.Merimee is the creator of modern Conte."7 ay¡l 'Mateo Falcon' গ-ল্প আদিম সংস্কার প্রবণতা ও আত্ম-বা-ধর কা-ছ পুত্র-স্নে-হর হার মানার কাহিনি। আবার ক্রীতদাস-ব্যবসার করুণ চিত্র ফু-ট উ-ঠ-ছ 'Tamang' গ-ল্প। 'The Blue Room', 'The Game of Backgammon', 'Thr Etruscan Vase' প্রভৃতি গ-ল্প আদর্শ ছোটগ-ল্পর বৈশিষ্ট্যগুলি দারুণভা-ব ফু-ট উ-ঠ-ছ। সমা-লাচ-কর ভাষায় : "He did, in fact, fix the form of the modern short story : a condensed plot; a sense of atmosphere

suggested by a selective choice of striking details; rapidity of action; sobriety of style; general economy."৮

উনিশ শত-কর আ-রকজন ছোটগল্পাকার হ-লন Theophile Gautier(1811-72)। তিনি সাহিত্য রচনায় " Art for Art's sake' নীতি-ত বিশ্বাসী ছি-লন। চিত্রশিল্পী কথা সাহিত্যিক গোতি-য়র "The Mummy's Fool', 'The Pavilion of the Lake', 'The Nest of Nightingales' প্রভৃতি ছোটগ-ল্প কথাদি-য় তিনি যে ছবি এঁ-ক-ছন তা-ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসত্যই ফু-ট উ-ঠ-ছ অকলঙ্ক রেখায়। এই শত-কর দ্বিতীয়া-র্ধ ছো-টাগল্পাকার জোলা (১৮৪০-১৯০২) 'ন্যাচারালিস্ট স্কুল' না-ম একঝাঁক লেখক গোষ্ঠী-ক নি-য় প্রকাশ ক-রন " Les Soirees de Medan" না-ম একটি গল্পসংকলন। ১৮৭০ খ্রীষ্টা-ব্দর ফ্রা-ঙ্কা-পুশিয়ান যু-দ্ধর পটভূমিকায় প্র-ত্যক যোদ্ধার লেখায় সমৃদ্ধ এই সঙ্কলন গ্র-ন্থর -শ্রষ্ঠ গল্পটি হল মোপাসাঁর "Build de suif ' (চর্বির গাদা)। ফ্ল-ব-রর প্রিয় শিষ্য মোপাসাঁ মাত্র দশ বছ-রর ম-ধ্য প্রায় তিন-শা গল্প লি-খ বিশ্বসাহি-ত্য আ-লাড়ন সৃষ্টি ক-রন। তাঁর লেখা 'Miss Harriett', 'M. Parent', 'The Neclace ' প্রভৃতি বিশ্বসাহি-ত্যর অমূল্য সম্পদ। মোপাসাঁর সমসাময়িক আ-রকজন ছোটগল্পাকার হ-লন আলফঁস দো-দ (১৮৪৮-১৮৯৭)। গ-ল্পর ম-ধ্য করুণরস সৃষ্টি-ট তিনি ছি-লন সিদ্ধহস্ত। তিনি অতি সামান্য বিষয়-ক নি-য় অসামান্য গল্প লিখ-ত পার-তন। তাঁর 'Old Folks' ছোটগল্পটি করুণর-সর আধা-র গ-ড় উ-ঠ-ছ। 'The Pope's Mule', 'The Goat of Monsieur Seguin', 'The Two Inn' প্রভৃতি গল্পগুলি-ত কখ-না সাধারণ জীবনচিত্র, কখ-না যু-দ্ধর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, কখ-না কখ-না দেশ-প্র-মর উজ্জ্বল রূপ বর্ণিত হ-য়-ছ। সব-শ-ষ ফরাসী ছোটগ-ল্পর ধারা-ক এগি-য় নি-য় যাবার দায়িত্ব -নন আল-তাল ফাঁস, রমাঁ রলাঁ, আ-দ্রঁ জিদ্, আল্-বর ক্যামু প্রমুখ বিখ্যাত লেখকগ-ণর হা-ত।

আবার বেশ ক-য়কজন রুশ লেখক ছোটগ-ল্পর ধারা-ক গতিশীল রাখ-ত খুবই আন্তরিক ছি-লন। আধুনিক রুশ সাহি-ত্যর জন্মদাতা হ-লন আ-লকজান্দার পুশ্কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। স্বল্পায়ু বায়রণ শিষ্য পুশ্কি-নর জুয়াড়ি-দর কাহিনি নি-য় লেখা 'Queen of Spades' ; অ্যাড-ভঞ্চা-রর কাহিনি নি-য় -লখা 'The Shot" ; ভদ্র দস্যু-দর কাহিনি নি-য় লেখা "Dubrovsky' ; প্রভৃতি গ-ল্প বৈচি-ত্র্যর ঝল্কানি-ত পাঠক মুগ্ধ। তাঁর ছোটগল্পগুলি রুশ সাহি-ত্যর সব-চ-য় মূল্যবান রত্ন। পুশ্কি-নর পর নি-কালাই গো-গাল (১৮০৯-৫২) রুশ সাহি-ত্য নতুন সং-যাজন। তাঁর দু'খ-ন্ড 'Evening in a Firm House near Dikanka'-এর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, তীক্ষ্ণ পর্য-বক্ষণশক্তি, শব্দ চাতুর্য তাঁর গদ্য শৈলী-ক জীবন্ত ক-র তু-ল-ছ। 'ওভার-কাট' ছোটগল্পটি-ত দুর্গত-পীড়িত মানু-ষর করুণ অভিজ্ঞতা-ক পুশ্কিন ভাষারূপ দি-য়-ছন। রুশ কথাসাহি-ত্যর ইতিহা-স ছোটগল্পার তু-র্গনি-ভর (১৮১৮-১৮৮৩) অবদান বেশ উজ্জ্বল। তাঁর 'Bezhim Meadow', 'The Singers', 'The Living Relic', 'Ermolai and the Miller's wife' প্রভৃতি গল্পগুলি -লখ-কর প্রতিভার দীপ্তি-ত ভাস্বর।

অন্যদি-ক কাউন্টলিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) কিছু ছোটগল্প লিখ-লও প্রকৃত অ-র্থ তিনি ঔপন্যাসিক। তাঁর গ-ল্প সত্য, শিব ও সুন্দ-রর বন্দনায় পাঠক মুগ্ধ হন। রুশ সাহি-ত্য বড় মা-পর ছো-টাগল্পর হ-লন আন্তন -চকভ (১৮৬০-১৯০৪)। বিশ্ব-ছাটগল্প সাহি-ত্য তাঁর আসন অবশ্যই মোপাসাঁর পা-শ। 'Albuni' বা 'The Horse Family' গ-ল্প হাস্যরস সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাই। তাঁর 'Word No.৬' গ-ল্প হাসপাতা-লর অবসথার ভয়ঙ্কর চিত্র ফু-ট উ-ঠ-ছ। আবার 'The Black Monk', 'The man is a case', 'Grasshopper' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি লেখ-কর বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বর্ণফসল। অন্যদি-ক পেশকভ ওর-ফ ম্যাক্সিম গোর্কির (১৮৩৮-১৯৩৬) সারাজীব-নর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ছিত্র ফু-ট উ-ঠ-ছ 'Malva', 'Twenty six Men and a Girl', 'A Man is Born' প্রভৃতি

ছোটগ-ল্পর পাতায় পাতায়। চরিত্র সৃষ্টির মুন্সীয়ানায়, বিষয় বস্তুর উপস্থাপনায় এবং বিচিত্র শৈলী প্র-য়া-গ তিনি দারুণ দক্ষতা দেখি-য়-ছন। গোর্কির সমসাময়িক অ-লকজান্দার কুপরিণ, আইভ্যান বুনিন, আ-লক্সি তলস্তয়, মিখাইল শো-লাকভ প্রমু-খরা বিভিন্ন উৎকৃষ্ট গ-ল্পর সম্ভা-র রুশ সাহিত্য-ক সমৃদ্ধ ক-র-ছন।

ছোটগ-ল্পর দিক থে-ক ইং-রজী সাহিত্য দুর্বল হ-লও লুই স্টি-ভন স-নর (১৮৫০-৯৪) হাত ধ-র ছোটগল্প হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক-র পথ চল-ত শুরু ক-র। 'সুখী রাজপুত্র' ও 'স্বার্থপর দৈত্য'-এর ম-তা সর্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প লি-খ ইং-রজী সাহি-ত্য অমর হ-য় আ-ছন অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০)। সমসাময়িক কা-ল জো-সফ কনরাড (১৮৫৬-১৯২৪) এবং কিছুটা পরবর্তী কা-ল রাডিয়ার্ড কিপলিঙ (১৮৬৫-১৯৩৬) ছোটগল্প রচনায় দক্ষতার পরিচয় দি-য়ছি-লন। কনরা-ডর শিল্প প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'Heart of Darkness', 'The Secret Sharer', 'Youth', 'Typhoon', প্রভৃতি ছোটগল্প। অন্যদি-ক কিপলি-ঙর শ্রেষ্ট দু'টি গল্প সংকলন গ্রন্থ হল 'Plain Tales from the Hills' এবং 'Jungle Book' । অরণ্যপ্রকৃতির মোহময়ী অপরূপ রূ-পর বর্ণনা র-য়-ছ 'Jungle Book'-এর ছ-ত্র ছ-ত্র। ত-ব ইং-রজী ছোটগল্প তার হতদরিদ্র দশা কাটি-য় বেশ কিছুটা কৌলিন্য ফি-র পে-য়ছিল আ-মরিকার ওয়াশংটন আরভিঙ, এডগার এলান পো, ও. হেনরি প্রমু-খর ম-তা গুণী গল্পকা-রর সান্নিধ্য পে-য়। ওয়াশংটন আরভি-ঙর (১৭৮৩-১৮৫৯) 'স্কেচ বুক' চৌত্রিশটি নকশার সঙ্কলন। তাঁর ছোটগ-ল্পর ম-ধ্য কিছু-কিছু দোষ-ত্রুটি থাক-লও এডগার এলান পো তাঁ-ক 'pioneer' ব-ল মে-ন নি-য়-ছন। একথা ঠিক ছোটগল্প রচনায় তিনি মার্কিন সাহিত্য-ক এই প্রথম নিজস্ব ঢ-ঙ চলার পথ দেখা-লন।

একথা ঠিক ইং-রজী ছোটগ-ল্পর ভিত তৈরি হল আরভি-ঙর হা-ত ; আর সেই ভি-তর উপর সৌধ তৈরি ক-র তা-ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর-লন সুবিখ্যাত লেখক এডগার এলান পো (১৮০৯-৪৯)। দারি-দ্র্যর স-ঙ্গ লড়াই করা, সুরাসক্ত পো চল্লিশ বছ-রর জীবন যু-দ্ধ এতটুকু শান্তি পাননি। 'The black Cat', 'The Masque of the Red Death', 'The Fall of the House of Usher', 'Ligeia', 'A Descent into the Mealstrom', প্রভৃতি গ-ল্প তাঁর নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অন্তর্জীবনই পরি-বশ-সৃষ্টি, চরিত্র-চিত্রণ, মৃত্যু-চতনার মধ্য দি-য় দি-নর আ-লার ম-তা ফু-ট উ-ঠ-ছ। 'Tales of Ratiocination' জাতীয় গো-য়ন্দাধর্মী গল্প রচনায়ও গঠন-রীতি ও বি-শ্লষ-ণ আভিনব-ত্বর ছাপ রে-খ পো দারুণ দক্ষতার পরিচয় দি-য়-ছন। তাঁর 'দি -গাল্ড বাগ', 'দি মিস্ট্রি অব্ মেরি র-টজ', 'দি পারলইন্ড লেটার' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা। সাময়িক পত্রিকার হাত ধ-র উ-ঠ এ-স ছোটগল্প রচনায় তিনি -য পথ দেখি-য়ছি-লন ঠিক সেই পথ অনুসরণ ক-র-ছন অ-নক খ্যাতনামা লেখকগণ। পো-র সময়কার ন্যাথানি-য়ল হথ-র্ণর (১৮০৪-৬৪) শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন গ্রন্থ হল 'Twice-Told-Tales' এবং তাঁর পরিণত বয়-সর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি হল 'দি স্কার-লট লেটার'। তাঁর ছো-টাগ-ল্প মর্ত্য-পৃথিবী ও ছায়ামন্ডিত রূপজগ-তর মেল বন্ধন ঘ-ট-ছ।

ছোটগল্পকার হরম্যান্ মেলভিল্ (১৮১৯-৯১) এবং মার্ক টো-য়ন (১৮৩৫-১৯১০) স্বল্প সংখ্যক ছোটগ-ল্পর স্রষ্টা হ-লও এই দু'জন লেখ-কর ছোটগল্পগুলি বেশ তীক্ষ্ম-ধারা-লা ও উজ্জ্বল। আ-মরিকার কথাসাহি-ত্যর ইতিহা-স হেনরি জেম্-সর (১৮৪৩-১৯১৬) নাম মূলত ঔপন্যাসিক হিসা-ব খ্যাত হ-লও তু-র্গনি-ভর এই ভক্ত ছোটগ-ল্পর ক্ষে-ত্র -য বিজ্ঞান সম্মত মনস্তত্ত্ব-বি-শ্লষণ প্র-য়াগ ক-র-ছন তা মার্কিন ছোটগল্প-ক অ-নক দূ-র যে-ত সাহায্য ক-র-ছ।

ত-ব স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় সুপন্ডিত মার্কিন ছোটগল্পকার ও. হেনরি (১৮৬২-১৯১০), নিন্দা ও খ্যাতির বোঝা মাথায় নি-য় চলা ও. হেনরি নিউইয়-র্কর রাস্তার চারপা-শ মো-ড়-মো-ড় যে বিচিত্র জীব-নর সন্ধান পে-য়-ছন সেইসব অতিসাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন থে-ক গ-ল্পর উপাদান সংগ্রহ ক-র 'The Gift of the Magi', 'An Unfinished Story', 'The Furnished Room', 'The Skylight Room' প্রভৃতি অসাধারণ গল্প উপহার দি-য়-ছন। সুতরাং দেখা গেল উনিশ শত-ক

আ-মরিকান সাহি-ত্য যে ছোটগ-ল্পর প্রথম পদসঞ্চার শোনা গেল তা বিশ শত-কর সিন্-ক্লয়ার লুইজ, জন স্টেইন-বক, উইলিয়াম ফক্নার প্রমুখ মনীষীর হা-ত বহুশাখায়িত হ-য় দ্রুত সাম-নর দি-ক এগি-য় চ-ল-ছ।

ছোটগ-ল্পর ধারায় পাশ্চা-ত্যর প্রভাব সম্প-র্ক একটা কথা শে-ষ বল-তই হয় আধুনিক ছোটগ-ল্পর সাধনায় ফরাসী, রাশিয়া ও আ-মরিকার দেখা-না পথ অন্যান্য দে-শর গল্পকারগণ অনুসরণ ক-র-ছন সত্য। ত-ব এটাও সত্য গ্যয়-টর প্রতিভা জর্মান সাহি-ত্যর সীমা অতিক্রম ক-র দা-ন্ত-শেক্সপীয়-রর ম-তা বিশ্ব-সংস্কৃতি-ক উজ্জ্বল -থ-ক উজ্জ্বলতর ক-র-ছ। ছোটগল্পকার সুডারমান মোপাসাঁর পদানুসরণ ক-র সুন্দর সুন্দর ছোটগল্প লি-খ-ছন। আবার জেরহার্ট হাউপ্ট্মান জোলা, তলস্তয় ও ইব-স-নর দ্বারা প্রভাবিত হ-য় দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণির মানু-ষর দৈনন্দিন জীব-নর ছবি দারুণ দক্ষতায় তু-ল ধ-র-ছন তাঁর গ-ল্পর ম-ধ্য। ঊনিশ শতক বিশ্ব-ছোটগ-ল্পর স্বর্ণযুগ হ-লও গোটা বিশ শত-ক তা নি-য় যে বিভিন্ন জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল সেই ধারা একবিংশ শত-কও অব্যাহত আ-ছ।

রবীন্দ্রনা-থর ধারা : সাহি-ত্যর সব-চ-য় সজীব ও গতিশীল শাখা ছোটগল-পর জন্ম রহস্য-ঘন প-থ। গল্প শোনার আগ্রহ নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম ক-র ; পৌরাণিক গল্প, নীতিমূলক কাহিনি, রূপকথা-উপকথা, রোমান্স, ন-ভলা প্রভৃতি অ-নক রূপান্ত-রর পথ পার হ-য় বর্তমান কা-লর ছোটগ-ল্পর এই নি-টাল রূপটি গ-ড় উ-ঠ-ছ। একই উপসংহার বিশিষ্ট একটি মাত্র কাহিনি-ক কেন্দ্র ক-র স্বল্পায়ত-ন সহজ-সরল-সাবলীল ভাষায় ইঙ্গিত ধর্মী যে গদ্যগাথা রচিত হয় তা-ই হল ছোটগল্প। আধুনিক বাংলা সার্থক ছোটগল্প হল সঞ্জীব চন্দ্র চ-ট্টাপাধ্যা-য়র 'দামিনী'। অবশ্য মধ্যযু-গর আখ্যায়িকামূলক কাব্যগুলি-ত ছোটগ-ল্পর সম্ভাবনা সুপ্ত আকা-র ছিল। ত-ব গদ্য-সাহিত্য চর্চা শুরু হবার পর আধুনিক ছোটগ-ল্পর বীজ লক্ষ্য করা গেল আরব্য উপন্যা-সর অনুবাদ এবং ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্নসিং-হর বিদ্রূপাত্মক নক্সার ম-ধ্য। ভূ-দব মু-খাপাধ্যা-য়র 'ঐতিহাসিক উপন্যা-স'র ম-ধ্য 'সফল স্বপ্ন' ও 'আঙ্গুরীয় বিনিময়' না-ম দু'টি গ-ল্পর সন্ধান পাই যা পাশ্চাত্য 'ন-ভ-ল'র স-ঙ্গ তুলনীয়। সঞ্জীবচ-ন্দ্রর (১৮৩৪-৮১) 'রা-মশু-রর অদৃষ্ট' প্রকৃত প-ক্ষ একটি ন-ভল শ্রেণির সৃষ্টি। আবার 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) বেশ কতগুলি ছো-টাগল্প আ-ছ। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল 'প্রতি-শাধ', 'রক্তপিপাসু', 'লজ্জাবতী', 'যমুনা', 'নতুন কথা', 'চাবিচুরি', 'মিউটিনি', 'টেলিস ম্যান', 'অমরগুচ্ছ' প্রভৃতি। আমা-দর চারপা-শর পারিবারিক দৈনন্দিন জীব-নর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ও পারস্পরিক সম্প-র্কর নিপুণ ছবি অত্যন্ত দক্ষতার স-ঙ্গ তু-ল ধ-র-ছন স্বর্ণকুমারী দেবী। এই সম-য় ন-গন্দ্রনাথ গুপ্তও (১৮৬১-১৯৪০) অ-নকগুলি সরস ও সার্থক ছোটগল্প লি-খ ছোটগল্পরূপ সাহিত্য-শাখাটির ভিত-ক শক্ত মাটির উপর দাঁড় করান। ত-ব রবীন্দ্র সমসাময়িক ছোটগল্পকার-দর ম-ধ্য ত্রৈ-লাক্যনাথ মু-খাপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) এক অতি পরিচিত নাম। তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলন গ্রন্থগুলি হল-'ভূত ও মানুষ', 'মজার গল্প' ও 'ডমরু-চরিত্র'। তাঁর স্বর্ণফসল 'ডমরু-চরিত্র'। ''ত্রৈ-লাক্যনা-থর ছো-টাগল্পগুলি বাঙলা সাহি-ত্য যে মেজাজ নি-য় এ-স-ছ, সেদি-নর ম-তা আজও তার মৌলিকত্ব উজ্জ্বল হ-য় আ-ছ। ফরাসী গ-ল্পর অ্যান্টি-ক্লাইম্যা-ক্সর চাতুর্য এখা-ন নেই, সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতাও অনুপস্থিত। বাঙালীর গালগল্প, রঙ্গব্যঙ্গ-কই তিনি বৈঠকী মেজা-জ ব-ল-ছন।''[৯]

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প বল-ত যা বোঝায় তার জন্ম রবীন্দ্রনা-থর হা-ত। তাঁর হা-তই ছোটগ-ল্পর বাল্য, কৈ-শার অতিক্রম ক-র যৌবনপ্রাপ্তিও ঘ-ট-ছ। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, বাঙালি কবি, বিশ্বকবি। খাঁটি কবির ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ-ক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ হ-ত সাহায্য ক-র-ছ। কবির ভাবনার ম-ধ্যই গ-ল্পর প্রাণ লুকি-য় থা-ক। তাই রবীন্দ্রনাথ অতি সহ-জ গ-ল্প প্রাণ সঞ্চার কর-ত পে-র-ছন। ছোটগল্প কেবল ছোটগল্পই নয়, তার চে-য় আধিক কিছু। রবীন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘ সম-য় জমিদারি কাজ দেখা-শানা কর-ত গি-য় অতি সাধারণ মানু-ষর দৈনন্দিন যে জীবনযাত্রা, বিচিত্র জীব-নর উত্থান-পতন-

হাহাকা-রর যে ছবি দে-খ-ছন তা দি-য়ই তিনি ছোটগ-ল্পর ডালি কানায় কানায় ভরি-য় তু-ল-ছন। তিনিই ছো-টাগ-ল্পর মুক্তির দূত। বাংলা ছোটগল্প-ক র-স-ব-র্ণ-গ-ন্ধ সাজি-য় তু-ল তিনি কথাসাহিত্য-ক নন্দনকান-ন পরিণত ক-রন। আধুনিক ছোটগ-ল্পর রূপ-রীতি-বৈশিষ্ট্য বিচার ক-র তিনি ছোটগ-ল্পর নবদিগ-ন্তর সন্ধান -দন।

আধুনিক আদর্শ ছোটগ-ল্পর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য তাঁর কবি আত্মায় প্রথম ধরা দেয় 'সোনার তরী'র সোনার ম-তা খাঁটি 'বর্ষাযাপন'কবিতার (১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) 'ছো-টা প্রাণ, ছো-টা কথা/ ছো-টা ছো-টা দুঃখ কথা'র ছ-ত্র ছ-ত্র। কলকাতার নাগরিক জীবন-ক পিছ-ন ফে-ল গ্রামবাংলার স-ঙ্গ গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি ক-র তিনি যে মুক্তির স্বাদ পে-য়-ছন, সহজ-সরল জীব-নর ম-ধ্য চিরন্তন সত্য-ক দে-খ-ছন--সেই সত্য-কই তিনি 'শেষ হ-য় শেষ না হওয়া' ছোটগ-ল্প তু-ল ধ-র-ছন। মানু-ষর জ্বালা-যন্ত্রণা-অবসাদ কর্মসূ-ত্র সরাসরি দু-চাখ ভ-র দে-খ তা দি-য়ই 'ছো-টা প্রাণ, ছো-টা কথা'র গল্পকথা সৃষ্টি ক-র-ছন। গ্রামবাংলার অতি সাধারণ ঘটনা, চরিত্র, নদী-পথ-ঘাট বিভিন্ন পরিবা-রর ম-ধ্যও যে আপরূপ জীবন সত্য আ-ছ তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম হৃদয় দি-য় অনুভব ক-র-ছন। হৃদয়-ক হৃদয় দি-য় অনুভব ক-র-ছন ব-লই আমরা খোকাবাবু-রাইচরণ, মিনি-কাবুলিওয়ালা, রতন-পোস্টমাস্টার প্রভৃতি রকমারি চরি-ত্রর ম-ধ্য জীবন-সত্য-ক খুঁ-জ পাই।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ খ্রীষ্টা-ব্দ 'ঘা-টর কথা' ছোটগল্প লি-খ গল্পকার হি-স-ব পথ চলা শুরু ক-রন। জীব-ন চলার পথ থে-ক সঞ্চিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাময়িক প-ত্র প্রকা-শর তাগিদ তাঁর ছোটগল্প রচনার যে উৎসমুখ খু-ল দি-য়ছিল তারই মর্মরিত কলতা-ন ঝংকৃত হ-য় উঠল এ-কর পর এক অমূল্য ছোটগল্প। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁর মাত্র ছয়টি গল্প প্রকাশিত হ-লও একই বছ-র প্রকাশিত 'সাধনা'-ত (১২৯৮-১৩০২) ছুটি, শাস্তি, অতিথি'র ম-তা সাড়া জাগা-না ছত্রিশটি ছো-টাগল্প ধা-প ধা-প লেখা হ-ত থা-ক। 'সাধনা' পত্রিকাটি ছিল রবীন্দ্রনা-থর কা-ছ অ-নকটা কুঠা-রর ম-তা। এই সাহিত্য-কুঠা-রর দ্বারা তিনি সমা-জর কুসংস্কার ত্রুটি-বিচ্যুতি-ঘাটতি-অসংগতির মূ-ল আঘাত ক-রন। তাঁর 'ভারতী'-ত প্রকাশিত গ-ল্পর সংখ্যা ষো-লাটি, 'সবুজপত্র' পত্রিকায় দশটি, 'বঙ্গদর্শ-ন' দু'টি, 'বঙ্গভাষা'য় একটি, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'শারদীয়া সংখ্যায় তিনটি, 'শনিবা-রর চিঠি'-ত একটি। এছাড়া 'ঋতুপত্র', 'প্রদীপ', 'সখা ও সাথী', 'বালক', 'নবজীবন', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় একটি ক-র ছোটগল্প প্রকাশিত হ-য়-ছ। প্রকৃতপ-ক্ষ এইসব সাময়িক পত্রিকাগুলির গ-ল্পর চাহিদা পূর-ণর আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনা-থর ছোটগল্প রচনায় বি-শষভা-ব প্রেরণা জুগি-য়-ছ।

মানব-প্রমিক রবীন্দ্রনাথ কবিতার কিছু বৈশি-ষ্ট্য সমৃদ্ধ আকা-র বড় গ-দ্য রচিত ছোটগল্প রূপ সাহিত্য আঙ্গিকটি বাংলা সাহি-ত্য নতুন আবিষ্কার ক-রন।এরপর সযত্ন লাল-ন-পাল-ন বিষয় বৈচি-ত্র্যর নব নব উদ্ভাব-ন বে-ড় ওঠা এই সাহিত্য মাধ্যমটি যে তাঁর মন-নর কত গভী-র চিরস্থায়ী আসন ক-র নি-য়-ছ তা 'বর্ষাযাপন' কবিতার ছ-ত্র ছ-ত্র নি-র্দশিকাগুলি-ত ঝল-স উ-ঠ-ছ।তাঁর বিচিত্র ছোটগ-ল্পর মধ্য দি-য় তৎকালীন পল্লী-জীবন, নগর-জীবন, গ্রাম ও নগর জীব-নর চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাত,বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মনস্তাত্ত্বিক গতি-প্রকৃতি গ-ল্প-গ-ল্প উদ্ভাসিত হ-য় উ-ঠ-ছ। বর্তমান সম-য় ছায়া-সুনিবীড় শান্তির গ্রাম-জীবন-ক নগর জীবন গ্রাস ক-র নি-চ্ছ। শিলাইদহ, পতিসর,সাজাদপুর থাকাকালীন দেখা গ্রাম-জীবন, গ্রাম-জীব-নর স-ঙ্গ নগর জীব-নর সংঘাত এবং শে-ষ সমন্ব-য়র একটা আকুল -চষ্টা রবীন্দ্রনা-থর গ-ল্প র-য়-ছ। বর্তমা-নর ভয়ঙ্কর সংকটকালীন অন্ধকার, আতঙ্ক থে-ক উদ্ধার পে-ত রবীন্দ্রনা-থর ছোটগ-ল্পর অলিগলি ফি-র দেখার প্র-য়াজন।

শতাধিক গ-ল্পর স্রষ্টা রবীন্দ্রনা-থর ছোটগ-ল্পর রচনাকাল চৌষট্টি বছর (১২৮৪-১৩৪৮)। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' ১২৮৪ সা-ল 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী। তিনি জীবন-শিল্পী। শিল্পী জীবন থে-ক যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন ক-রন তেমনি অন্য সাহিত্য থে-কও সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ ক-রন। রবীন্দ্রনা-থর 'জীবিত ও মৃত' গ-ল্পর স-ঙ্গ হথ-র্নর 'ও-য়কফিল্ড'-এর ভাববস্তুর মিল আ-ছ, 'বিচারক'-এর সা-থ টলস্ট-য়র 'রেজা-রকশ-ন'র বিষয়গত মিল আ-ছ, 'অধ্যাপক' গ-ল্পর স-ঙ্গ আরভি-ঙর 'মাউন্টজয়' গ-ল্পর মিল আ-ছ.....। অ-ন-ক ম-ন ক-রন এডগার এলান পো-র গ-ল্পর স-ঙ্গ রবীন্দ্রনা-থর 'সম্পত্তি-সমর্পণ','জীবিত ও মৃত', 'মহামায়া', 'নিশী-থ', 'গুপ্তধন' গ-ল্পর অ-নক মিল আ-ছ। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গ-ল্প এডগার এলান পো এবং থিওফিল গোতি-য়র রচনার প্রভাব র-য়-ছ। ত-ব এ নি-য় কেউ কেউ বিরূপ সমা-লাচনা কর-লও এটা ঠিক : ''বি-দশি এইসব গল্পকার-দর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যদি নানাভা-ব অনুপ্রাণিত হ-য় থা-কন ত-ব তা রবীন্দ্রনা-থর প-ক্ষ কিছুই অ-গৌর-বর কথা নয়, বরং বাংলা ছোটগ-ল্পর পথনির্মাতা হি-স-ব বি-দশি অগ্রসূরিবৃ-ন্দর লেখা ছোটগ-ল্পর রূপরীতির স-ঙ্গ পরিচিত হওয়াই ছিল রবীন্দ্রনা-থর অবশ্য-পালনীয় কৃত্য।'' ১০

পরি-শ-ষ বলা যায়, রবীন্দ্রনা-থর হা-ত যে বাংলা ছোটগ-ল্পর সৃষ্টি ও যৌবনপ্রাপ্তি ঘ-ট-ছ আজ তা বহুজ-নর চেষ্টায় বহুশাখায়িত হ-য় মহীরুহ রূপ লাভ ক-র-ছ। একবিংশ শত-ক রবীন্দ্রনা-থর ১৫০-তম জন্মবর্ষ পালন রাজনৈতিক বিষয় হ-য় উ-ঠ-ছ। উত্তর আধুনিক কাম-স-ম্ভাগ সমগ্র বাঙালি জাতি-ক পল্লীবাংলা থে-ক বিতাড়িত কর-ছ। নির্বাসিত হ-য়-ছ মধুর মর্ম গাথা। এমন ভয়ঙ্কর অবক্ষিয়মান ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থা থে-ক মুক্তির একমাত্র উপায় কবি শিল্পীর চো-খ দেখা জগত-ক অব-লাকন করা। রবীন্দ্রনাথ পল্লী বাংলার স-ঙ্গ নগর জীব-নর অপূর্ব সমন্বয় ঘটা-ত প্রয়াসী হ-য়ছি-লন। সমা-লাচ-করা তাঁ-ক ব্যর্থতার সমু-দ্র নি-ক্ষপ কর-ত পা-র। কিন্তু আজ উপলব্ধির সময় এ-স-ছ- পল্লী জীবন-ক রে-খ নগর জীব-নর লালান একান্ত প্র-য়াজন।।

গ্রন্থতালিকা

১। রায়, রথীন্দ্রনাথ : 'ছোটগ-ল্পর কথা'/ পুস্তক বিপণি; কলকাতা / জানুয়ারী, ১৯৯৬/ পৃষ্ঠা-১

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ছিন্নপত্র : সাজাদপুর ৫ সে-প্টম্বর, ১৮৯৪

৩। Cohen, J. M : A History of Western Literature, pg. ৬৪

৪। রায়, রথীন্দ্রনাথ: 'ছোটগ-ল্পর কথা'/ পুস্তক বিপণি; কলকাতা / জানুয়ারী, ১৯৯৬/পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

৫। Evans, Ifor : A Short History of English Literature. (Penguin) pg. ১৪-১৫

৬। A Short History of Frence Literature, pg. 37 :Laurence Bission.

৭। Hammerton, J. A (Edited): World's Thousand best Short Stories(Vol. III—Introduction), pg. ১৬

৮। Germain Mason : A Concise Survey of French Literature, pg. ১৯০

৯। রায়, রথীন্দ্রনাথ: ঞ্চ-ছাটগ-ল্পর কথাঞ্চ/ পুস্তক বিপণি; কলকাতা / জানুয়ারী, ১৯৯৬/পৃষ্ঠা. ৭৩-৭৪

১০। -ঘায, ত-পাব্রত: ঞ্চরবীন্দ্র--ছাটগ-ল্পর শিল্পরূপঞ্চ/ -দঞ্চজ পাবলিশিং; কলকাতা / -ম, ২০১২, পৃষ্ঠা: ২৮

জাতীয়তাবোধের উৎস সন্ধানে বাংলা উপন্যাস

দেবাশিস মল্লিক

উনিশ শতকে যুক্তিবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চার মত এক জাতি বা one nation-এর ধারণাটিও এদেশে এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের মধ্যে দিয়ে। তবে সে সময় নব্য শিক্ষিত বাঙালি তরুণমানসে এই জাতিসত্তার ভাবনা গড়ে ওঠার পেছনে পাশ্চাত্যের অনুকরণ অন্যতম কারণ হতে পারে, কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। অন্য দুটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে—প্রথমত, সে সময় নগরায়ণ ও আধুনিকতার যুগ্ম অভিঘাতে কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছিল, গড়ে উঠছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। এর ফলে সমাজজীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছিল, তা পূরণের জন্য অন্যরকম যৌথতার প্রয়োজন অনুভূত হল। দ্বিতীয়ত, শাসিতের যে হীনমন্যতা, পরাধীনতার কারণে যে গ্লানিবোধ তার থেকে উত্তরণে, হত আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে আশ্রয় নিতে হল ইতিহাসের ধূসর জগতে, অতীত গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি উদ্ধারে। যদিও এই আত্মমর্যাদাবোধ তখনো অবধি যে স্বাধীনতা স্পৃহায় রূপান্তরিত হয়ে যায়নি তা স্পষ্টতা ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের ব্যাখ্যায়—"...The Self-respect at isue here was the self-respect of a subject people reconciled to it subjection. It loos was not ascribed to want of political independence, but to want of recognition within the framwork of Colonial dependance" 'Nationalism and After' (1945) গ্রন্থে জাতি সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক 'E. H. Carr' প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী যে বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে একটি জনগোষ্ঠীকে 'Nation' বা 'জাতি' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলি হল— প্রথমত, একই শাসনপ্রণালীর অধীনে থাকার ধারণা, যা হয় অতীতে ছিল বা বর্তমানে আছে অথবা ভবিষ্যতে থাকবে বলে আশা পোষণ করা হচ্ছে, দ্বিতীয়, ঐ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিজেদের মধেয ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে, তৃতীয়ত, অল্পবিস্তর চিহ্নিত ভূখণ্ড থাকবে, চতুর্থত, এমন কিছু নিশ্চিত বিশেষত্ব থাকবে, (যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষা) যা সেই জাতিকে অন্য জাতি বা বিজাতীয় জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করতে পারে, পঞ্চমত, গোষ্ঠীর সকল সদস্যের জন্য কিছু সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হবে, ষষ্ঠত, প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিমানসে জাতির ভাবমূর্তির সঙ্গে একটি বিশেষ মাত্রায় সমানুভূতি বা সমবাঞ্ছা সংযুক্ত হবে। জাতিসত্তার পরিচিতি একটি কল্পিত ধারণা হলেও এর সাথে বহুমানুষের আবেগ মিশে এমন সংহতি তৈরি হয়, যে জাতিসত্তার সম্মান রক্ষায় অবলীলায় প্রাণ দেওয়া ও নেওয়া যায়। এই 'জাতি' শব্দটি বাঙালি শিথিলভাবে নানা অর্থে প্রয়োগ করে এসেছে। 'জাতি বলতে কোন প্রজাতি (যা মানবজাতি), প্রজাতির কোন লিঙ্গ (স্ত্রীজাতি), বর্ণ বা Caste (ব্রাহ্মণজাতি), কুল বা Race (আর্যজাতি) সব বোঝায়, তেমনি বোঝায় একটি বড় Nation-এর অন্তর্গত Sub-Nation (বাঙালি জাতি)' এই প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণী এ দেশের ইতিহাস ও ভূগোলকে ভিত্তি করে, ভাষা ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে জাতি সত্তার আত্মপরিচিত গড়ে তুলতে চাইলেন, যার সমর্থন মিলল বায়ুপূরাণে, আবার কোন বিশেষজ্ঞের মতে প্রকৃতি-নির্ধারিত এমন সীমান্ত নির্দেশের সুবিধা পৃথিবীতে খুব কম ভূখণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের মত বিশাল দেশে কোন একক ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয় আবেগ সংহত করা অসম্ভব। বিকল্প হিসাবে পাওয়া গেল হিন্দু ও আর্য সভ্যতার সুপ্রাচীন গরিমা—যার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া গেল ভারতীয়ত্বের ধারণা। যদিও হিন্দু বলে কোন গোষ্ঠী যে প্রাচীন ভারতে ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। অন্যদিকে আর্য ধারণাটিকে নৃতত্ব অতিকথনের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয় না। তবে কে না জানে অতিকথা গণমানসে প্রকৃত সত্যের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। আর একটি কৌতূহলজনক আকর্ষণীয় বিষয় হল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন করেছিল, একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করেছিল, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। এর ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তিবাদে দীক্ষিত নতুন

সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। এইভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের মোকাবিলায় গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের সামনে খাড়া করা গেল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, শুধু তাই নয় রীতিমত শ্লাঘার সঙ্গে প্রমাণ করে দেওয়া গেল শাসকের তুলনায় শাসিতের জাতিসত্তার পরিচিতি আকারে বৃহত্তর এবং প্রাচীনতর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তবু যে ক'টি উপাদানের ভিত্তিতে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষার বন্ধন। ফলে জাতীয়তাবাদের স্বরূপসন্ধান করতে গিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে নির্মিত জাতিসত্তার দুটি অভিমুখ তৈরী হচ্ছে ভারতীয় জাতি ও বাঙালি জাতি। ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক জাতিসত্তার ধারণাটি যেহেতু সহজতর, তুলনায় ভারতীয়ত্বের ধারণাটি বিমূর্তপ্রায়, বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা কবিতা-গান-নাটকে দেশাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে ভারতমাতার তুলনায় বঙ্গমাতায় অনেকবেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেছেন। এমনকি যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ভারতবাসী কোনদিনই ইতিহাস-সচেতন ছিল না, তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কোনদিন লেখা হয়নি বলে তাঁর আক্ষেপ; তিনিই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভবানন্দ-কণ্ঠের 'সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কলনিনাদকরালে!

দ্বিসপ্তকোটী ভূজৈর্ধৃত খরকর বালে
অবলা কেন মা এত বলে'।

—এই গানে যে জাতির উত্থান কল্পনা করেছিলেন, সে জাতি হল বাঙালি জাতি। মাইকেল মধুসূদন প্রবাসে থাকাকালীন দেশভক্তিমূলক যে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তার কোনটি বঙ্গভূমি আবার কোনটি বঙ্গভাষার প্রতি নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের কিছু দেশাত্মবোধক কবিতায় ভারতভাবনা থাকলেও বেশি ভাগ কবিতা বঙ্গবিষয়ক। কখনো সেখানে বঙ্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য বন্দনা, কখনো আবার সাতকোটি সন্তানকে মানুষ হিসাবে স্বাবলম্বী না করে নিছক পরনির্ভর বাঙালি করে রাখার জন্য বঙ্গমাতাকে গঞ্জনা দান। এভাবে উনিশ শতকে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের মনে বঙ্গভাবনা ও ভারতভাবনা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হলেও বাঙালির জাতীয়তাবাদী আবেগের মূল ভিত্তি ছিল বাংলা ভাষা আর বাঙালি সংস্কৃতি। দেখা যায় যখন তাঁরা জাতির প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করছেন, তখন তাঁদের চিন্তায় হিন্দুত্ব, আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ বেয়ে এসেছে ভারতভাবনা। অথচ জাতীয় ঐক্যের চিন্তায় মানসপটে ভেসে উঠেছে বাঙালি জাতির কথা। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'ভারত সঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' নামে দুটি কবিতায় ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মুক্তি কামনা না করে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মুক্তির কথা বলেছেন। অনেক সময়ে স্বাদেশিকতার অর্থ অন্ধ স্বদেশপ্রীতি, নৈসর্গিক শোভা বিতরণে প্রকৃতির কোন পক্ষপাতিত্ব না থাকলেও কোন কোন কবি শুধু নিজেদের জন্মভূমি হওয়ার গৌরবে বলে ফেলেছেন 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), কিংবা এ দেশ হল 'সকল দেশের সেরা' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)। প্রখ্যাত তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদের অভিমত হল 'সাম্রাজ্যবাদ হল প্রথমত ভৌগোলিক বেদখল, সুতরাং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রাথমিক কাজই হচ্ছে স্বীয় অঞ্চলকে পুনরুদ্ধার করা, স্বদেশের ভূগোলের দখল নেওয়া একটু একটু করে। রোমান্টিক পল্লী-কবিতার উচ্চকিত স্বাধীনতা ঘোষণা না থাকলেও আছে এই পুনরুদ্ধার প্রয়াস।

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত উপন্যাস লিখিত হওয়ার আগে বাঙালি রচিত উপন্যাসপ্রতিম 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এর মতিলালবাবু কিংবা রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে রচিত ইংরাজি উপন্যাস 'গোবিন্দ সামন্দ' (১৮৭৮)-এর হিন্দু কলেজের ছাত্র, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য জমিদার নবকৃষ্ণ প্রথম প্রতিবাদী চরিত্র। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পুরুষ বঙ্কিম তাঁর আখ্যানে অনুসন্ধান করছিলেন স্বজাতির আত্ম-অভিজ্ঞানটিকে। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে তাঁর ইংরাজি শিক্ষিত তরুণচিত্তে এ তাঁর নিজস্ব দায় বলে মনে হয়েছিল। আত্মপরিচয় লাভের জন্য ব্যাকুল স্বজাতি আর দ্বন্দ্বমুখর সেই কালপর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসে কখনো কখনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও

ব্যক্ত এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধী রূপে। ফলে জেবউন্নিসা প্রেমের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছে, শৈবালিনী কখনো তার ঈপ্সিত মানুষকে পায় নি, প্রফুল্লর সংসারজীবনের ছবি কেমন যেন আরোপিত বলে মনে হয়, 'আনন্দমঠে'র সন্তানদলের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেছে, ক্ষণিকের বিচ্যুতিতে সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন ভেসে গেছে। আসলে ইতিহাস ও রোমান্সের ধূলিজাল থেকে সমকালকে বঙ্কিম উদ্ধার করে আনতে পারেননি। তবে দেশ তাঁর কাছে মাতৃমূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে মাতৃমূর্তি দর্শন করালেন। প্রথমে দেখালেন সর্বাভরণভূষিতা ঐশ্বর্যশালিনী জগদ্ধাত্রীমূর্তি, ব্রহ্মচারী পরিচয় দিলেন 'মা—যা ছিলেন'। এরপর দেখালেন হৃতসর্বস্বা, মুণ্ডমালিনী নগ্নিকা কালী—'মা যা হইয়াছেন।' সব শেষে সুবর্ণনির্মিত জ্যোতির্ময়ী দশভূজা—'মা যা হইবেন।'

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম থেকে গোরা এতটাই রক্ষণশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন ছিল যে ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে সে একসময় অবধি শুদ্ধতা রক্ষার জন্য দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ পরিহার করে চলতে চেয়েছে। অথচ একথা ভোলার নয় যে গোরা নিছক পুণ্য অর্জনের জন্য কিংবা ধর্মীয় আচার পালনের উদ্দেশ্যে ত্রিবেণীতে স্নান করার পরিকল্পনা করেনি, দেশের হৃদয়ের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অবকাশ মিলবে এই আশায় সে ত্রিবেণী গিয়েছে।

এ দেশের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত যে আচার অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে নব্য শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষজন সচরাচর একটু বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে, গোরা সগর্বে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ বিষয়ে বিনয়কে সুস্পষ্টভাবে জানায়—'....সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও, তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।

রোগশয্যায় শায়িত কৃষ্ণদয়ালের মুখে নিজের জন্ম কাহিনী শুনে গোরা প্রাথমিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, একটা নিরালম্ব শূন্যতা তাকে গ্রাস করল। তার এতদিনের সাধনা যেন আচমকা অর্থহীন হয়ে গেল! এইসময় গোরার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল—'তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই কেবল একটা 'না'।

এই সর্বগ্রাসী নেতির অন্ধকার থেকে রবীন্দ্রনাথ গোরাকে ফিরিয়ে আনলেন। তার মনে হল, এতোদিন ধরে ' ভাবের ভারতবর্ষ' গড়ে তুলে তার মধ্যে দুর্ভেদ্য এক দুর্গই সে গড়ে তুলতে চেয়েছে। এমন নিজেকে অইরিশ দম্পতির সন্তান জেনে' 'পতিত' হবার, 'ব্রাত্য' হবার, ভয় চলে গেছে। পদে পছন্দে শুচিতা বাঁচার দায় আর নেই।

'আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন'। পরেশবাবুকে গোরা এই কথাগুলো বলবার পরে আরো বলেছিল, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না।— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

আসলে রবীন্দ্রনাথের সামনে বিশাল ভারতবর্ষের উদার প্রেক্ষাপট। মানব আমার জাতি, বিশ্ব আমাদের স্বদেশ এই হল গোরার শেষ বক্তব্য। ভিন্ন একটি পথ বেঁকে গেছে জাতীয়তাবাদের দিকে। এই পথটি সঙ্কীর্ণতা, অন্ধকার, হানাহানি ও বিদ্বেষের পথ বলে রবীন্দ্রনাথ পরিহার্য বিবেচনা করেন। মুক্ত আকাশের সকাল-সূর্যের আলোর মত উপস্থিতি নিয়ে অন্দরবাসিনী আনন্দময়ী, যিনি সংসারের হাজারো সীমাবদ্ধতা, অপমান, বন্ধনের মধ্যে থেকেও করুণা, স্নেহ বিকিরণে অকাতর, পরিশ্রান্ত অবসন্ন গোরার অবশেষে আশ্রয় পেল তাঁরই কোলে—'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরে মধ্যে এসে বসেছিল। তোমার জাত নেই,

বিচার নেই—শুধু তুমি কণ্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' 'গোরা' রচনার সমকালে অথবা উপন্যাসটি লিখে ফেলার দু' তিন মাসের মধ্যেই 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অন্তর্গত 'হে মোর চিত্ত, পূণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' ইত্যাদি কবিতাগুলি লেখা হয়, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনার যথার্থ পরিচায়ক। ঔপনিবেশিক পরিবেশে স্বদেশভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গ। শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী যে রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, ছদ্মবেশে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছুটে বেড়িয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনা করেছেন, তাতে অগ্নিযুগের বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আদলটি সহজেই ধরা পড়ে। অন্য দিকে রমেশ (পল্লীসমাজ) অথবা জীবনানন্দ (দেনা পাওনা)যে সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন তার মূল ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ ভাবাবেগ। জাতিসত্তার সঙ্গে ধর্মীয় পরিচিতিতে মিশিয়ে ফেলার যে প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজও বিদ্যমান, শরৎচন্দ্র নিজেও এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত ছিলেন না—তার পরিচয় মেলে 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব' উপন্যাসের সূচনা অংশে 'ইস্কুলের মাঠে ব্যাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। এই ধরনের সংকুচিত, খণ্ডিত দেশাত্মবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা প্রথমাবধি মুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে কথক সত্যচরণকে আদিম অরণ্যজাতির' অনার্য রাজকন্যা ভানুমতীর জিজ্ঞাস্য 'ভারতবর্ষ কোনদিকে?' বিমূঢ় পাঠককে এই সত্যের সম্মুখীন রেখে দেশ সম্পর্কিত ধারণাটি থেকে এদেশের অগণিত সরল, নিরক্ষর ও অচেতন জনতার অবস্থান বহুযোজন দূরে। ফলত জাতীয়তাবোধ বা ভারতীয়ত্বের ভাবনা চিরকাল এদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অধিকারে থেকে গেছে। এই বিশিষ্ট ভারতভাবনার উত্তরাধিকারের প্রেক্ষিতে প্রায় সমকালীন অন্য দুই ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের গল্পে—উপন্যাসে ভারতভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ শতকের প্রথম পাদে প্রাক-স্বাধীন এবং সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজের ভাঙন, গোষ্ঠীজীবন, চন্ডীমণ্ডপে ক্ষমতার বৃত্ত ও কৌলিক বৃত্তিতে যে রূপান্তর ঘটে যাচ্ছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি এঁদের রচিত আখ্যানে উঠে এসেছে। রাঢ় বাংলার কথাকার তারাশঙ্কর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী','গণদেবতা', পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি উপন্যাসের ক্রমে বদলে যাওয়া গ্রাম ভারতের রূপান্তরের দ্রষ্টা ও ভাষ্যকার। অন্যপক্ষে সতীনাথ পূর্ণিয়ার দর্শনে ভারতকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'জাগরী' বা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কিংবা 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এর মত উপন্যাসের পরিকল্পনাকে সম্ভব করেছে। আবার স্বাধীন ভারতে প্রশাসনিক ক্ষমতাভোগের সুযোগ যখন এল, তখন সতীনাথ নিস্পৃহচিত্তে এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন। 'সংকট' উপন্যাসের বিশ্বাসজী কি তাঁরই প্রতিরূপ নন; লেখক সতীনাথ এই দ্বন্দ্বমুখর সমকালকে ফুটিয়ে তুলেছেন সমান নিরাসক্ত ভঙ্গিমায়। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' এবং সতীনাথের 'জাগরী' পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাঁধা রাজনৈতিক উপন্যাস। 'ধাত্রীদেবতা'য় একটি খণ্ডবিখণ্ড গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রাবল্যে সংহত হল। শিবনাথ আত্মমর্যাদায় স্থিত থেকে ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে না এসে কারাবরণকে শ্রেয় মনে করেছে, তার লড়াইকে আরো মজবুত করতে কাশী থেকে পিসিমা এবং মামার বাড়ি ছেড়ে গৌরী সব অভিমান ভুলে এসে দাঁড়িয়েছেন। অহিংস অসহযোগে যোগ দিতে গিয়ে শিবনাথ গোঁসাইজীকে বলেছিল এ লড়াইয়ে মারতে হয় না, শুধু মরতে হয়। এতে আচ্ছে বিপ্লবী দলের আর্ন্তদলীয় কলহের জেরে সহকর্মীর হাতে দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতার মৃত্যুবরণের ঘটনা, যা প্রোটাগনিষ্ট শিবনাথের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এভাবেই তারাশঙ্কর গ্রাম শহর সমেত সমস্ত অঞ্চলকে মিলিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে। অন্যদিকে 'জাগরী' উপন্যাসে দেশের একটি বিশেষ কালপর্বে ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে একটি পরিবার, পরিবারের চারজন সদস্য। বাংলা উপন্যাসের সুদীর্ঘ প্রবাহে পরিবর্তমান ভারতবর্ষীয় গ্রাম সমাজ, বিপুল জনতা এভাবেই বারে বারে বিষয়বস্তু হিসাবে বিম্বিত হয়েছে।

পাদটীকা ঃ

১) Guha Ranajit/ An Indian Historiography of India, A Nineteenth Century Agenda and its Implications/ S. G. Denskar Lectures on Indian History/ 1987/ K. P. Bagchi & Co., Kolkata

২) Desai A. R./ Social Background of Indian Nationalism/ Prologue, Page-1 & 2/ fifth edition Reprint 1981/ Popular Prakashan, Bombay

৩) রায় অনুরাধা/ 'উনিশ শতকের বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের বাংলা ও ভারত'—গ্রবন্ধ/ 'বাঙালির সাংসঋতিক দিগন্ত'/ সম্পাদনা—উজ্জ্বলকুমার মজুমিদার/ পৃ-১৪১/ আগষ্ট ২০০১/ সোনার তরী, কলকাতা-৫৭

৪) Stamp Dudlay/'marked of by nature as a region of 'realm' by itself; উৎস 'The Etymology of the Indian Nation\ Bratindranath Mukhopadhyay\ The Felegraph\ 19th August 1992

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র/আনন্দমঠ, প্রথম খণ্ড/বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (সমগ্র উপন্যাস)/ চৈত্র ১৩৭৬/সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭২৭

৭) Said Edward/ 'Yeats and Decolonization" প্রবন্ধ Page 271/ Culture and Imperialism গ্রন্থ/ Vintage edition 1994/ উৎস অনুরাধা রায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ

৮) তদেব/ একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭২৯

৯) 'আমাকে নিরতিশয় শুচি হইতে হইবে। আমি সকলের সঙ্গে সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়া নাই। বন্ধুত্ব আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নহে, নারীর সঙ্গে যাহাদের পক্ষে একান্ত উপদেয় আমি সেই সামান্যশ্রেণীর মানুষ নই, দেশের ইতরসাধারণের ঘনিষ্ঠ সহবাস আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয়। / গোরা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড উপন্যাস/আশ্বিন ১৩৯২/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ পরিচ্ছেদ ৭১/ পৃঃ ৯০৯

১০ 'গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশেরহৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রেনামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, আমি তোমাদের তোমরা আমার'।' তদেব/পরিচ্ছেদ ৬, পৃঃ ৬৪৬

১১। তদেব/পরিচ্ছেদ ৫৩, পৃঃ ৮২৯

১২। তদেব/ পরিচ্ছেদ ৭৫, পৃঃ ৯২১

১৩। 'আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু! আমি যে পতিত হব, ব্রাত্যহব, সে ভয় আর আমারনেই—আমাকে আর প্রতি পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।/ তদেব/পরিচ্ছেদ ৭৬ পৃঃ ৯২৩

১৪। তদেব/ পরিচ্ছেদ ৭৫, পৃঃ ৯২৩

১৫। তদেব/ পরিচ্ছেদ ৭৬, পৃঃ ৯২৪

১৬। তদেব/ পরিশিষ্ট ৭৫, পৃঃ ৯২৫

১৭। চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র/ শরৎ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ প্রথম খণ্ড/পৃঃ ১; প্রথম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ১২ ভাদ্র, ১৩৮২; শরৎ সমিতি কলকাতা ২৯

উনিশ শত-কর কলকাতার কড়চা ও হু-তাম প্যাঁচার নকশা

মিষ্টু সামন্ত

বাঙালি সমাজ সংস্কৃতি এবং জীব-ন উনিশ শত-কর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সীমিত সম-য়র ম-ধ্য অনন্ত বৈচিত্র্য-ক ধারণ ক-র এই শতক সাহিত্যিক গদ্য, ইহবাদী খন্ড কবিতা, পাশ্চাত্য এপিক ও রোমা-ন্সর আদ-র্শ মহাকাব্য আখ্যান কা-ব্যর সমৃদ্ধ ধারার শুভ সূচনায়, তথা ছোটগ-ল্পর উ-ন্ম-ষ এক নব যু-গর দ্বা-রাদঘাটন করল। প্রাচীন জীবনাদর্শ, মূল্য-বাধ, ধ্যানধারণা-ক ধ্বস্ত ক-র দি-য় ইউ-রাপীয় নব-চতনার আ-লা-ক জাতীয় জীব-ন নবজাগরণ সম্ভব হল-'যদিও আমা-দর চারদি-ক আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আ-লার প্রতি স-ন্দহ-ই উদ্যত ক-র আ-ছ। তবু তার ম-ধ্য ফাঁকা ক-র ইউ-রা-পর চিত্ত আমা-দর সাম-ন এ-ন-ছ জ্ঞা-নর বিশ্বরূপ।'

ঔপনি-বশিক ভারত-বা-ধ সর্বাত্মক জাগরণ সম্ভব ছিল না।ত-ব চিন্তা ও ভাবজগ-ত যে বিপ্ল-বর কথা বলা হ-য়-ছ বিভিন্ন জায়গায়,তা-ক নবজাগরণ বলা যে-তই পা-র। র-মশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টতই ব-ল-ছন--

"The British conquest of Bengal was not merely a political revolution,but brought in a greater revolution in thought and ideas,in religion and social progress....."[1]

উনিশ শত-কর এই পরিবর্ত-নর অনুঘটক হিসা-ব কার্যকরী ছি-লন আপন স্বাত-ন্ত্র্য উজ্বল, অনুসন্ধিৎসু, সমাজ স-চতন,আইন ব্যক্তি-ত্ব আস্থাবান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রথমা-র্ধ রাম-মাহ-নর সমাজ ও ধর্মসংস্কার এবং ইয়ং-বঙ্গ-লর প্রতীচ্য ভাবদীক্ষার স-ঙ্গ দ্বিতীয়া-র্ধ বিদ্যাসাগ-রর সমাজ সংস্কার এবং পরবর্তী হিন্দুধ-র্মর পুনরুত্থান——যেন স্বতন্ত্র দুই যু-গর বৈশিষ্ট্য নি-র্দশ ক-র। এই দুই-য়র ম-ধ্য ১৮৫৭ মহাবি-দ্রা-হ যুগ বিভা-গর দ্যোতক হিসা-ব গণ্য হ-য়-ছ।

উনিশ শত-কর এই নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান হ-য় উঠল কলকাতা। প্রথম দি-কই বাণিজ্য-কন্দ্র হিসা-ব কলকাতা বিকশিত হ-ল। বাড়ি, জমির দাম বে-ড় গে-লা। কেননা জীবিকার প্র-য়াজ-ন নানা ভাষাভাষী লোক এ-স ভীড় জমা-লা এই শহ-র। বাণিজ্য-কন্দ্র কলকাতায় নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মিত হ-ত লাগল। ছোট্ট তিনটি গ্রাম ক্রমশ রূপ নিল, 'মহানগ-রর', ম্য-লরিয়ার দুর্দান্ত প্র-কা-পর কার-ণ কলকাতা শুরুর দি-ক মো-টও স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল না।১৭৭৩ এ কলকাতা ব্রিটিশ ভার-তর রাজধানী হিসা-ব স্বীকৃতি পে-লও এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, প্রণালী ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আশাব্যাঞ্জক ছিল না। এসব কিছু স-ত্ত্বও কলকাতার ক-লবর ও সমৃদ্ধি নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উনিশ শত-ক বিকাশমান কলকাতা শহ-র কিছু সুবিধাবাদী মানুষ নতুন জমি-নীতির ফায়দা তু-ল হঠাৎ নবাব বা জমিদার হ-য় উঠল। দেশীয় ঐতিহ্য সম্ব-ন্ধ স-চতনতার পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক যুক্তিবা-দর প্রতি আকর্ষ-ণর কার-ণ মন-ন আচর-ণ স্ববি-রাধী ছিল অপরিণত। অপরিহার্য এই সাংস্কৃতিক সংঘাত, পাশ্চাত্যীকর-ণর মোহ। হঠাৎ নবা-বর লীলা-ক্ষত্র কলকাতা ক্রমশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনি-বশিক রাষ্ট্র কাঠা-মার মুখ্য কেন্দ্র হ-য় উঠল। কলকাতা ইন্দ্রিয় সং-বদ্য জীবনযাপ-নর পাশাপাশি প্রাগসর ইউ-রাপীয় চিন্তা চেতনারও অংশীদার হ-য় উঠল।

বাংলা সাহি-ত্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্র অঙ্ক-নর একটি ধারা বহুদিন প্রচলিত। গ-দ্য তার প্রথম প্রকাশ ১৮২১ খ্রীঃ সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্প-ণ' প্রকাশিত 'বাবু' উপাখ্যা-ন (সংবাদপ-ত্র সেকা-লর কথা১ম গদ্য ভবানীচরণ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় এই শ্রেনীর রচনায় পথপ্রদর্শক। তাঁর

রচিত 'কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) ও নববাবু বিলাস (১৮২৩) দুটিই কলকাতা কেন্দ্রিক ব্যঙ্গ চিত্র। উনিশ শত-কর শেষা-র্ধ বাংলা গ-দ্য যে দুটি প্রধান গ-দ্য প্রকাশিত সমাজ-চিত্র লক্ষিত হয়। সেগুলি হল-প্যারীচাঁদ মি-ত্রর 'আলা-লর ঘ-রর দুলাল'(১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬২)।

হিন্দু ক-ল-জর ছাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪০ কলকাতার জোড়াসাঁ-কা নিবাসী প্রসিদ্ধ সিংহ পরিবা-র জন্মগ্রহণ ক-রন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহি-ত্যর ইতিহা-স 'আলা-লর ঘ-রর দুলাল'-ক বি-শষ গৌর-বর স্থান দি-লও 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা'-ক নিন্দা ক-রছি-লন।

বঙ্কিম-নিন্দা :-

তিনি মন্তব্য ক-রন -'তাই বলিয়া আমরা এমত বলি-তছি না যে বাঙ্গালার লিখন পঠন হু-তামী ভাষায় হওয়া উচিৎ। তাহা কখ-নাই হই-ত পা-র না। তিনি য-তা চেষ্টা করুন, লিখ-নর ভাষা এবং কথ-নর ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকি-ব।.....কথ-নর উ-দ্দ-শ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখ-নর উ-দ্দশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উ-দ্দশ্য হু-তামী ভাষায় কখন সিদ্ধ হই-ত পা-র না। হু-তামী ভাষা দরিদ্র, ইহার ত-তা শব্দধন নাই, হু-তামী ভাষা নি-স্তজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই। হু-তামী ভাষা অসুন্দর এবং যেখা-ন অশ্লীল নয়, যেখা-ন পবিত্রতাশূন্য, হু-তামী ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য ন-হ। যিনি হু-তাম পেঁচা লিখিয়াছি-লন, তাঁহার রুচি বা বি-বচনার আমরা প্রশংসা করি না।'(চ-ট্টাপাধ্যায়, ১৯৬৯ বা: ৩২৪)

তাঁর অভিমতটি ছিল এই রূপ যে আলা-লর ঘ-র দুলাল-ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা সংস্কৃ-তর কঠিন নিগড় থে-ক মুক্তিলাভ ক-রছিল। প্রকৃতপ-ক্ষ প্যারীচাঁদ কাব্যভাষা প্র-য়া-গর ঝোঁকটি-ক গ্রহণ কর-লও কাঠা-মাটি ছিল সংস্কৃত লেখ্যরীতিই। অন্যদি-ক 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা'-তই সর্বপ্রথম এ-কবা-র কলকাতাইয়া 'মু-খর ভাষা' সহজ সাবলীলভা-ব রূপ পেল।

অপর প-ক্ষ 'আলা-লর ঘ-র দুলাল' এর লেখক বহু ক্ষে-ত্রই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক-রছি-লন তাই এটি প্রকৃত সমাজ চিত্র না হ-য় উপন্যাস লক্ষনাক্রান্ত হ-য় উ-ঠ-ছ। অন্যদি-ক হু-তাম সেকা-লর সমা-জর নিখুঁত ছবি এঁ-কছি-লন ব-লই তাঁর রচনা ফ-টাগ্রাফধর্মী। গল্প সে ক্ষে-ত্র গৌণ, মুখ্য উ-দ্দশ্য ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় সামাজিক রূপ বর্ণনা। আর তাই 'আলা-লর ঘ-রর দুলাল' যেখা-ন উপন্যাসধর্মী, সেখা-ন 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা' নকশাধর্মী। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'বঙ্গভাষার লেখক'(১৩১১) গ্র-ন্থ মুদ্রিত 'পিতা-পুত্র' প্রব-ন্ধ যথার্থই ব-ল-ছন--'আলা-লর ঘ-রর দুলাল' ও অ-নক স্থা-ন নকশা বা ফ-টা তুলিবার চেষ্টা আ-ছ ব-ট, কিন্তু তাহা-ত পল্লীসমা-জর চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়া-ছ, কলিকাতার অলি গলির নকশা তেমন ফুটন্ত হয় নাই.....কলিকাতার নানাবিধ নকশা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাই-ত লাগিল ফু-লা গাল টিপিয়া বলি-ত লাগিল ই-য় রাজবাড়ীকি নকশা, বড় সমজদার হ্যায়, ই-য় শোভাবাজারিকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ই-য় হাই-কাটকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়,.....ম-ন করিলাম, আমা-দর বাঙ্গালা ভাষা-ত বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল ফোটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। ম-ন করিলাম, আমা-দর মাতৃভাষা সর্বা-ঙ্গ রঙ্গময়ী।[৩]

যে-কান গ্র-ন্থর ক্ষে-ত্রই লেখ-কর অভিপ্রায়টি শি-রাধার্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ গ্রন্থটির ভূমিকাং-শ যদিও হাস্যচ্ছ-ল ব-ল-ছন, বাংলা সাহি-ত্যর 'বেওয়ারিশ লুচির ময়দা' তাঁ-ক উৎসাহিত ক-রছিল নকশা রচনা কর-ত। নকশাগুলি-ক তিনি দর্পণ সাহিত্যরূ-প উপস্থাপিত ক-রননি । নীলদর্প-ণর বাক-বিতন্ডায় বীতশ্রদ্ধ হ-য়ই 'বু-ড়া বয়-স সংসা-র রং ক-ত্ত হ-লা'। যখন কালীপ্রসন্ন ব-লন যে, সহৃদয় বাঙালির কা-ছ এই গ্রন্থ সহ-জ গৃহীত হ-ব, কারণ এটি নাকি বাঙালি সমা-জর উন্নতির নিমিত্ত রচিত। 'হু-তা-মর নকশা' বঙ্গসাহি-ত্যর নূতন গহনা ও সমা-জর প-ক্ষ নূতন হেঁয়ালি'। 'দেশাচার

সং-শাধ-ন'র প্র-য়াজ-ন 'যদি ভাল ক-র চো-ক আঙুল দি-য় বুঝি-য় দেওয়া না হয়, তা হ-ল সাধার-ণ এর মর্ম্ম বহন ক-র পা-ত্তন না ও হু-তা-মর উ-দ্দশ্য বিফল হ-তা'----এটিই ছিল লেখ-কর মূল অভিপ্রায়।

'হু-তাম প্যাঁচার নকশা' গ্র-ন্থর প্রবন্ধগুলি-ক বিষয়-ভিত্তি-ত ক-য়কটি পৃথক শ্রেণি-ত অর্ন্তভুক্ত ক-র উনিশ শত-কর কলকাতার সঠিক চিত্রটি অনুসন্ধান করা যাক ----

- বাবুবৃত্তান্ত ও ভ্রষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ
- ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক প্রবন্ধ
- লৌকিক রীতি-নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ
- ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর প্রবন্ধ
- হুজুগ নির্ভর প্রবন্ধ

বাবু বৃত্তান্ত ও ভ্রষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ :-

গ্রন্থটির ভূমিকাং-শ লেখক কালীপ্রসন্ন সিং-হর স্পষ্ট স্বীকা-রাক্তি যে তাঁর গ্র-ন্থর লক্ষ্য--- 'কলকাতার কতিপয় বাবু'। প্রচলিত হিন্দু ধ-র্মর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব নি-য়ও কলকাতার এই হঠাৎ-ধনী সম্প্রদা-য়র অ-ন-কর-ই আচরণ ছিল চূড়ান্ত পরিণা-ম অহিন্দু । প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায়' 'জাত থাকার কি উপায়',-এ হেমচ-ন্দ্রর এই উক্তি----'এক্ষ-ণ হিন্দুয়ানীর মাহাত্ম্য বুঝিলাম লুকাইয়া খাই-ল পাপ নাই। প্রকাশ্য রূ-প খাই-ল পাপ.....দ্বার বন্ধ করিয়া যবনী আহার ও মদ্যপা-ন উন্মত্ত হই-ব---তাহা-ত দোষ নাই.....'এভা-ব হু-তাম ও কলকাতার অ-নক 'প্রকৃত হিন্দু দম্পতির' আসল রূপটি তু-ল ধ-র-ছন স্পষ্টভা-বই----সহ-রর অ-নক প্রকৃত হিন্দু বু-ড়া দম্পতির এক-একটি রাঁড় আ-ছ একথা আমরা পূব-ই ব-লছি, এ-দর ম-ধ্য টিপ তেলক ও ছাপা কে-ট, গীত গোবিন্দ ও তসর প-র, হরিনাম ক-ত্ত ক-ত্ত বাড়ি ফে-রন----হঠাৎ লো-ক ম-ন কর-ত পা-র শ্রী যীত গঙ্গাস্নান ক-র এ-লন, কেউ কেউ বাড়ি-ত প্রিয়জন-ক আনান সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হ-ল ভো-রর সময় বিদায় দি-য় স্নান ক-র পূ-জা ক-ত্ত ব-সন।'[৩]

হু-তাম এর গ্র-ন্থ-এই সমস্ত বাবু-দর মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা, ইংরাজি ভাষা-প্রীতি, সা-হবি পোষাক পরিধান, বিজাতীয় খাদ্য ও পানী-য় আসক্তি, বিজাতীয় আচার আচরণ, ইংরাজী শিক্ষা লাভ ক-র সা-হবি চাকরি করার মধ্য দি-য় জীব-নর সার্থকতা সীমাবদ্ধ ক-র ফেলা এবং ক্রমবর্ধমান জনবিচ্ছিন্নতা, পিতা, মাতা, স্ত্রীর প্রতি অব-হলা ও উপস্ত্রীর আনুগত্য, স্বার্থপরতা, লোভ, বিলাসিতা, আলস্য যা এ-দশীয় ঐতিহ্য সম্মত না-এস-বর কার-ণই বাবুরা প্রায়শই সমা-লাচিত ও হাস্যস্পদ হ-তন। ইন্দ্রনাথ ব-ন্দাপাধ্যায় 'ভারত-উদ্ধার কাব্য' এ ভীরু ও বাক্যবাগীশ বাঙালি বাবু-দর হাস্যকর আচরণ লক্ষনীয়।

প্রকৃতপ-ক্ষ রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্ব-ন্দ্ব তাঁরা ছি-লন সদা সর্বদা বিচলিত। 'বাংলার নব-চতনার ইতিহাস' গ্র-ন্থ অধ্যাপক স্বপন বসু উনিশ শত-কর প্রথমা-র্ধ রক্ষণশীল বাঙালী হিন্দু সমা-জ গঠনমূলক এবং যু-গাপ-যাগী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ ব-ন্দাপাধ্যা-য়র কথা ব-ল-ছন----যাঁ-দর চরিত্র ছিল এ-হন স্ব-বি-রা-ধ পরিপূর্ণ।

হু-তাম এই সমস্ত ইংরাজী কেতার বাবু-দর দুটি দ-ল বিভক্ত ক-র ব-ল-ছন যে প্রথম দল-'উচুঁ-কতা সা-হ-বর গোব-রর বিষ্ট', দ্বিতীয় দল-'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ', বি-শষত ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপল-ক্ষ রক্ষনশীল হিন্দুরা সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা-ক প্রশ্রয় দি-তন। বা-রাইয়ারী পূজায় নাট-কর জায়গা দখল করল হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রায় দল শেষ রাত্রি-ত তা পরিণত হয় চাপা কাঁচা খেউ-ড় ।

কোন কোন বাবুর বসবাস সোনাগাছী-তই।-'প্রায় সক-লরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখন

ও অ-ন-কর আ-ছ)। বেলা দুপু-রর পর উঠ-তন, অধিকাংশ আড়ম্বরটাও বড় ছিল-দু-তিন ঘন্টার কম আহ্নিক শেষ হত না, তেল মাখ-তও ব-ড়া চার ঘন্টা লাগ-তা-চাক-রর তেল মাখানির শ-ব্দ ভূমিকম্প হ-তা-বাবু উলঙ্গ হ-য় তেল মাখ-তন, সেই সময় বিষয়কর্ম্ম দেখা, কাগজ প-ত্র সই ও মোহর চল-তা আঁচাবার স-ঙ্গ স-ঙ্গ সূর্য্য-দব অস্ত যে-তন.....কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমা-তন-সন্ধ্যার পর উ-ঠ কাজকর্ম ক-ত্তন-দিন রাত ছিল ও রাত দিন হ-তা'-বাবী-দর কদাচা-রর কার-ণ কলকাতা শহর যে 'বেশ্যাসহর' হ-য় উ-ঠ-ছ তা স্পষ্টতা মে-ন নি-য়-ছন গ্রন্থকার। প্রকৃত ধ-নর অধিপতি হ-য় এরা যে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গ-লর জন্য কায়ম-ন যত্ন নে-ব এ আশা তিনি ক-রন না -উনিশ শত-কর বাঙালি বাবী শ্রেনিরা সেকা-জর যোগ্য হিসা-ব প্রমাণ রাখ-ত ব্যর্থ।এই সকল 'উচুঁ দ-ল খাস হিন্দু, বাবু-দর হু-তাম--'রিফর-র্ম্মশ-নর প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গমুখ সৌভা-গ্যর প্রলয় কন্টক ও সমা-জর কীট।' ব-ল বর্ননা ক-র-ছন।

এই সময় প্রীতিগীতি-ত আধ্যাত্মিকতায় মোড়-ক প্রাধান্য পেল জাগতিক বাবুবিলাস। নববাবু-দর গান গ-ড় উঠল পত্নী-প্রণয়িনী-রক্ষিতা-বেশ্যার ম-নর কথায়। টপ্পার ছ-ন্দ এল আখড়াই ছাপ-কখনও ফুল কখনও বা হাফ। তার ইঙ্গিত মে-ল হু-তা-মর কল-মও--'...মেঘা-ন্তর রৌ-দ্রর মত ইংরাজ-দর প্রতাপ বে-ড় উঠল... ন-ক মুন্সী, ছি-র বে-ন ও পু-ট তেলি রাজা হ-লা। 'হিন্দু ধর্ম্ম, কবিরগান, বিদ্যার উৎসাহ, প-রাপকার ও নাট-কর অভিনয় দেশ থে-ক ছু-ট পালা-লা।.... টাকা বংশ গৌরব-ক ছাপি-য় উঠ-লন..... এই সময় হাফ আখরাই ও ফুল আখরাই সৃষ্টি হয়।'

বা-রায়ারী পূজায় বাঈ খ্যামটা না-চর অনধিক্য-ক ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি-ত তু-ল ধ-র-ছন হু-তাম--'সহ-রর নন্নী, মীন্নী, মীন্নী,খন্নী ও সন্নী প্রকৃত ডিগ্রী, মে-ডল ও সার্টিফি-কট ওয়ালা বড় বড় বাই-য়রা ও গোলাপ, শাম, বিদী, ঘুঘু, মনি, চুনী প্রভৃতি খ্যামটা ওয়ালীরা নিজ নিজ তোবড়া তুবড়ি স-ঙ্গ ক-র অ-স্ত লাগ-লন-.....তাঁ-দরও গর-ব মাটি-ত পা পড়-ব না।'

ইংরাজী কেতার বাবু-দর হয়-তা বা অন্নসংস্থান হয় না। কিন্তু মু-খ দেশ সংস্কা-রর কথা। দি-নর বেলায় এরা পুলিশ, অফিস আদাল-ত ঘু-র বেড়ান। তার রা-তর বেলা ব্রম্ভসভার মিটিং।

'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ' এমন কিছু ইয়ং-বঙ্গল বাবু-দর প্রস-ঙ্গ হু-তাম জানা-চ্ছন যে এরা বাঙালি হিন্দুর চিরকালীন দীর্গাপূজার ও কিছু 'রিফাইন্ড কেতা' বাবী ক-র-ছন। ব্রাম্ভন ভোজ-নর বদ-ল বন্ধু বান্ধবরা মদ্য মাংস সহ প্রসাদ গ্রহন ক-রন। প্রদত্ত প্রনামী পু-রাহিত ব্রাহ্ম-ণর বদ-ল সেই বাবুর নিজস্ব তহবি-ল জমা হয়। দীর্গা প্রতিমার সাম-ন বিলিতি চর্বির বাতি জ্ব-ল ও বি-ল-ত থে-ক অর্ডার দি-য় যে প্রতিমা বানা-না হয় সেই-'মা দীর্গা মুকু-টর পরিব-র্ত ব-নট প-রন, স্যান্ডউই-চর শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজ-ল পরিব-র্ত কাৎলীকরা গরম জ-ল স্নান ক-র থা-কন।'

উনিশ শত-কর কলকাতার বাবীসংস্কৃতির এই বিস্তৃত পরিচ-য়র পাশাপাশি বাবু সংস্কৃতির পূ-র্বর স-ঙ্গ এই সম-য়র পরির্তনটি-কও চিহ্নিত কর-ত ভো-লননি।

'দে-শর লো-কর মনই সমা-জর লো-কা-মাটি-বর মত, ব্যবহার কেবল ও-য়দরক-মর কাজ ক-র। দেখুন আমা-দর পূর্বপুরু-ষরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত ক-র মল্লযু-দ্ধ আ-মাদ প্রকাশ ক-ত্তন, নাট-ক ত্রোট-কর অভিনয় দেখ-তন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহি-ত্যর উৎসাহ দি-তন, কিন্তু আজকাল আমরা বা-রায়য়ারি তলায় নয় বাড়ি-ত, বেদনীর নাচ ও, 'মদন আগু-নর' তা-ন পরিতুষ্ট হাচ্ছি, ছোট ছোট ছে-ল ও মে-য়-দর অনু-রাধ উপলক্ষ ক-র, পীতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেঁউ-ড় আনন্দ প্রকাশ কচ্ছি, যাত্রাওয়ালা-দর , 'ছকুবাবু'ও 'সুন্দ-রর' সৎ নাবা-ত হুকুম দিচ্ছি। মল্লযু-দ্ধর তামাশা দেখ, 'বুলবুল ফাইট' ও 'ম্যাড়ার লড়া-য়' পট্যবসিত হ-য়-ছ। আমা-দর পূর্বপুরু-ষরা পট্যবসিত লড়াই ক-র-ছন,

আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্প-রর অসাক্ষা-ত নিন্দাবাদ ক-র থাকি, শে-ষ এবং প-ক্ষর 'খেঁউ-ড়জিত' ধরাই আ-ছ।

উনিশত-কর বাবু কালচা-রর এ-হন নৈতিক পতন ও ভ্রষ্টাচা-র নিমগ্ন জীবনযাত্রার প্রতি ব্য-ঙ্গর কশাঘাত হে-ন-ছন হু-তাম। অভিপ্রায়টি ছিল সমাজ সং-শাধ-নর।

ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক প্রবন্ধ :-

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগর-ণর স্বপ্নদর্শী তরুণদল-ই বাংলার নব-চতনার ইতিহা-স 'ইয়ং-বঙ্গল' না-ম পরিচিত। পাশ্চাত্য প্রভা-ব প্রভাবিত ডি-রাজিওর ব্যক্তি-ত্ব অভিভূত এবং আচর-ণ সংস্কার বি-রাধী হওয়ায় মুসলমান খানসামার রান্না, বিস্কুট, বিফ স্টিফ, ফাউলকারি ও মদ ছিল তা-দর বিশ্বা-সর জায়গা, বিশ্বাস ছিল না পু-রাহি-ত দেব দেবী-ত্ব। ত-ব রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্ব-ন্দ্ব তাঁরা সদা বিচলিত ছি-লন। এ-হন ইয়ং বেঙ্গলীয়-দর প্রচলিত হিন্দুধ-র্মর ত্রুটিও অসম্পূর্নতার বিরু-দ্ধ এসকল ছিল প্রতিবা-দর একটি ধরণ । রাম-মাহন রায়ও তাঁর অনীবর্তীরা হিন্দু-ত্বর সবকিছু-ক বর্জন না ক-র হিন্দু ধর্ম বা সংস্কা-রর মানসিকতা নি-য় ব্রাহ্ম ধ-র্মর প্রতিষ্ঠা কর-লন। দ্বন্দ্ব দেখা দিল ইয়ং বেঙ্গল এবং ব্রহ্ম-দর ম-ধ্য। এমনকি দ্বন্দ্ব দেখা দিল ব্রাহ্ম-দর ম-ধ্যও এ দ্বন্দ্ব ভাবদ্বন্দ্ব। তর্ক উঠল মূর্তিপূজা নি-য় নিরাকার ও সাকার ব্র-হ্মর ব্যাখ্যায়। উনিশ শত-কর এই ধর্মীয় দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিটির অনুপুঙ্ক্ষ বর্ননা দি-য়-ছন হু-তাম । রাম-মাহ-নর ছে-ল রাধাপ্রসা-দর মূর্ত্তি পূজা-ক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব-ল মে-ন নি-লও। একথা অবশ্য স্মরণীয় ব্রাহ্মসমা-জর অন্যতম ট্রাস্টী রামপ্রসাদ পিতার নি-ষধাজ্ঞা অমান্য ক-র পৌত্তলিক ম-ত মা-য়র শ্রাদ্ধ ক-রন। হু-তাম জানা-চ্ছন---'রামপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্ম সমা-জর ট্রাস্টী মার সপিন্ডীকর-ণ পৌত্তলিকতার দাস হ-য় শ্রাদ্ধ কর-বন শু-ন কার না কৌতুহল বা-ড়।'(পৃ:-৬৭)

রাম-মাহন অনুরাগী-দর কাথায় ও কা-জ এ-হন বড় অশ্লি-লর কার-ণ তা হিন্দু ধর্ম এবং ইয়ং-বঙ্গল-দর সুনজ-র ছিল না' কারণ এই ভাব দ্বন্দ্ব থে-কই ব্রাহ্ম-দর ম-ধ্য অ-ন-কই মূর্ত্তিপূজা, কলসী উৎসর্গ করা, কালীপূজা করা, বিধবা বিবা-হ যাবার প্রয়শ্চিত্ত স্বরূপ' শ্রী বিষ্ণু স্মরণ ক-র গোবর' খাওয়া-তও পিছপা ছি-লন না । এই চারিত্রিক স্ববি-রা-ধর দি-কও অঙ্গুলি নি-র্দশ ক-র-ছন হু-তাম যা উনিশ শত-কর কলকাতা একটি পরিচিত ও প্রচলিত সমস্যা।

'ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমান-দর অপদার্থ ও আসার ব-ল জা-নন তাঁরাও ব্রাহ্ম-দর পাগল ও ভন্ড ব-ল স্থির ক-রন।.....কা-লর অব্যর্থ নিয়-ম প্রতিদিন সংসা-রর যেমন-পরিবর্ত্তন হ-চ্ছ। ধর্ম্ম সমাজ, রীতি ও নিয়ম ও অ্যাড়া-চ্ছ না । যে রাম-মাহন রায় বেদ-ক মান্য ক-র তার সূ-ত্র ব্রাহ্ম ধ-র্মর শরীর নির্ম্মান ক-র-ছন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই ম-ধ্য তাঁর শিষ্যদল সেটি অস্বীকার ক-রন-ক্র-ম কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্ম ধ-র্মর অলঙ্কার ক-র তু-ল-ছন' (পৃ:-৮১)

ধর্মীয় ক্ষে-ত্র অন্যতর একটি উনিশ শতকীয় সমস্যার দি-ক লেখক ম-না-যাগ আকর্ষণ ক-র-ছন, যেটি পরবর্তী-ত অবলীপ্ত সেটি হল গুরুপ্রসাদী ব্যবস্থা । হিন্দুধ-র্মর গোঁসাইগিরি সকলপ্রকার সুখ স্বাছ-ন্দ্য আধিপত্য বিস্তার ক-রছিল। । 'পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চ-ল বৈষ্ণব ত-ন্ত্রর গুরুপ্রসাদী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল-নতুন বিবাহ হ-ল গুরু-সবা না ক-র স্বামি সহবাস করার অনীমতি ছিল না'-এ-হন অনৈতিক প্রথা পরবর্তীকা-ল বন্ধ হ-য় গে-লও, উনিশ শত-কর এই উজ্জ্বল উপস্থিতির দি-কই কটাক্ষপাত ক-র-ছন হু-তাম। কালীপ্রসন্ন সিংহ খন্ড খন্ড গল্পাং-শর সহায়তায় একদি-ন যেমন দেব-দবীপূজার বিবাহ রীতির ও সন্তা-নর শুভাশু-ভর স-ঙ্গ জড়িত বিবিধ প্রাচীন হিন্দুরীতির অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দি-য়-ছন, তেমনি হিন্দু ধ-র্মর কু-সংস্কারাচ্ছন্ন, নৈতিক পতনটি-ক ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি-ত কশাঘাত ক-র-ছন ।

ঐতিহাসিক ঘটনার উ-ল্লখ:-

উনিশ শত-কর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাও হু-তা-মর লেখনী-ত উ-ঠ এ-স-ছ। যেমন একথা সত্য যে ১৮৫৭র মহাবি-দ্রাহ উনিশ শত-কর শিক্ষিত বাঙালি-অভিজাতরা তো ব-টই মধ্যবিত্তরাও অ-ন-কই বি-দ্রাহ-ক 'হাঙ্গামা ম-ন ক-র বি-দ্রা-হর বিপ-ক্ষ ছি-লন । ত-ব এই বি-দ্রাহ যে ভারতবাসীর জাতীয়তা-বাধ-ক জাগ্রত ক-রছিল যা ব্যর্থ হ-লও ভবিষ্য-তর প্রেরণা ছিল। হুজু-গ বাঙালি সু-যাগ বু-ঝ কলকাতায় হুজুগ তুলল যে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়-নর কার-ণ এ বি-দ্রাহ কেউ বা আবার ম-ন ক-র--'দিলীপ সিংহ-ক কৃশ্চান করা-ত, নাগপু-রর রানী-দর স্ত্রী ধন কে-ড় নেওয়া-ত ও লক্ষ-নৌ-য়র বাদশাই যাওয়া-তই মিউটিনি হ-লা।'

কেউ বা বল-লন সা-হবরা হিন্দু ধ-র্ম হাত দেওয়া-তই মিউটিনি হ-য়-ছ। ক্র-ম এই মহাবি-দ্রা-হর আগুন ভবিষ্য-তর দিক নি-র্দশ ক-র নি-স্তজ হ-য় গে-লা।

মহাবি-দ্রা-হর পর বাংলার রাজনৈতিক আ-ন্দাল-নর ব্যাপ্তি যে অ-নক বে-ড় যা-চ্ছ তা বোঝা যায় নীলবি-দ্রাহ নামক ব্যপক কৃষক অভ্যুত্থা-ন যা শিক্ষিত ভদ্র-লাক, অভিহিত ও মধ্যবিত্ত মানু-ষর চিন্তা চেতনা ও সংগঠ-নর মাধ্য-ম সম্ভব হ-য়ছিল। বেন্টি-ঙ্কর আম-ল ১৮৩০ এর কুখ্যাত পঞ্চম আইন দাদন গ্রহণকারী কৃষ-কর প-ক্ষ নীলচাষ না ক-র আইন বিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার প-ক্ষ নীলকর-দর অত্যাচার মাত্রা ছাড়া। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ব-বাধিনী'-ত লি-খ-ছন--'ভীরুস্বভাব প্রজারা নীলকরদিগ-ক প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিয়া তাহারদিগ-ক অত্যন্ত ভয় ক-র, তাহা-দর সহিত বিবাদ করি-ত কুণ্ঠিত হয় ও তাহার-দর অত্যাচারজনিত দু:সহ দু:খান-ল অবিরত দগ্ধ হইয়াও তৎপ্রতিকার চেষ্টায় পরান্মুখ থা-ক'।৪

মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভা-ব প্রকাশিত,'আলা-লর ঘ-রর দুলাল' এ প্যারীচাঁদ মিত্র নীলকর-দর অত্যাচার বর্নণা ক-র-ছন--'নীলক-রর জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া-ছ। প্রজারা নীল বুনি-ত ইচ্ছুক ন-হ, কারণ ধান্যাদি বোনা-ত অধিক লাভ.....ম্যাজি-স্ট্রট নীলক-রর স-ঙ্গ খানাপিনা ক-রন, ফৌজদারি মামলায় তা-ক বিচা-রর এক্তিয়ার মফস্বল আদাল-তর নেই-ফ-ল গ্রাম বাংলায় নীলকর-ক সবাই য-মর ম-তা ভয় ক-র।.....বি-দ্রা-হর আগুন যখন চারিদি-ক ছড়িয়া পড়-ছ। সেই সন্ধিক্ষ-ণ ১৮৬০ এ প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মি-ত্রর 'নীলদর্পণ' ---- 'ইন্ডি-গা কমিশ-নর অনুসন্ধা-ন কে-চাঁ খুঁড়-ত গি-য় সাপ বে-রা-লা।' সেই সা-পর বি-ষ নীলদর্পণ জন্মা-লা'-------ব-ল ম-ন ক-র-ছন হু-তামও কবিওয়ালা-দর গা-নর মাধ্য-ম নীলক-রর অত্যাচার কাহিনি কী ভা-ব গ্রামান্ত-র ছড়ি-য় পড়ল তারও ছোট্ট একটি নিদর্শন রে-খ-ছন হু-তাম তাঁর গ্র-ন্থও 'হা: শালার গরু, তাল 'টিট ফিরিও ল্যাজমলা উঠ-লা যে সুখ, ঘট-লা অসুখ ম-ন, এতদি-ন, মহারানীর পু-ণ্য মোরা, ছিলাম সু-খ এই স্থা-ন', উঠ-লা খামার ভি-ট ধান, গ্যাল মানী লো-কর মান, হ্যান সোনার বাংলা খান, পোড়া-ল নীল হনুমা-ন। হু-তাম তাঁর গ্রন্থটির 'পাদ্রি লং 'নীলদর্পণ', নামক প্রব-ন্ধ ইঙ্গিতপূর্নভা-ব, 'ইন্ডি-গা কমিশন', 'ট্রেসপাস বিল' ও নীল বি-দ্রা-হর প্রবাদ পুরুষ হরিশ মুখু-জ্যর প্রসঙ্গ এ-ন এক ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খতার পরিচয় রে-খ-ছন সংক্ষিপ্ত পরিস-রও।

'হু-তাম প্যাঁচা নকশা'-ত কালীপ্রসন্ন সিংহ আ-রা একটি উ-ল্লখ-যাগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার উ-ল্লখ ক-র-ছন। সেটি হল হাওড়া থে-ক এলাহাবাদ পর্যন্ত প্রথমবার রেলও-য় যাত্রার অনুপুঙ্ক্ষ বর্ননা দি-য়-ছন, বিবিধ স্টেশন নাম থে-ক শুরু ক-র, স্টেশন মাস্টার রেল, পুলিশ, কুলি এমনকি প-কটমার উনিশ শত-কর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, প্রথম খব-রর কাগজ সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশ। হিন্দু ক-লজ প্রতিষ্ঠা ও হেয়ার সা-হ-বর প্রসঙ্গ চকিত দর্শন হ-লও উ-ল্লখ।

উনিশ শত-কর হুজুগপ্রিয় বাঙালি :-

কলকাত্তাইয়া বাঙালির হুজুগপ্রিয়তাও গ্রন্থটির একটি উ-ল্লখ-যাগ্য অংশ। যদিও হু-তাম স্বয়ং জানা-চ্ছন---'সাধার-ণ কথায় ব-লন 'হুন-রচীন' ও 'হুজ্জু-ত বাঙ্গাল', কিন্তু হু-তাম ব-লন ''হুজু-গ কল-কত্তা' হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুগ, সকল গুলি সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুবি।.....যতদিন ব্যঙ্গালির বেটার অকু-পশ-ন না হ-চ্ছ, যতদিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফ-র্ম্মশন না হ-চ্ছ, তত দিন এই মহান দো-য় মূল-চ্ছ-দর উপায় নাই।'(হুজুগ-৪৮)

এই হুজু-গর ম-ধ্য যেমন ছিল--- ছে-ল ধরা, জাল প্রতাপচাঁদ কাহিনি, ভন্ড মহাপুরু-ষর কাহিনি 'কৃশ্চানি হুজুক' এ তেমন আ-ছ সমুদয় শিখ-দর ধর্মান্তরিত হওয়ার মিথ্যা রটনা, তেমনি আ-ছ মৃত মানু-ষর নির্দিষ্ট তিথি-ত পুর্নবার মর্ত্যভূমি-ত ফি-র আসার ভিত্তিহীন হুজুগ। হু-তাম স্বয়ং জানা-চ্ছন 'মড়া ফেরা হুজুগ থাম-ল, কিছু দিন নানা সা-হব দশ বা-রা বার ম-র গ্যা-লন, ধরা পড়-লন ও আবার রক্তবী-জর মত বাঁচা-লন, সাত-প-য় গরু-দরিয়াই ঘোড়া-লক্ষ-ণী-য়র বাদসা- শিব-কষ্ট বাঁড়ু-য্য - ও-য়লস সা-হব- নীল বাবু-দর লঙ্কা কান্ড ল-ঙর মেয়াদ-কুশীর, হাঙ্গর ও নেক-ড় বা-গর উ-পা-তর মত ইংলিশম্যান ও হরকান নামক দুখানি নীল সা-হ-বর উৎপাত-ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক রাম-মাহন রা-য়র স্ত্রী শ্রা-দ্ধ দলাদলির ঘোঁট ও শে-ষ হটাৎ অবতা-রর হুজুগ বে-ড় উঠ-লা।'(২-৬০)

উনিশ শত-কর কলকাতার অনুপুঙ্ক্ষ বিদ্রুপাত্মক তথা বর্নণায় সমৃদ্ধ নকশা জাতীয় রচনা হিসা-ব কালীপ্রসন্ন সিং-হর 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা' অনন্য সার্থক ভা-বই মহাম-হাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রব-ন্ধ 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা' সম্ব-ন্ধ মন্তব্য ক-র-ছন ।

''হু-তাম পেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সম-য়র একটি মহার্ঘ রত্ন : ইহা-ত তৎকালীন সমা-জর অতি সুন্দর চিত্র আ-ছ, হু-তাম হু-তামীর ভাষায় প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হু-তামী পুস্ত-কর আদি পুরুষ। বোধ হয়, মৌলিকতার তৎকালীন সমস্ত পুস্ত-কর শির:স্থানীয়।' ৫

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১। The literature of Bengal, Ramesh Chandra Dutta,1895.

২। 'পিতা-পুত্র'বঙ্গ ভাষার লেখক, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১১,পৃ:-৫২৮

৩। 'হু-তাম প্যাঁচার নকশা' কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ,পৃ-৯৪

৪। 'পল্লী গ্রামস্ত প্রজা-দর দুরবস্থা বর্ণন, অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্ব-বাধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ন, ১৭৭২শক।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাল্গুন।

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প ঃ আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

উত্তম গিরি

ভারতবর্ষের মৃত বীরজোয়ানদের মরণোত্তর 'বীর পদক' দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই পদক ও সম্মান পাওয়ায় মৃতের কোন প্রত্যক্ষ লাভ হয় না বটে, তবে এতে তাঁর পরিবার-পরিজনেরা সম্মানিতও হন। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ বোধ হয় সেই 'বীর' লেখক; যিনি ব্যক্তি-জীবনে সুখ-শান্তির মুখ না দেখলেও বাঙালি পাঠকদের সুখী করেছিলেন; অবশ্যই মরণোত্তর কালে। জীবিতকালে তাঁর কবিতাকে প্রতিনিয়ত সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। সেই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। একালে আগামীদের কাছে কবি 'জীবনানন্দ মাত্র ব্যক্তি কবি নন-তিনি একটি ইনস্টিটুশন।'[১] অথবা 'জীবনানন্দ এক পৃথিবীর সত্য অন্ধকারের, অনির্বচনীয় আলো'[২] —ইত্যাদি নানা বড়ো বড়ো তক্‌মা কাব্যক্ষেত্রে জুটছে অথচ কথাসাহিত্যে জীবনানন্দের কপালে আজও তেমন কোন 'হেভিওয়েট' তক্‌মা জোটেনি। এর কারণ তিনি নিজে; সে পরিশীলিত মনন, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বোধের চর্চা তিনি বাংলা কবিতায় করেছিলেন, তা হজম করতেই বাঙালি কাব্য-পাঠকের কেটে গেছে ঢের সময়, তার উপর কথাসাহিত্যে সেই চর্চার 'ডিটেল' বুঝে ওঠা সমকালের গল্পখোর বাঙালির পক্ষে দুঃসাধ্য—এটা তিনি বুঝেছিলেন। সুতরাং একশোরও কাছাকাছি ছোটগল্প প্রায় তেরটির মতো উপন্যাস সে সময়ের জন্য বড়ো বড়ো কালো ট্রাঙ্কে কবরস্থ হল; অন্ধকারে মমির মতোই প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশায় সময়ের প্রতিক্ষায় বসে থাকল। বস্তুত তাঁর কথাসাহিত্য মূলত ব্যক্তি-মনের এক অনির্বচনীয় বোধের অনুভূতি মালা। কথাসাহিত্যের সেই অতল খনি থেকে দু' একটা ছোটগল্প নিয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্যেই কলম হাতে নেওয়া।

।। এক ।।

জীবনানন্দের কবিতাকে যদি দুটি মোটা দাগে ভাগ করে নিই, তাহলে তার এক ভাগে আছে নিরবিচ্ছিন্ন বাংলার নিঃসর্গ আর একভাগে মানুষ। প্রথম ভাগের প্রতিনিধি স্থানীয় কাব্য যদি হয় 'রূপসী বাংলা (১৯৫৭), দ্বিতীয় ভাগের অনুকল্প 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪)—যেখানে মানব মনস্কতাই মুখ্য। এর মানে এই নয় যে তাঁর কাব্যগুলি প্রকৃতি অথবা মানব সাপেক্ষ; প্রকৃতি ও মানুষ মিলে মিশেই জীবনানন্দের কাব্য-শরীর। জীবনানন্দের কাব্যে মানুষের প্রসঙ্গ এলেই 'আটবছর আগের একদিন' কবিতার সেই আপাত সুখী মানুষটির কথা মনে পড়ে যায়; লোকটির ব্যক্তিজীবন—'নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই' অথবা 'হাড়হাভাতে গ্লানি' তাকে স্পর্শ করেনি কোনদিন; অথচ সেই মানুষটিই শেষ পর্যন্ত—'লাসকাটা ঘরে/চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।' অদ্ভুত ব্যাপার। জীবনকে নিয়ে এমন পরিহাস করবার শক্তি কোথায় পেল এ কবিতার নায়ক? শুধু কি পরিহাস? না অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি এর পরিণতিতে সক্রিয়? উত্তরটা কবিতার মধ্যেই রয়েছে; যেখানে অসম্ভব বোধসম্পন্ন মানুষটি অনুব করেছে—'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে; /আমাদের ক্লান্ত করে,' অর্থাৎ এই ক্লান্তিই তাকে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথে চালিত করেছে—তা বুঝে নিতে আর অসবিধা হয় না। আলোচ্য কবিতাটি গল্পকার জীবনানন্দ ও তাঁর নায়কের চরিত্র বুঝে নিতে সাহায্য করে। শুধু মনে খট্‌কা থেকে যায় নায়কের এই 'বিস্ময়বোধ' 'বিপন্ন' কি কারণে? তাহলে কি কবিতার নায়ক সময়, সামাজিকতার চক্রব্যূহে বন্দী?—আর সেই বন্দী দশাই তার বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের আবির্ভাব প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে। যুদ্ধ মানেই তো অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত। সেই মূল্যবোধগুলি যখন প্রায় শীলিভূত, অথচ নতুন কোন স্থিতিশীল মূল্যবোধ তখনও গড়ে ওঠেনি, এমন এক অস্থির সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে আক্রান্ত মানুষ সময় ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি; তাদের এই মানিয়ে না নেওয়াটাই তো সাহিত্যে 'বিচ্ছিন্নতা বোধ' নামে পরিচিত। অর্থাৎ

প্রখর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধই বিচ্ছিন্নতার আদি ভিত্তি। এই বোধের শিকার কেবল মানুষেরাই; ইতর কোন প্রাণীরা নয়। তাই তাদের ক্ষেত্রে যা বেঁচে থাকা (to live) তা কখনোই অস্তিত্বশীল হওয়াকে (to exist) বোঝায় না। এ ব্যাপারটা জীবনানন্দের মতো প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন কবি অনুভব করেছেন:—'মানুষের মন/তবুও রক্তাক্ত হয় কোন এক অন্য বেদনায়/কীট যাহা জানে নাকো---জানে নাকো নদী-ফেনা-ঘাস-রোদ-শিশির-কুয়াশা/জ্যোৎস্না; অম্লান হেলিও ট্রোপ হায়।' (এই নিদ্রা/ধূসর পাণ্ডুলিপি) কবির এই বিশেষ অনুভবই তাঁকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে ফেলেছে : 'সকল লোকের মাঝে বসে/ মুদ্রা দোষে আমি একা হতেছি আলাদা?' (বোধ/ধূসর পাণ্ডুলিপি) শুধু কবিতার জগৎ নয়, ব্যক্তি-পরিচয় সূত্রে জীবনানন্দকে যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁদের সে পরিচয় বন্ধুত্বের তরলতায় সহজ সম্পর্ক-সূত্রে পৌঁছায়নি কোন দিন। জীবনানন্দের স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে এমনই বক্তব্য রেখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ ঃ 'দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন? তার একটি মাত্র উত্তর শোনা যেতো, 'ভালো লাগে না।' মানুষের সঙ্গ তার অসহ্য লাগতো। সাহিত্যিক আলাপ আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুতো দু'একটা নিস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গতাপ্রিয় কবির স্বধর্ম।'[৩]

সুতরাং এমন ধারার মানুষ যে স্বার্থান্বেষী, ভোগবাদী সমাজে অচল—তা আর বলার কি আছে। শুধু কি লেখক নিজে; তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা—মাল্যবান, সুতীর্থ, হেম, প্রভাত, সোমেন শান্তিশেখর; প্রত্যেকেইতো এই 'মুড' ও 'মাটিতে' গড়া। এরা প্রত্যেকেই জীবন-মৃত্যু-প্রেম প্রকৃতি সম্বন্ধে আলদা করে ভাবে। তাদের এই ভাবনার সঙ্গে সমকালের সাঁত্রর রুকিত্যাঁ ('নমিয়া'-১৯৩৮), কামুর মারসল ('দি স্ট্রেঞ্জার'—১৯৪২) অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী (পুতুল নাচের ইতিকথা ১৯৩৬) রাজকুমারেরা (চতুষ্কোণ) অনেকটাই স্বগোত্রীয় তবে মাত্রাগত পার্থক্য আছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে জীবনানন্দের নায়কেরা শুধু কি সময়, সামাজিক শাসনের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন? না আরো অন্য কোন কারণ ছিল, অথবা কি কারণে তাঁর গদ্য লেখাগুলি এত দেরিতে ছাপাখানার মুখ দেখলো? দুটো বিষয়ই পিঠে-পিঠ লাগিয়ে রয়েছে। সূত্রাকারে কারণগুলো দেখে নিতে পারি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, জীবনানন্দ যে সময় ও সমাজের অংশীদার তা মোটেই স্থিতিশীল নয়, প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মধ্যে সুবিধাবাদীরাই লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নিয়েছে মাত্র ঃ 'পৃথিবীতে সুদ্‌খাটে সকলের জন্যে নয়। /অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু'জনের হাতে/পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে/ সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।' (১৯৪৬-৪৭/বেলা অবেলা কালবেলা)। জীবনানন্দের ব্যক্তি-জীবনে এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছিল। বরিশালের যে উদার প্রকৃতি ও মানুষের সান্নিধ্যে কবির মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, তা নগর কলকাতার চক্রবুহ্যের মাঝে পড়ে পথভ্রান্ত হয়েছিল। কর্মজীবনে একাধিকবার স্থানান্তরণ, কর্মহীন জীবন যাপন, আর্থিক অস্বচ্ছলতা—সবটাই তাঁর একান্ত গোপন দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরার অন্যতম কারণ ছিল। সমকালের বেশির ভাগ স্থবির মানুষের মতোই লাবণ্যদেবীও স্বামীর থেকে স্থূল বস্তুসুখ পেতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দাম্পত্য-কলহ অবশ্যম্ভাবী। ১৯৯৫ সালের পর আবিষ্কৃত জীবনানন্দের ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারি যে বিয়ের মাত্র বছর খানেকের মধ্যে রুগ্ন মঞ্জুশ্রীর জন্ম হওয়াটা স্ত্রীর কাছে একান্তভাবেই ছিল অবাঞ্ছিত। তাছাড়া মা কুসুমকুমারী দেবীর সঙ্গে স্ত্রীর বহুকাল ধরে বনিবনা না হওয়ায়, সব মিলিয়ে কবির ব্যক্তি-জীবন ছিল চরম বিশৃঙ্খলার। জীবনানন্দের এই শ্বাসরুদ্ধকর দাম্পত্য সমস্যার আন্দাজ পাই 'মাল্যবান' উপনাসে। তাছাড়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 'পূর্বাশা'র সম্পাদক স্মৃতিকথায় আমাদের জানিয়েছেন ঃ 'আমি জীবনানন্দের পারিবারিক অনেক ঘটনাই জানি। যা খুব একটা সুখের ছিল না। ওর বউর সাথে প্রতিদিন একটা দ্বন্দ্ব—আমাকে বলতো। জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিল।[৪] এই মুক্তি কামনাই' কি জীবনানন্দের স্বেচ্ছামৃত্যুর কারণ?

এই পর্যন্ত জীবনানন্দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কোন পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছিলেন তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কিন্তু কেন একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি কাব্যের বেলাভূমি ছেড়ে গল্পের মালভূমিতে পা বাড়িয়েছিলেন তা এখনো পরিষ্কার হয়নি।

অনেকের সঙ্গে কবি পত্নী লাবণ্য দাশ মনে করেছিলেন যে কবি একটি মাত্র কারণে গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন, সেটি এই রকম ঃ 'রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হয়ে কবিতায় তাঁর যা অন্বেষণ, তাতে নাম করা সহজ সাধ্য নয়। তখনই তাঁর মন গল্প লেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু বলতে শুনেছি, কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, তবে এগুলো সকলের দৃষ্টি পথের আড়ালেই বোধ হয় থেকে যাবে।'[৫] কিন্তু এমন একটা সরলীকৃত ব্যাখ্যা জীবনানন্দের গল্প লেখার কারণ হিসাবে মেনে নিতে আমাদের মন সায় দেয় না। যদি কবি পত্নীর এ-ধারণা সত্যি হত তাহলে গল্পগুলির প্রকাশের জন্য কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল কেন? কেন মাল্যবাণের মতো এমন একটা ভালো উপন্যাস প্রকাশের অনুমতি দিতে লাবণ্যদেবী স্বামীর মৃত্যুর পরে দীর্ঘ বিশ বছর লাগিয়ে ছিলেন? বস্তুত জীবনানন্দের লেখার ব্যাপারে এমন একটা সরলীকরণ, চিন্তার গভীরতাকে স্পর্শ করে না।

জীবনানন্দের কবিতার আত্মা ও শরীর কি পরিমাণ শক্ত সামর্থ তা প্রথিতযশা সমালোচকেরা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথা সত্যি যে, কাব্য জগতের নিজস্ব একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কবিতা স্বভাবগুণে চপলা ও লাস্যময়ী; সুতরাং কবিতাকে দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবের কারবার চললেও মোটা দাগের ভাবগুলি কাব্যের সীমানায় আটকায় না। তাছাড়া কবিতা পাঠকের সংখ্যাও হাতে গোনা; অর্থাৎ কবিতার 'বাজারদর' গল্প পাঠকের তুলনায় অতি সামান্য। এদেশে কবিতা লিখিয়েদের আর্থিক অসঙ্গতি তাঁদের জীবনের প্রতিরূপ; জীবনানন্দ এঁদের ব্যতিক্রমী নন। তাহলে কি সমকালের প্রকাশন জগতের গল্প-উপন্যাসের ব্যাপক চাহিদা তাঁকে গল্প লিখতে প্রেরিত করেছিল; তা যদি হয় সঙ্গতভাবে প্রশ্ন জাগে লেখাগুলো ছাপার ব্যবস্থা করলেন না কেন? সুতরাং এও বাহ্য।

সত্যি বলতে কি, কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতার চৌহদ্দিতে নারী-প্রেম-মৃত্যু সম্পর্কে যে গভীর জিজ্ঞাসা পাঠকের সামনে রেখেছিলেন, তা বুঝে ওঠার ক্ষমতা অন্তত সেকালের বাঙালি পাঠকের ছিল না। তাই নিজের সেই আত্মজিজ্ঞাসা ও মানসিকতাকে আরো বেশি স্পষ্ট, আরো বেশি স্বচ্ছতা দিতেই সমকালের পটভূমিতে নতুনতর নায়কের জন্ম দিলেন গল্পের আঙিনায়। গল্পের প্রায় প্রতিটি নায়কই জীবনানন্দের 'আইডিয়া'র পরিবাহী। ফলে জীবনানন্দের গল্পের গল্পত্ব গেল উড়ে; চরিত্রের মধ্যে জেগে উঠল 'ফোর্থ ডাইমেনশন'। একটি 'বহুস্বরিক' (poly phonic) চেহারা। তিরিশের যুগে এমন অভিনব গল্প-ভাবনা সমকালের পাঠক হজম করবেন এমনতর আশা দুরাশারই নামান্তর। সুতরাং গল্পগুলোকে সমাধি দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না জীবনানন্দের।

বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশক কল্লোলীয়দের রবীন্দ্র বিরোধিতায় মুখরিত ছিল। এতে বাংলা সাহিত্যে যৎসামান্য ক্ষতি হলেও লাভের অঙ্ক নেহাতই কম নয়। সেই লাভের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিদেশী সাহিত্যের ঠাটভাব অবাধে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিদেশী সাহিত্যের একনিষ্ঠ পড়ুয়া জীবনানন্দ দাশ নিতান্তই সমকালের বাংলা সাহিত্যের সীমানায় বাঁধা পড়েছিলেন—একথা স্বীকার করতে মন চায় না। ১৯৪৬ সালে জীবনানন্দ তাঁর একনিষ্ঠ কবিতা ভক্ত প্রভাকর সেনকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন ঃ 'আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্য প্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তর কালের ভালো সাহিত্য রসিক হয়েই মুক্তি লাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস-স্বদেশী ও বিদেশী নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার সখ ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।'[৬] সুতরাং 'নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবার সাধ'ই কবি জীবনানন্দকে কথাসাহিত্য রচনায় বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছিল; নিছক কোন বাণিজ্যিক সাফল্য কিংবা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে আসন পাওয়ার তাগিদে

তো নয়'ই। উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'ক্যাম্পে', 'শিকার', 'বলিল অশ্বত্থ সেই', 'আটবছর আগের একদিন', কবিতার কথা স্মরণ করতে পারি, সেখানে কবিতার মধ্যে তিনি ছোটগল্পের স্বাদ ও সামর্থ প্রমাণ করেছেন।

দু'টো বিষয়ে জীবনানন্দ সমকালিকদের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; প্রেম ও মৃত্যুভাবনায়। জীবনানন্দের কবিতায় এ দু'টো বিষয় বারে বারে ফিরে এসেছে। হয়তো কবি জীবনানন্দের মনে হয়েছিল এসম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট রূপ পায়নি। সুতরাং গল্পের মাধ্যমে তো আলোকিত করতে হবে নিজেকেই। নারীর দেহজ প্রেমেরচৌহদ্দিতে জীবনানন্দের প্রেমভাবনা যে বন্দী নয়, তা আমরা 'আটবছর আগের একদিন' নেতিবাচক উক্তিতে বুঝে যাই। কিন্তু কবির চোখে প্রেমের স্বরূপটা ঠিক কি রকম—তা বোঝা যায়নি। জীবনানন্দের প্রেমের স্পষ্ট চিন্তার পরিবাহী তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসগুলি 'নিরুপম যাত্রা' উপন্যাসের এক জায়গায় নায়ক প্রভাত বলেছে ঃ 'প্রেম বলতে তোমরা নরনারীর নানা রকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি—স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধই শুধু নয়, দেশের মাঠ, পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশ্বত্থ গাছটা, খোকা বা কেতু।' প্রেমের এমন সার্বজনীন বিস্তার জীবনানন্দের আগে দেখা গেছে বলে মনে পড়ছে না।

জীবনানন্দ প্রেম নিয়ে এমন একটা আদর্শায়িত তত্ত্ব খাড়া করছেন অথচ নারী প্রণয়ের প্রসঙ্গ সেখানে অনেকটাই গৌণ। এর কারণ কবির একান্তই ব্যক্তিগত। পূর্বেই জেনেছি, নারী প্রেমের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে পুঞ্জিভূত হয়েছিল স্ত্রী লাবণ্যদেবীর সূত্রে। বস্তুত প্রেম সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ আদর্শ ধারণা ও তার বাস্তবিক রূপের সম্পর্ক নিতান্তই বিপ্রতীপ। তাই প্রেমের 'আইডিয়া' ও তার 'রিয়ালিটি'র মিলন সম্ভব নয় কোন কালেই। জীবনানন্দের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আদর্শায়িত প্রেমের জন্য কবি চিরটাকাল শঙ্খমালা, সুস্মিতা, শচী, উৎপলা, রেবা—এদের প্রত্যেকের কাছে ছুটে গেছেন, কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন শরীরী স্বাদ, কামনা গন্ধ; মানসিক শান্তি নয়। তাই কবির কাছে নারীপ্রেম ঃ 'তবু এই ভালবাসা ধূলো আর কাদা।' (বোধ/ধূসর পাণ্ডুলিপি)। তাছাড়া জীবনানন্দের কাছে নারী প্রেমের আকস্মিক স্থায়ী পরিবর্তনও ছিল তাঁর মহাজিজ্ঞাসার বিষয়। এই পরিবর্তন কাব্যের চেয়ে গল্পের এলাকায় অনেক বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র (রচনাকাল-১৯৩৬) নায়ক সোমেনের ও এমনতর অনুভব ঃ 'মেয়েরা যখন পরিবর্তিত হয়, কেউ তাদের নাগাল পায়না। আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি—অত্যন্ত স্থায়ীভাবে, তুমি ট্রিপের ফুর্তির জন্যে শুধু'।[৭] সুতরাং নারীপ্রেমের চেয়ে দেশের মাঠ, পথ, অশ্বস্থ গাছ, ছেলেবেলার ইস্কুল, কেতুকে (একটি নেড়ি কুকুর) ভালোবাসা অনেক বেশি সহজ ও সাবলীল বলে মনে করেছেন, স্বয়ং কবি ও তাঁর পুরুষ চরিত্রেরা।

ব্যক্তি-মনের চরম সংকট আধুনিক জটিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের সার্থক নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে; তাই তাঁর নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মনে হয়েছে ঃ 'অনন্ত জনস্রোত মধ্যে আমি একা।' অথবা 'রজনী'র অমরনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' কিন্তু এই জীবন জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-বীক্ষায় পরিণতি পায়নি। ফলে কমলাকান্ত বা অমরনাথ কেউই আত্মহননের পথে পা বাড়ায়নি। কিন্তু তারা তো উনিশ শতকীয় নায়ক; বিশ শতকে, বিশেষত যুদ্ধোত্তর কালে তা আর সহজ নয়। পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি থেকে নিজেদের রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। তাই জীবনানন্দের গল্পের নায়কের একান্ত ইচ্ছা ঃ 'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।....চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।'[৮] ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে গল্পকথকের এই ইচ্ছা যেন গল্প স্রষ্টা তাঁর জীবন দিয়ে সত্যি করে তুলেছে। কারণ গল্পের মতোই এমন একটা শরতের স্বর্ণালি বিকেলে কলকাতার ফুটপাতে বেড়াতে এসেই ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দের প্রাণহানি ঘটেছিল। একে দুর্ঘটনা বলে স্বীকার করেননি কবি বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তাঁর একান্ত ধারণা ঃ 'আমার মনে হয়

জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যান নি। যদিও এই কথাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'[৯] কবির আত্মহত্যা করাটা মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকে না; কারণ তার সৃষ্টি সমগ্রের আষ্টে-পিষ্ঠে মৃত্যুর গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে, সেই সঙ্গে মৃত্যু কামনাও। প্রাসঙ্গিক দু' একটা লাইনের মায়া ছাড়তে পারলাম না—'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে/আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি, /অন্ধকারে স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।' (অন্ধকার/বনলতা সেন)। তাঁর এই একান্ত চাওয়া পরবর্তীকালে ফলপ্রসূ হয়েছে।

গল্প-উপন্যাস লেখা নিয়ে জীবনানন্দের নিজস্ব একটা মৌল ধারণা আছে; এর স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যার তাঁর 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' (রচনাকাল ১৯৩৬) গল্পে। যেখানে গল্পের নায়ক বলেছেন ঃ 'উপন্যাস, জীবনের কেন্দ্র থেকে যেসব উপন্যাসের জন্ম হয়, সে সব ভালো লাগে না আজকাল আর। বরং জীবনের কিনারা ঘেঁষে মৃত্যুর অশরীরে অস্পষ্ট গন্ধের ভিতর যে সমস্ত গল্পের জন্ম হয়, সেগুলি নেড়ে চেড়ে হেমন্তের সন্ধ্যা ও রাত্তির রেশ কেটে যায় আমার।' প্রতিদিন বাংলা গল্প নির্মাতারা জীবনের কেন্দ্রে পৌঁছানোর, তার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টায় কলম চালিয়েছেন; তা আজও সমানতালে চলছে। অথচ জীবনানন্দ 'জীবনের কিনারা ঘেঁষে' যাওয়ার জন্য গল্প লেখেন। বাংলা সাহিত্যে এমন সৃষ্টি ছাড়াদের সংখ্যা নেহাতই কম। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের এই বিশেষ দিক্‌টি অনুভব করেছেন বিশিষ্ট জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ'ও। তিনি মনে করেন ঃ 'তাঁর (জীবনানন্দের) গল্পে—উপন্যাসে যে সেই সার্বজনীন 'আমি' ঘুরে ফিরে আসতে থাকবে, তা তিনি শুরুতেই বুঝে নিয়েছিলেন। বিষয় কেন্দ্রিক অনুধাবনে কোন অনিশ্চয়তার স্থান নেই, সবই অঙ্ক কষে ভাগফল মিলিয়ে তৈরি করে দিতে হয়—এই সুডৌল নিপুণ পন্থায় আমাদের বেশিরভাগ প্রধান লেখক গভীরভাবে আস্থাবান, সেই জন্যে তাঁদের গল্প-উপন্যাসে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর, সুচারু-নিটোল সুনির্দিষ্ট গল্প থাকে, পাঠক-পাঠিকারা কেঁদে হেসে আকুল হন, লেখককে ও গল্পটিকে ভালোবাসেন, বিশেষত এই কারণে যে, এইরকম স্বপ্নমদাক্রন্ত সুদূর জীবনতো পাঠক-পাঠিকা বা তাঁর লেখক যাপন করতে চাননি বা পারেননি। জীবনানন্দের গল্পে এইসব জিনিস নেই; নেই বলে পাঠকদের এবং সমালোচকদের কাউকেই তিনি সুখী করতে পারছেন না।'[১০]

পূর্বেই জেনেছি, সাহিত্যচর্চাকে কোনদিন জীবনানন্দ পেট-খোরাকির পর্যায়ে নামিয়ে আনেননি; তা যদি হত, তাহলে লিখিত কবিতা ছাপাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার পরেও তা সংশোধন করতে যেতেন না। এমনকি গল্পখোর বাঙালি পাঠকদের সুখ চেয়ে তাদের 'সুখী' করার ব্যবস্থা নিতেন। সুতরাং জীবনানন্দের গল্প পাঠের সময় পাঠকের একটি ভিন্নতর অভিনিবেশ সর্বদাই দাবি রাখে।

।। দুই ।।

কবি জীবনানন্দের মৃত্যুর পরেই গল্পকার জীবনানন্দ বেঁচে ওঠেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই নতুন রূপের পরিচয় ঘটেছিল ত্রিমাসিক 'অনুক্ত' পত্রিকার সৌজন্যে। পত্রিকা সম্পাদক সুনীল কুমার নন্দী'র উৎসাহে ও সহকারী সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহের অক্লান্ত পরিশ্রমে তালাবন্দী ট্রাঙ্কের মধ্যে থেকে 'গ্রাম ও শহরের গল্প' শাপমুক্ত হয়ে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি-১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ) মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। পরবর্তী দুটি সংখ্যায় জীবনানন্দের লেখা আরো দুটি গল্প প্রকাশিত হয়; গল্প দুটি হল 'ছায়ানট' ও 'বিলাস'। পরবর্তীকালে গল্প তিনটি সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফীর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' এই নামে 'ভাবনা প্রকাশন' থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনানন্দের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যাও বেড়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যাও বেড়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গল্পসংখ্যা প্রায় একশোর কাছাকাছি (৯৩টি)।

জীবনানন্দ দাশ কবিতা ছাড়া আর কোন গদ্য রচনা, বিশেষত গল্প-উপন্যাস যে লিখতে পারেন তা কেউ কল্পনা করতে পারেননি; একমাত্র কবির একনিষ্ঠ কবিতা পাঠক প্রভাকর সেন ছাড়া। এই প্রভাকর সেন ছিলেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্তই অল্পবয়সী অর্থনীতির ছাত্র। শুধু গদ্য লেখা নয়, তাঁর লেখা গল্পের সংখ্যাটার (৯৩টি) দিকে তাকালে তিনি যেকোন প্রতিষ্ঠিত গল্পকারের পাশে অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারেন; উপন্যাসের সংখ্যাটা (১৩টি) ছেড়ে দেওয়া যায়। এই বিশাল সংখ্যক গল্প-উপন্যাসের মধ্যে 'বিলাস' গল্পটি (রচনাকাল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) আমাদের আলোচনার বিষয়। এই বৃহদসংখ্যক গল্পের মধ্যে কটি মাত্র বেছে দেওয়া নিতান্তই হাস্যকর মনে হলেও প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভব হল না; সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। 'বিলাস' গল্পটিতে জীবনানন্দের মৌলিক চিন্তাভাবনার অনেকগুলো দিক খুঁজে পাওয়া সম্ভব —নারী প্রেম, জীবন-মৃত্যু, সময় ও সমাজ ভাবনা তার মধ্যে অন্যতম।

জীবনানন্দের গল্পে জমজমাট কোন 'প্লট' খুঁজতে যাওয়া বৃথা; কেবল একটি 'আইডিয়া'কে ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি পাওয়া যায় না। 'বিলাস' গল্পটি এই ধারার ব্যতিক্রমী নয়। যুদ্ধোত্তর কলকাতায় (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ) আমেরিকানদের পরিচালিত ইংরেজি কাগজের একটি অফিসে বিপত্নীক প্রৌঢ় শান্তিশেখর মাসিক দু'শো টাকার চাকুরে। শখ বই কেনা; কাজের চাপে অধিকাংশই অপঠিত। মালার্মে থেকে 'ড্যাস্ ক্যাপিটাল' সবটাই তাঁর সংগ্রহে, কিন্তু ছুঁয়ে দেখেনি সে। সুতরাং শীতের এক গভীর রাতে স্কুলের মৃত হেডমাষ্টার অপরেশবাবু স্বপ্নে দেখা দিয়ে শান্তিশেখরকে বলে যায়—'কেমন উদ্বায়ী তোমার আত্মা..... নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন তবে বিলাসী।'

শর্তাধীন নয় তবুও আজকাল তাকে অনেক লেখার প্রুফ্ দেখতে হয়। অথচ অফিসের নির্দিষ্ট প্রুফ্ রিডার সুস্মিতা চক্রবর্তী বড়বাবু সর্বেন ঘোষের প্রিয় পাত্রী হওয়ায় সে এসব থেকে মুক্ত; বড় বাবুর মোটরে ঘুরে বেড়ানো জায়গাও করে নিয়েছে সে। মাঝে-সাঝে সে শান্তিশেখরের রুমে আসে সময় কাটানোর জন্য; ভালোবাসতে নয়। বড়বাবু সর্বেন ঘোষ শান্তিশেখরের স্কুলের হেডমাষ্টার অপরেশ বাবুর'ই ভাইপো। তিনি সর্বেনকে একদিন বলেছিলেন ঃ 'তুমি সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে হবে কী, তোমার মনে কোন বিলাস নেই'।

একদিন শীতের গভীর রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে বিছানার ওপরেই প্রকৃত কোন কারণ ছাড়াই শান্তিশেখরের মৃত্যু হয়। দিন-তিন-চার পর অফিসের বড়বাবু সর্বেন ঘোষ ও সুস্মিতারা অফিস ছুটি দেবে কিনা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে মোটর নিয়ে রাস্তায় পা বাড়ায় ধূলো উড়িয়ে, দু' একটা 'হাঁস তাড়িয়ে—কুকুরের বাচ্চাকে চেপ্টে দিয়ে' অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই তো গল্পের কাহিনী; এর জন্যে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ পৃষ্ঠা খরচ করা অনর্থক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পের উদ্দেশ্য ও 'আইডিয়া'র ইঙ্গিত প্রথম কয়েকটি বাক্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন অতি আধুনিক শিল্প সচেতন কথাশিল্পী জীবনানন্দ। শুরুর লাইন কয়েকটা এইরকম ঃ 'রোজই-যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে, তা নয়,—সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই। তবুও কলকাতা ছেড়ে কোথায় আর চলে যেতে পারে শান্তিশেখর। যেতে যে ইচ্ছা নেই, তা-ও নয়; কিন্তু ইচ্ছা কার কবে কতদূর পূর্ণ হয়েছে এই পৃথিবীতে?' শান্তিশেখরের এই ব্যক্তিগত 'ইচ্ছা' বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তার আশমান-জমিন ফারাক, বুঝে যাওয়ার পরেও শান্তিশেখরদের ইচ্ছা মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হয়। উত্তরাধুনিক কালে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত মানব-মনের এমন উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বাংলা ছোটগল্পে আজও দুর্লভ। শুধু মানসিকতা নয়, গল্পের এমন একটা অভিনব সূচনার কথা জীবনানন্দের কালে অকল্পনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেকেই জীবনানন্দের কবিতার চেয়ে তাঁর ছোট গল্পের শিল্পমূল্যকে ছোট করে দেখে থাকেন, কিন্তু তিনি যে কতবড় ছোটগল্পকার-তার এই সূচনা অংশেই আন্দাজ করতে পারি। বস্তুত জীবনানন্দের ছোটগল্পগুলি তাঁর কবিতার 'ভাববাহী' বটে, 'ভারবাহী' কখনোই নয়—তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা সংহত শিল্প রূপ।

জীবনানন্দের গল্পের পুরুষ চরিত্রের স্পষ্ট দুটো 'টাইপ' পাওয়া যায়; এক ভাগে রয়েছে যারা 'জীবনের

ব্যবসায়ে জিতবার একটা ফিকিরের সুড়ঙ্গে কাছিমের মতো ফিরতে পারে।'[১১] প্রকাশ, সর্বেন ঘোষ, যুবক ডাক্তার, এবং সমীর-এঁরা প্রত্যেকেই এমন ধারার পুরুষ। তাদের প্রত্যেকেই চায় ঃ 'সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছবে। সকলের আগে সকলেই তাই' (১৯৪৬-৪৭/বেলা অবেলা কালবেলা) অথচ 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া' (অদ্ভুত আঁধার এক/বেলা অবেলা কালবেলা)। অন্য ভাগে রয়েছে মাল্যবান, সুতীর্থ, প্রভাত, সোমেন, শান্তিশেখর ও জীবনানন্দের সেই সার্বজনীন 'আমি' রা—যাঁরা চায় 'জীবন', জীবনের ব্যবসা নয়।

'বিলাস' গল্পের মধ্যে যে 'আয়রনি' রয়েছে তা শান্তিশেখর ও সর্বেন ঘোষ এই দুটি দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করেই প্রতিষ্ঠিত। শান্তিশেখর বস্তু সুখে বদ্ধ জীব নয়; তাই বন্ধুর থেকে উপহার পাওয়া হাত ঘড়িটা হারিয়ে গেলে সে কেনার তাগিদ অনুভব করে না। বরং 'ইদানিং অনেকদিন থেকেই তাকে ঘড়ির অভাব পুষিয়ে নিতে হচ্ছে এর-ওর ঘড়ি দেখে—আকাশে সূর্যের দিকে তাকিয়ে জানালার আলসের আনাচ-কানাচের রোদের গতি লক্ষ্য করে'। শান্তিশেখরের হাত ঘড়ি না থাকলে কি হবে, রোজই তিন-চারটে ইংরেজি-বাংলায় লেখা খবরের কাগজ আসে। ঘরের সর্বত্রই আলমারিতে ঠাসা দেশি-বিদেশী নানা রকমের বই। এর মানে তো ছ'মাস একবছর সারাজীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এ জীবনে তার দু'টো জিনিসের জন্য হতাশা রয়েছে প্রথমতঃ 'অনেক দামি দরকারি বই বুলেটিন কিনে এ ঘরে ফেলে রেখেছে সে; আরও ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে পড়ে রয়েছে—কিন্তু এ সব না পড়েই সরে যেতে হবে তাকে। তাছাড়া নারীকে না ভালোবেসেই চলে যেতে হবে।" শান্তিশেখরের এমনতর আশা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে সত্যিই তার বিলাসী মনের পরিচয়—যা স্বপ্নের মধ্যে আগত স্কুলের হেডমাষ্টার অপরেশ বাবু তাকে জানিয়েছিলেন। এ-এক অন্যতর বিলাস, যাতে অপরেশবাবুর পূর্ণ সমর্থন আছে—'ভুল করছ। বিলাস তো খুব ভালো জিনিস শান্তিশেখর।' সাধারণ অর্থে আমরা বিলাস বলতে যা বুঝি, এ তার ঠিক উল্টোটি। কারণ অপরেশবাবুর মতে বিলাসের সংজ্ঞা হল—'খুব সম্ভব বিষয় আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম্ হয়ে থাকা।' গল্পটির 'আয়রনি' এখানেই নিহিত।

সর্বেন ঘোষ বস্তু বিলাস প্রিয় মানুষ; তাঁর কাছে 'ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম্ হয়ে থাকার চেয়ে 'হাত সাফাইয়ের প্রাঞ্জল অব্যর্থতায়' জীবনটা কাটানো অনেক বেশি প্রয়োজন বলে মনে করে। সর্বেন ঘোষ ষাঁড়ের মতো শরীর' 'ধর্মের ট্যাকের মতো টাকা'র' জোরে 'নিলামের ঘরবাড়ি আসবাব অথবা যা নিলামের নয় সে সব জিনিস' এর মালিক হয়। সুস্মিতা চক্রবর্তী সেই মালিকানার অধীন; যদিও 'সে দেখতে ভালো নয়, তবু সে সাহেবের প্রিয়পাত্রী—না হলেও হিসেবের পাত্রী। ঘোষদের অবিশ্যি সবই চলে— মাথায় ফুলেল তেলের গন্ধ থাকলেই হল।' যুদ্ধের দৌলতে গজিয়ে ওঠা এমন বাঙালি বাবুসাহেবদের সংখ্যা কলকাতায় নেহাত কম ছিল না—সর্বেন ঘোষ তাদেরই একজন।

জীবনানন্দের গল্পের নারীরা প্রায় প্রত্যেকেই 'তওয়ায়েফ' দের (ক্ষণিকের কুশলী রূপজীবী) মতো, সুস্মিতাও সেই মনোভাবের। সর্বেন ঘোষ ব্যস্ত থাকলে সময় কাটাতে মাঝে মাঝে শান্তিশেখরের অফিসে গল্প-গুজব করতে আসে—ভালোবাসতে নয়। তাই শান্তিশেখর নারী প্রেমে ব্যর্থতা অনুভব করার পরেও সুস্মিতাদের জীবন সঙ্গিনী করতে পারে না, 'মুখ চোখের বিপন্নতার রেখার আড়ালে কী চাই শান্তিশেখরের? স্বাচ্ছন্দ্য ও আশ্বাস কে দেবে তাকে? সুস্মিতা নয়। সুস্মিতার মতো মেয়ের সে ভাণ্ডার কোথায়—যার থেকে দান করবে; শুধু দান করাবার হাত থাকলেই তো হল না।' 'গ্রাম ও শহরের গল্প'— এ শচীও ক্ষণিকের জন্য ভর দুপুরে নিজের ঘরে সোফায় বসে নিজেকে সৌমেনের জন্য নিজেকে দান করবার কথা ভেবেছিল, সৌমেন তা অস্বীকার করেছে, শান্তিশেখরও সুস্মিতার আবেদনে সাড়া দেয়নি; কারণ প্রেমের ব্যবসা নয়। প্রকৃত প্রেমের সন্ধানে এরা 'সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে' পাড়ি দেয়, কিন্তু যা পায় তা প্রেম নয় —'দু' দণ্ড শান্তি।'

প্রথম দিকের কবিতায় প্রকৃতি ও মৃত্যু প্রসঙ্গের পৌনঃপুনিক উচ্চারণে অনেকেই জীবনানন্দকে 'নির্জনতম

কবি' বলেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ সময় ও বাস্তব সমাজ সম্পর্কে কতটা উৎসাহী ছিলেন তা তাঁর '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি পাঠ করলে বোঝা যায়। 'বিলাস' গল্পটিও তাঁর এই সময় ও সমাজ সচেতনতার অন্যতম দলিল। কিন্তু এর জন্য জীবনানন্দ বেশি লাইন খরচ করতে রাজি নন। দু'-একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করেই থেমে যান। গল্প থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়া যাক— এক।। 'নিজের ঘড়িনেই। ভালো হাতঘড়ি—অল্প দামে আজ কাল পাওয়া কঠিন' দুই।। 'কোথাও কোন কাজ পাচ্ছি না। কলিকাতায়ও তো থাকতে হবে।' তিন।। 'মন্বন্তর গেল—সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি, ধান আর বীজধানের খুনোখুনি কায়েমি হয়ে উঠল প্রায়—ইংরেজ পাহারা দিচ্ছে।' এটাইতো জাত শিল্পীর পরিচয়। যে সময় ও সমাজ পরিস্থিতি নিয়ে অন্যেরা বড়ো বড়ো গল্প ফাঁদতে পারেন, পাতারপর পাতা বর্ণনায় ভরিয়ে তুলতে পারেন, জীবনানন্দ তার জন্য খরচ করেন মাত্র তিনটি লাইন। কি অসাধারণ পরিমিতি বোধ; যা তাঁর কালে সত্যই বিস্ময়কর।

১৯৭২ সালে ভাবনা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প' সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদক জীবনানন্দের গল্পের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে তাঁর গল্পগুলিকে 'একান্ত কাব্যশরীরী', বলে মন্তব্য করেছিলেন। সম্পাদকের অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো সমর্থনযোগ্য মনে হলেও তাঁর গল্পগুলো নিতান্ত 'কাব্য একথা স্বীকার করা যায়। পূর্বেই জেনেছি যে, জীবনানন্দ দাশ ছিলেন শিল্প'-সচেতন কবি। এই সচেতনতার নিদর্শন আছে তার কাব্য শরীরে। অথচ সেই সচেতন শিল্পী দু'টো ভিন্ন 'আর্টফর্ম' কে এক করে ফেলবেন—একথা বিশ্বাস হয় না। তিনি সমকালের আধুনিক গল্প-উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে ইংরেজিতে দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার কয়েকটা লাইন এইরকম—"The novel or the short story in Bengal today is, by and large, more careful and correct than what their great predecessors often came forward with and are invariably interesting and often highly absorbing these writers, like their English contemporaries, undoubtedly know how to write."[১২]

বলাবাহুল্য সমকালের অন্যান্য লেখকেরা 'কিভাবে লিখতে হয়' তা জানতেন, অথচ নিজে জানতেন না—একথা কি সমর্থনযোগ্য? তাই তিনি গল্প লিখতে বসে 'কাব্য-শরীর' গড়ে তুলবেন বলে মনে হয় না। এই ধারণা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাঁর কবিতার ভাষা আর গল্পের ভাষা নির্মাণের পার্থক্যে। তাঁর কবিতার ভাষা যতটা অনুভূতি নির্ভর, গল্পের ভাষা ততটাই রূঢ় বাস্তবগন্ধী। আলোচ্য গল্পটি থেকে দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, এক ঃ 'আপনাকে ডেকেছি, ডক্টর সেনের কাছে যেতে হবে—ডক্টর টি. বি সেন। টি. বি. মানে—ইয়ে ঐ টিপিক্যাল বাঞ্চোতটা।' দুইঃ 'ও মা, কী যে বলেন আপনি! মোটরের আর খ্যাঁটের ফাউ ফুর্তি ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল হতে পারে না।' তিন ঃ 'জ্যেঠামশাইয়ের মতে বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয় আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা ভোলা জিনিস নিয়ে ভোস্ হয়ে থাকা।' 'মাল্যবান' উপন্যাসের মধ্যেও জীবনানন্দের শব্দ প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে। উপন্যাসের একটি জায়গায় উৎপলা বলেছে 'ওদের (পায়রাগুলোদের) চাল-চিঁড়ে দিই, সব খেতে ভালোবাসে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখি, খায় আর হাগে, হাগে আর খায়, মানুষের ভেতর দু'চার জনকে ছেড়ে দিলে প্রায় মানুষই এদের চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করে।' জীবনানন্দের গদ্যে এরকম অনেক নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়—যা অনুভূতিশীল জীবনানন্দের বলে সন্দেহ হয়। তাই বলা যায় কাব্যশরীর নয়, বরং কাব্যে 'আইডিয়াটাই স্থায়িত্ব পেয়েছে তাঁর গল্পের সীমানায়। আর এই 'আইডিয়ার প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণই চরিত্রগুলির নিয়তি' বলে মনে করেছেন আধুনিক আখ্যানতত্ত্ববিদ বখতিন। আলোচ্য গল্পের শান্তিশেখর, সর্বেন ঘোষ, সুস্মিতা ও অপরেশবাবু—প্রত্যেকেই সেই আইডিয়ার পরিপোষক মাত্র।

'ঝরাপালক' এর কালে (১৯২৮) কবি ঘোষণা করেছেন ঃ 'কেউ যাহা জানে নাই—কোন এক বাণী আমি বহে আনি,'—কবির এই আত্মপ্রত্যয়ে কেবল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন 'বাণী' প্রচারিত হয়েছিল এমন নয়, তাঁর গল্প—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি হয়ে উঠেছে। তাই জীবনানেন্দর কবিতা যেমন অননুকরণীয়, গল্পের ক্ষেত্রেও তাই। তবে পরবর্তী কালের বাংলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, কমল কুমার মজুমদার কিংবা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় জীবনানন্দীয় মানসিকতার সামান্য অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনানন্দের রচনায় এই অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় তাঁর প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধই কাজ করে গেছে; যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ তাঁকে ব্যক্তি-জীবনে বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারে ঠেলে দিলেও বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি পাঠকদের নতুন একটা ভোরের কাঁচা আলোক উপহার দিয়েছে। তাই 'মানব জন্মের ঘরে' মাটি পৃথিবীর টানে না এলে ভালো হতো অনুভব করলেও অমাদের 'গভীরতর লাভ হলো সে সব বুঝেছি।' (সুচেতনা/বনলতা সেন)

তথ্যসূত্র ঃ

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ (সম্পাদনা) ঃ জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ—প্রথম খণ্ড (ভূমিকা অংশ), ১৪১৭, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। চৌধুরী, তুষার ঃ জীবনান্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ—প্রথম খণ্ড (সংযোজন অংশ) ১৪১৭, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

৩। মান্নান, সৈয়দ, আব্দুল ঃ শুদ্ধতম কবি (বিমানচন্দ্র ঘোষ ঃ কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন দর্শন) ১৯৭৭, নলেজহোম, ঢাকা, পৃ-২২৫

৪। মান্নান সৈয়দ, আব্দুল্ল ঃ শুদ্ধতম কবি, ১৯৭৭, নেলজ হোম, ঢাকা, পৃ—২২৩

৫। গুহ, ভূমেন্দ্র ঃ জীবনানন্দ দাশ ঃ প্রথম প্রকাশিত গল্প, (লাবণ্য দাশ ঃ কবির গল্প), ২০১২, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ-২০৪

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেবীপ্রসাদ (সম্পাদনা) ঃ জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র, (১৯৪৬ সালের ২রা জুলাই প্রভাকর সেনকে লেখা জীবনানন্দ দাশের পত্রাংশ) ২০০০, বইপত্র, ঢাকা, পৃ. ২৪৯

৭। গুহ, ভূমেন্দ্র (সম্পাদনা) জীবনানন্দ দাশ ঃ প্রথম প্রকাশিত গল্প, ২০১২, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ-৪২।

৮। 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পে নায়কের উক্তি।

৯। মান্নান সৈয়দ, আব্দুল ঃ শুদ্ধতম কবি, (সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রাংশ) ১৯৯৭, নলেজ হোম, ঢাকা, পৃ.-২২২।

১০। গুহ, ভূমেন্দ্র ঃ জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং; ২০০১, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১১৪

১১। গুহ, ভূমেন্দ্র (সম্পাদনা) ঃ জীবনানন্দ দাশ ঃ প্রথম প্রকাশিত গল্প, ২০১২, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ-৩৩।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ (সম্পাদনা) ঃ জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র, (The Bengli Novel Today) ২০০০, বই পত্র, ঢাকা, পৃ-১০২।

শব্দচয়নে অনন্যতা ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে

ড. প্রকাশ কুমার মাইতি,

মধ্যযুগের গতানুগতিক অনুবৃত্তির শেষে উনিশ শতকে এসে বাংলা কবিতা পেল নবজাগরণের সোনার কাঠির অচিন স্পর্শ। নব উদ্ভাসে বিচ্ছুরিত হল আলো। পুরাতনকে পেছনে ফেলে সৃষ্টি উন্মাদনায় এল নতুন কবিতা। ভাবে-ভাষায় কিংবা গঠনশৈলীতে তৈরী হল নতুন ভাবমণ্ডল। তারপর মধু-হেম-নবীনের মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের পথ অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করলাম গীতিকাব্যের ললিত উদ্যানে। বাংলা কবিতা আবর্তিত হল বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কবির ভাবতন্ময় কাব্যলোকে। তারপর এল রবি কিরণের মণিময় দীপ্তি। কিন্তু তাতেও যেন তৃপ্তি পেল না বাঙালি পাঠকের মন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষায় ভিন্নতর আরো কিছু। সে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এলেন কল্লোলের কবিকুল —ভাষা, ছন্দ কিংবা গঠন কৌশলে তাঁরা আর একবার নতুন হলেন। এ যুগেই আবির্ভাব কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০)।

বাংলা কাব্যকাশে তাঁর প্রথম পদচারণা 'তন্বী' (১৯৩৭) প্রকাশের সূত্রে। প্রারম্ভে তিনি কিছুটা পুরাতনপন্থী ছিলেন। তখনও তেমন করে তৈরী করতে পারেননি নিজস্ব রীতি কিংবা প্রথা-অতিরেক রূপকল্পের সন্ধান। তবে এই সময় পর্বকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাঁর রসদ সংগ্রহের কালরূপে। ফলত পরবর্তী কাব্য 'অর্কেষ্ট্রা'—তে এসে বিদেশি কবিতার অনুসৃতি কিংবা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত নিজস্ব ধরন স্পষ্ট হল।

কাব্যকৌশলে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্বতা বহুধা ব্যাপ্ত। মূলত তাঁর ঝোঁকটা ছিল ঐতিহ্যের নবমূল্যানে—পুরাতনের বৃত্তেই নতুনকে খোঁজা। স্বকীয়তা প্রকাশের মাধ্যমরূপে তিনি সবথেকে বেশি জোর দিলেন বিশেষ শব্দচয়নের ওপর। কেননা শব্দের সুচিন্তিত মজ্জা ও বিন্যাসেই গড়ে উঠবে নতুন কবিতার শরীর—এমনটা ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি বিশেষভাবে আকর্ষিত হলেন পাশ্চাত্যের শব্দবাদী কবি মালার্মের প্রতি।

কবিতার নির্মাণ কলায় শব্দগত মাত্রাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন মালার্মে। কালের ক্ষয়িষ্ণু স্রোতে কবিতাকে জায়গা করে দিতে গেলে শুধু নতুন ভাবের প্রকাশ ঘটালেই চলবে না সে ভাব প্রকাশের ভাষা ও হবে সম্পূর্ণ নতুন। তাতে থাকবে নতুন নতুন শব্দের মণিমুক্তো। মালার্মের মতোই সুধীন্দ্রনাথও মানতেন কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ। এবং তা হবে যথাসম্ভব চেনা শব্দমহলের বাইরে। কারণ তাঁর বিশ্বাস—"শব্দের স্বভাব টাকার মতো; বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে তা স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাসকেসে।" (সূচনা ঃ স্বগত)

শব্দচয়ন বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের এই বিশেষ প্রবণতা তাঁর সমস্ত কাব্যেই স্পষ্ট। বস্তুত, শব্দ নিয়ে তিনি কবিতায় নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। যেমন, মূল ধাতুকে ভেঙে তাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে নতুন নতুন শব্দ গঠনে ব্রতী হলেন। এর ফলে কাব্য শরীরে এল অভিনবত্ব। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, এর ফলে সাধারণ পাঠকের সামনে অনেক সময় তৈরী হয়েছে দুরূহতার পাহাড়, দুর্বোধ্যতার দুর্লঙ্ঘ্যবাধা। যেমন—

> পরিপূর্ণ বর্তমান ঃ নাস্তি শুদ্ধতার অংশভাক্;
> ভূত অধুনার স্মৃতি, উপস্থিত স্বপ্ন ভবিষ্যৎ;
> পরিপ্রেক্ষিতের বশে অনেকান্ত প্রত্যক্ষ জগৎ;
> দেশান্তর ভাবচ্ছবি; ক্রৌঞ্চ, কবি অভিন্ন, বাক।" (ভূমি ঃ দশমী)

অপ্রচলিত শব্দের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। ঝোঁক ছিল সংস্কৃত শব্দ কিংবা নামধাতুর প্রয়োগের দিকেও। ফলত, কষ্টবোধ্য পংক্তি তাঁর বাক্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

> "অথবা পিশাচ শুদ্ধ গৃধ্নু ইতিহাসের ঘাতক;
> এবং সে ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্প স্বরূপ।

ফলত, যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন ঘাতক।" (জাতক (২) ঃ সংবর্ত)

এই জাতীয় শব্দের প্রচুর ব্যবহার তাঁর কাবের যত্রতত্র দৃশ্যমান। এর ফলে কবিতার রসাকাঙ্ক্ষী সাধারণ পাঠক অপরিচয়ের বৃত্তে আবর্তিত হন, আর শব্দগুলো যেন সরাসরি আঘাত করে কানে, বাজে খটাখট স্বরে। অর্থ খুঁজতে গিয়ে পথ হারাতে হয়। কবির সঙ্গে তৈরী হয় দূরত্ব।

শব্দচয়নের এই কাঠিন্যের অন্তরালে অবশ্য অন্য এক সুধীন্দ্রনাথের দেখা মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কবিতায়। যেখানে প্রাত্যহিক কথনরীতির বেশ কাছে পৌঁছে যান তিনি। তখন তাঁর ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ, সরল, সুবোধ্যতায় হৃদয়স্পর্শীও যেমন—

বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার;
অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শব্দ নয় আর।
নদীতেও নানা বাঁক আছে;
সেগুলোর কোনওটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে
এমন লোকেও যারা সাঁতারের সু-টুকু জানে না।" (জেসন ঃ সংবর্ত)

কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে 'ক্রন্দসী' কাব্যের 'বিরাম' কবিতাটির। সেখানেও কাঠিন্যের চিরাচরিত কর্ম ত্যাগ করে খুজে পাওয়া যাবে ভিন্ন সুধীন্দ্রনাথকে। অন্তত সহজ সরল ভাষায় জীবনের চরম সত্যের উন্মোচন ঘটান কবি এইভাবে।—

"সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা।"

সমসাময়িক আর এক অনুজ কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় তৈরী করে নিয়েছিলেন নিজস্ব কাব্যরীতি। তিনিও খুব সহজবোধ্য কবি ছিলেন না। প্রথম থেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র, সম্ভ্রান্ত ও স্বমহিম। তাই রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর প্রথম কাব্য 'উর্বশী' ও অর্টেমিস দু'বার পড়তে হয়েছিল। কেননা, খুব সহজ সঞ্চরণক্ষম নয় তাঁর কাব্য। একটা স্পষ্ট দুরূহতার কর্মে আবৃত ছিল তাঁর কাব্যভাষা।

বিদেশি এবং অপ্রচলিত শব্দের প্রতি বিরাট দুর্বলতা ছিল বিষ্ণু দে-র। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ফলত, পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকাই স্বাভাবিক। আর তার ফলে পাশ্চাত্যের জীবন ও সংস্কৃতির নানান প্রসঙ্গ, স্থান এবং ঘটনা, বিশেষ বিশেষ ভাবানুসঙ্গ অনায়াসে স্থান পেল তাঁর কবিতায়। কবিতার শরীর সজ্জিত হল অভিনব সাজে। এবং একবার মাত্র পড়ে বোঝাবার সীমায় সকল অসীমায়িত। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো পাঠককেও দু'বার পড়তে হয়েছিল তাঁর কোনো কোনো কবিতা। এইরূপ একটি কবিতা হল—

"তোমার পোস্ট কার্ড এলো,
যেন ছড়াটানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণি,
রেডিও ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাটলো
যেন জিলহা বিলম্বিতে।" (টপ্পা-ঠুংরি ষ চোরাবালি)

'পিৎসিকাটো' কিংবা 'জিলহা বিলম্বিতে' শব্দগুলির ঠিক কী অর্থ বা কী অনুসঙ্গ তা বুঝতে সুশিক্ষিত, পরিশীলিত এবং বিশিষ্ট পাঠকেরও ঘর্মাস্রাব ঘটতে পারে। এমন আরো অজস্র কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে যার অর্থ খুঁজতে গেলে প্রচলিত অভিধানও হার মানে। আবার বিদেশি ব্যক্তি ও স্থান নামের প্রচুর ব্যবহার তাঁর

কবিতায় রয়েছে। যেমন,

'মহিমের ক্ষেতে ইয়াংচি বোনে ধান
তুলসী ডাঙ্গায় পিয়োঙ্গিয়াং কাঁদে
রহিমের হাতে স্টালিনো কিংবা গৌর্কির
যন্ত্র সচল ঘর্ঘরে তার অবিসম্বাদী আশী।" (দিনগুলি রাতগুলি : নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

অপ্রচলিত শব্দের বাহুল্যময় আরো দু' একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,

'জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমন;
সোৎপ্রাস পাশে বলি নাকো কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।" (ক্রেসিডা : চোরাবালি)

কিংবা স্মরণ করা যেতে পারে এই পংক্তিগুলিও—

"কাসান্দ্রা ঘুরি অতন্দ্র চোখ পথে পথে বন্ধুর,
ঈনিয়াস্ থাক্ লোভন ভবিষ্যতে!
অজেয় আমার আলুলিত বেণী, যুগান্তে সংগতি।" (কাসান্দ্রা : নাম রেখেছি কোমল বান্ধার)

এই সময়ের বহু কবিই মনে করতেন কবিতার নির্মাণ কলায় শব্দচয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। স্বতন্ত্র শিল্পরীতি আয়ত্ত করতে গেলে শুধু ভাবের অভিনবত্বে আস্থাবান হলে চলে না, কবিতার শরীরে চাই নতুন শব্দের দ্যুতি। তবে "Poetry is written with words and not with ideas" এ কথাটা হয়তো অতিকোটিক। কিন্তু তাই বলে কথাটাকে খুব সহজে পরিত্যাগও করা যায় না। তার প্রমাণ জড়িয়ে রয়েছে বিশ শতকের বহু কবির রচনায়। যেমন পাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র কবিতায়। এই জাতীয় প্রয়োগ হয়তো অনেক সময় তাঁদের কবিতায় দুর্বোধ্যতার একটা আড়াল তৈরী করেছে, কষ্টসাধ্য হয়েছে গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ পাঠকের কবিতার মর্মলোকে প্রবেশ। কিন্তু কাব্যের মান কিংবা কালজয়িতা তো তার পাঠক সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। তাতে চাই জীবন সত্যের সন্ধ্যান-যেমনই হোক আর ভাষা কিংবা প্রযুক্ত শব্দ সম্পদ। তাই শত অভিযোগের পরেও আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন বিশ্ব শতকের নব্যপন্থী কবিতা। হৃদয়ে ভালো লাগার দীপ জ্বেলে জেগে থাকেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা কবি বিষ্ণু দে। কেননা, তাঁদের সৃষ্টি মূর্ত হয় সেই চিরহৃদয় থেকে যে অনায়াসে ব্যক্ত করে এক নরম অথচ উষ্ণ অনুভূতি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষায় রাঙা—

'তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে
জল দাও আমার শিকড়ে।"
(জল দাও : অন্বিষ্ট)

বোধ ও অস্তিত্বের তটরেখায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সোমা মুখার্জী

জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কাব্য জগতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত কবি, যার লেখনির বহুবর্ণচ্ছটায় আমরা আলোকিত ও বিস্মিত হই। তাঁর বোহোমিয়ান জীবন যাপন ও কবিতা সাধনা তাঁকে করে তুলেছে এক কিংবদন্তী চরিত্র। গভীর কথা সহজ করে বলা, বড়ো কঠিন ব্যাপার। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমনই এক সহজ ভাষার কবি, যাঁর রচনার গভীরতা অতলান্ত। সেই অতলান্তিকে অবগাহন করে পাঠক সুস্নাত হয়।

দক্ষিণ-চব্বিশ পরগরার বহড়ুতে দাদামশাই সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে ১৯৩৩ -এর ২৫শে নভেম্বর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা ছিলেন হুগলির খানাকুলের কৃষ্ণনগর গ্রামের 'টুলো পণ্ডিত'। কবির বয়স যখন সাত বছর তখন তিনি মারা যান। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ায় তাঁদের চলে আসতে হয় বহড়ুর 'মৃণালিনী কুটির'-এ। সেখানে কবির কৈশোর কাটে ১৯৪৮-এর আগে পর্যন্ত। বহড়ুর পল্লী প্রকৃতি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। যার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করি তাঁর কবিতার শরীরে। বাবার মৃত্যুও তাঁকে নাড়া দিয়েছিল খুব। তাই তাঁর কবিতায় বারে বারে এসেছে শ্মশান, চিতা, ছাই ও মৃত্যুর চিত্রকল্প। শক্তির প্রথম কবিতা 'যম' (১৩৬২)-এও সেই মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। দাদামশাই-এর মৃত্যুর পর এবং ছেচল্লিশ-এর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় বহড়ুর বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শক্তিকে চলে আসতে হয় কোলকাতার বাগবাজারে ৬০নং গোপীমোহন দত্ত লেনে মামা ভবানী গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে। সেখানেই কবির বেড়ে ওঠা, রাজনীতির পাঠ নেওয়া, লেখালিখির সূত্রপাত তুলনামূলক সাহিত্যে পাঠগ্রহণ, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সৃজনবৃত্তে প্রবেশ, কিংবদন্তী স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন, হাংরি জেনারেশন নামক এক প্রথাবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া, ভালোবাসার মানুষের সাথে ঘর বাঁধা, আনন্দবাজারে যোগদান—এমনই বহু বিচিত্র গ্রন্থিতে গাঁথা তাঁর জীবন। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া বেহিসাবী, খেয়ালি, ভ্রমণ পিপাসু জীবনে শক্তি ছিলেন চির-পথিক। জীবনের অর্গল তিনি ভেঙেছেন খান-খান করে। আর তাঁর বোধ ও অস্তিত্বের তটরেখা থেকে জন্মলাভ করেছে কবিতা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর সমসাময়িক কবি দিব্যেন্দুপালিত ১৯৭৪ সালে 'দৈনিক কবিতা'য় লিখেছিলেন,—

'জীবনানন্দের পর এবং এ পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই সম্ভবত একমাত্র বাঙালি কবি, কবিতাকে যিনি ব্যবহার করেছেন অপরিশীলিত আত্মার অনুকরণে; যাঁরা অধিকাংশ রচনাই অন্ধকার চৈতনের কাব্যরূপ।'

বস্তুত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্য সমগ্র'-এ তাঁর ক্রমপরিণামী কবি ব্যক্তিত্বের গতি প্রকৃতিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, প্রথম কবিতার বই 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ' থেকেই অন্ধকারকে অনুভবের একটা তাগিদ ছিল,—

'অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, অন্ধকার হবো।'

(জরাসন্ধ)

আসলে জীবনকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে হলে তাকে বারে বারে বিপরীত প্রেক্ষিত থেকে দেখা প্রয়োজন অন্ধকারকে দিয়েই আলোর মূল্য নির্ণয় করা যায়। তাই শক্তির তির্যক বাচনভঙ্গিতেই ভেসে ওঠে জীবনের আলো,—

'আমি ফিরবো অন্ধকারে, তুমি জ্বালবে আলো'

(সুখস্মৃতি)

পঞ্চাশের দশকের এই কিংবদন্তী কবির অন্তঃস্থল ও সৃজনভূমির অন্তর্বয়নের চিত্রটি অনুধাবন করতে হলে তিরিশ ও চল্লিশের কবিদের কবিতার ভাঙা-গড়ার গতিপ্রকৃতিও একটু ফিরে দেখা প্রয়োজন। কারণ পঞ্চাশের কবিরা বেড়ে উঠেছিলেন চল্লিশেই।

তিরিশের কবিরা বুঝেছিলেন, রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হতে হলে ইউরোপের প্রভাবকে আত্মীয়করণ করতে

হবে। বিশ্বভাবনার সাথে যুক্ত হতে হবে। তাই তিরিশের কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে'র কবিতায় সচেতন ও মননী বৈদগ্ধ্যের পরিমার্জনা দেখা গেল।

চল্লিশের দশকে দেখা গেল কখনো ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য, আবার কখনো বা সমাজ বাস্তবতার ছায়া। চল্লিশের কবিরা জন্ম নিয়েছিলেন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে। স্বাধীনতা তখনও অনায়ত্ত। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তরের করাল ছায়া চতুর্দিকে প্রসারিত। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসুর কবিতা হয়ে উঠেছিল সমাজ দর্পণ।

পঞ্চাশের উদ্বাস্তু, উৎখাত, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারিতে ব্যপ্ত স্বাধীন ভারতের আকাশ। কিন্তু অবক্ষয়িত সমাজের কাঠামোয় তখন লেগেছে ঘুণ। ভেতরে ভেতরে বেড়ে উঠেছে ক্ষয়। এই যন্ত্রাণাময় বেড়ে ওঠা সহজেই পঞ্চাশের কবিদের মননে নেতিবাচক মনোভাব সঞ্চারিত করেছিল। পঞ্চাশের কবিরা অনর্গল ভাঙতে চাইলেন। তারা রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাসবোধ সবকিছুকে অতিক্রম করে শুধুমাত্র নিজেকেই প্রকাশ করতে শুরু করল। কাব্যভাষায় বদল ঘটল, বদলে গেল জীবনদৃষ্টিও বেড়া ভাঙার খেলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু শক্তির মতো এমন অলজ্জ আত্মবীক্ষণ আর কারুর কবিতাই হয়ে ওঠেনি। প্রায় ২২৩৬ টি প্রকাশিত কবিতা তাঁর। অনেক অপ্রকাশিতও রয়ে গেছে। কবিতাগুলি একটির সাথে আর একটি যেন অনিবার্যসূত্রে গ্রথিত। একটি লেখার পর আর একটিতে পৌঁছে পূর্বের না বলা কথাটি গাঢ় স্বরে বলতে চাওয়ার প্রয়াসইতো দ্বিতীয় কবিতার জন্মের উৎস। এইভাবে ধাপে ধাপে লেখা হতে থাকে এক দীর্ঘ কবিতা। আর ওই সব মুহূর্তগুলোর সম্মেলনেই ধরা দেয় এক ব্যতিক্রমী জীবন।

কবিশক্তি—মানুষ শক্তি, হৃদয়বান শক্তিকে আমরা যেভাবে জেনেছি তার কাহিনি সুদীর্ঘ। তার বিস্তৃত কাহিনি একটি ক্ষুদ্র ফ্রেমে বন্দী করার চেষ্টা বৃথা। তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, বিশেষ করে সমস্ত রকম দৈনন্দিন জীবনের ওপরে নিজেকে নিয়ে গিয়ে সকলকে ভালোবাসতে পারার ব্যতিক্রমী মন ছিল তার।

শক্তির সম্পর্কে না চলে কোনও পূর্বাভাষ, না চলে পরিমাপ। 'বোহোমিয়ান' বলে খ্যাতি আছে তার। খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে নিস্পৃহতার এক অন্যতর মাত্রা যেন সংযোজিত হয়েছে। কবি কতটা সত্যবাদী ও সাহসী হলে লিখতে পারেন,— 'আমি স্বেচ্ছাচারী',—তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। তার এই স্বেচ্ছাচারিতায় একদিকে আনন্দবাজার, অন্যদিকে লালবাজার এই দুয়েরই প্রচুর প্রশ্রয় ছিল। এমনকি শক্তির কবিতার বই ছাপাতে কখনও কখনও প্রকাশকেরাও হয়েছেন নীলকণ্ঠ।

'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' শক্তির কবিতায় আপাত সরল শব্দাবলীর মধ্যে অব্যর্থ প্রতীকে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে আজকের জীবনের দুর্মোচনীয় সঙ্কট। অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত বাঙালি মনের অতলান্তিকে তাঁর কবিতার কল্পরাজ্য। তাই তার কবিতায় দেখি উদ্বিগ্ন অশান্ত অস্থির যন্ত্রণাক্লিষ্ট আধুনিক মানুষ অবনীকে। 'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া'—অর্থাৎ মানুষের চৈতন্য আজ বদ্ধ। মুক্ত চৈতন্যের ডাক হল এই 'রাতের কড়ানাড়া'। কবির মনে হয় জগৎ, জীবন, অসুস্থতা থেকে 'ঘুরে দাঁড়ানই ভালো।' কারণ,—

'এতো কালো মেখেছি দুহাতে
এতকাল ধরে।
(যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?)

রাত্রে খাদের পাশে দাঁড়িয়ে কবি শুনতে পান চাঁদের আহ্বান। আর গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁড়ালে চিতা- কাঠ ডাকে। জীবন ও মৃত্যুর এমন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবির মনে হয়,—

'যেতে পারি
যে-কোনও দিকেই চলে যেতে পারি।'
(যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?)

কিন্তু যাওয়ার অধিকার থাকলেও কেন যাবেন? বরং 'সন্তানের মুখ ধরে' একটি চুমো খাবেন। আসলে

জীবনকে ভালোবেসে, জীবনেই সম্পৃক্ত হতে চেয়েছেন শক্তি।

'ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের'

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

—এ স্বগতোক্তি কবি শক্তির। ভালোবাসতেন পুড়তে, অন্যকেও পোড়াতেন আমূল। অথচ তাঁর কাছে এই পোড়ার দহন ছিল না। নিজের মতো করে বলবার এক অনতিক্রম্য স্বাতন্ত্র্য রয়েছে শক্তির প্রেমের কবিতায়। বিমূর্ততায় আচ্ছন্ন তার কবিতার শরীর। কখনো তা স্মৃতি বিধূর। কখনোই যৌনতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ নয়। বরং,—

'ভালোবাসা তার কাছে শিকড়ের মতো মাটিমাখা'

(ভালোবাসা, তার কাছে)

তাই 'শুধু ভালোবাসায় ভর করে' তিনি রাস্তায় হাঁটেন। শৈশবের পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণা শক্তিকে বিষাদগ্রস্ত করলেও তাঁর শেষ পর্বের কবিতাগুলোতেই মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে বারংবার। কখনো ভাসমান নৌকার রূপকে তাকে এক কূল থেকে অন্য কূলে ভেসে যেতে দেখি, কখনো লেখেন,—

'রাজ দুপুরে শ্মশানচিতা আমাকে দাও কোল
বলতে-বলতে টলমলিয়ে লোকটা ঢুকে পড়ল।'

(আমাকে দাও কোল)

কিংবা,

'মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি-মৃত্যু থেকে পার নেই',

(একদা এবং আমি)

মৃত্যুর অনিবার্যতাকে এভাবেই মেনে নিয়েছিলেন কবি। তাই জীবনকে ভালোবেসেছিলেন তিনি গভীর ভাবে। আর এভাবেই তিনি চলে যেতে চেয়েছেন এক জীবন থেকে আর এক বৃহত্তর জীবনে। শুধু ভালোবাসার জন্য এই লণ্ডভণ্ড করা। শক্তির জীবন নির্যাসের এই দুঃখানুভূতিই তাঁর কবিতাকে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মন্ত্র করে তোলে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একাকিত্বের কথা আছে, কিন্তু তাঁর নিঃসঙ্গতা ফলবান ও ইতিবাচক। জীবনের অতি বিতৃষ্ণা, ক্লান্তি তাঁর কবিতায় নেই,—

'উদাসীনতার মতো ব্যাধি আর পৃথিবীতে নেই।...
আজ উদাসীন নই, ব্যাধিমুক্ত, দুহাতে পেয়েছি
সংসারের অম্লতিক্ত কষায় রসের পূর্ণ বাটি।'

শক্তির কবিতায় পাই জীবনের প্রতি ভালোবাসা, আনন্দ, শ্রদ্ধা। নিসর্গে-সমর্পিত জীবনযাপনের টুকরো টুকরো ছবিতে ধরা দিয়েছে মনস্তাপ ও মমতা। তিনি বৃষ্টির কথা বারে বারে লেখেন,—

'অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।'

(যখন বৃষ্টি নামলো)

—বৃষ্টি মালিন্য মুছে সব কিছু প্রক্ষালিত করে দেয় যেন। কবি বলেন 'প্রকৃতির কাছে যোয়ো'। আবার আস্তিক্য বোধেই তাঁর কবিতায় আসে এক ঈশ্বরের কথা যা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি,—

'আমার ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন সবার উঠোনে।'

(কার জন্যে এসেছেন?)

আসলে 'মৃত্যুর চেতনা আর কবিতার বিশেষত্ব হতে পারে, মৃত্যু বাসনা তার কখনও ছিল না। শক্তি মূলতঃ প্রকৃতি প্রেমের কবি।'—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

'ঈশ্বরের এক মুহূর্ত' নামক প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন,— 'হঠাৎ একসময়ে কলম নিয়ে বসলেই স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে তাঁর (শক্তির) অবচেতন রচনা'।

('শব্দ আর সত্য' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত, সংকরণ ১৯৮২ পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯)

এভাবেই স্বেচ্ছাচারী কবির হৃদয়পুরের অতৃপ্তি, বেদনা নিষ্কাষিত হয়েছে। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, শব্দবিন্যাস, শব্দনির্মাণ, চিত্রকল্প সৃষ্টি, ছন্দ প্রয়োগ, ভাঙচুর, আপাত অগোছালো স্বভাব বৈচিত্র্য, সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সম্মিলিত প্রয়াসেই শক্তির শব্দস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

'বাংলা পদ্যের বাগানে এই আমি ঝাণ্ডা পুঁতে দিলুম, কেউ নড়াতে পারবে না।'

—কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তীর 'ধুলো খাই যদি প্রেম পাই' কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধনে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই আত্মবিশ্বাসী উক্তি আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায়। বস্তুত আধুনিক বাংলা কবিতাকে সহজবোধ্য করে, জনমুখী করে তোলার ব্যাপারে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। উচ্ছৃঙ্খল স্বল্প পরিসর জীবনের মধ্যেও দুর্দান্ত কবিতা লিখে গিয়েছেন তিনি। ছন্দের আশ্চর্য কুশলতায় তিনি পাঠককে এক পংক্তি থেকে আর এক পংক্তিতে স্বচ্ছন্দেই নিয়ে যান। এবং পরিশেষে আমরা উন্নীত হই এমন এক অনাস্বাদিত পূর্ব পৃথিবীতে, যা অভিনব।

গ্রন্থসূত্র ঃ

১। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—আধুনিক কবিতার ইতিহাস (দে'জ পাবলিশিং)

২। অহনা বিশ্বাস—শক্তির পদ্য, পদ্যের শক্তি প্রসঙ্গঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৩। অশোক কুমার মিশ্র—আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮) (দে'জ পাবলিশিং)

৪। অশ্রুকুমার সিকদার—হাজার বছরের বাংলা কবিতা (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা কবিতার কালান্তর (দে'জ পাবলিশিং)

৬। সমরজিৎ ও ইনা সেনগুপ্ত—শক্তির কাছাকাছি (দে'জ পাবলিশিং)

৭। শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর পদ্য সমগ্র (১ম-৭ম খণ্ড)

৮। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়—মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (রত্নাবলী)

৯। পত্রিকা— সাহিত্য সেতু (শক্তিচট্টোপাধ্যায় সংখ্যা) ২৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ৩১ শে অষাঢ় ১৪০২ ১৬ই জুলাই ১৯৯৫।

আল মাহমুদের 'নীল নাকফুল' ঃ সিঃসঙ্গ প্রেমের অনুরণন

নাসিরউদ্দিন পুরকাইত

বাঙালি পাঠককুলের কাছে কবি আল মাহমুদ পরিচিত নাম। কবিতার জগতে তাঁর পদার্পণ পঞ্চাশের দশক থেকে। তাঁর মনে একসময় বাসা বাঁধে গল্পলেখার বাসনা। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর গল্প প্রকাশ পাঠক সমাজকে একেবারে চমকে দেয়। বাংলা কাব্য ধারায় তাঁর কবিতা যেমন একটা নিজস্ব জগৎ তৈরী করেছিল তেমনি কথাসাহিত্যের আকাশে তাঁর ছোটগল্পগুলি এক একটি নক্ষত্র রূপে বিরাজমান। আল মাহমুদ স্বপ্নহীন সময়ের কথাসাহিত্যিক। দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলি। সেকারণে এই দাঙ্গা-দেশভাগ—ভাষা আন্দোলন-মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আর্ত সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপট তাঁর কথা সাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর গল্পগুলিতে কেবল ভাষার প্রতাপ নয় বরং গল্প বলার মৌলিকত্ব রয়েছে। রয়েছে তাঁর জাতির অর্থাৎ মুসলমান সমাজের জীবনধারণ প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এমনকি জীবনদর্শনও উপজীব্য। তিনি বর্ণনা করেছেন দরিদ্রতম জাতির স্বপ্ন, প্রেম ও যৌন জীবনকে। ক্ষুধার্থ নরনারীরও বল্গাহীন স্বপ্ন থাকে আর থাকে প্রেম-পিপাসা এবং প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মহত্ত্ব। এই ভাবনাগুলি তিনি তাঁর সৃষ্টিগুলিতে রূপদান করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্প হল ঃ 'পানকৌড়ির রক্ত', 'কালো নৌকা', 'জল বেশ্যা', 'নীল নাকফুল','মীর বাড়ির কুরসি নামা', 'নফ্‌স', 'অপ্সরীর গোসল', 'নেশাগ্রস্ত নদীর সতীন', 'চার পাতার প্রেম', 'মোমের ঘরের মানুষেরা' ইত্যাদি। 'পানকৌড়ির রক্ত' গল্পে প্রকৃতি, প্রেম এবং নিসর্গের বর্ণাঢ্য বিন্যাসের মধ্যে নিষ্ঠুরতারও একটা নিয়মের কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। 'কালো নৌকা' এবং 'জলবেশ্যা' গল্পে আদিম রিপুর সাংকেতিকময় ভাষণ বর্ণিত। আবার, 'নেশাগ্রস্ত নদীর সতীন' গল্পে গল্পকার দেখালেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজের নর-নারীর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

আল মাহমুদ বড় হয়েছিলেন রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে। মুসলমান ঐতিহ্য ছিল তাঁর অন্তরগত মজ্জায়। আর মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের জনপদকে তিনি যেমন দেখেছিলেন, আবার বিশ্বভ্রমণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন জন-জাতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তবুও তাঁর ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ চরিত্ররা মুসলিম। কাহিনিও মুসলমান সমাজ থেকে গৃহীত। যদিও তিনি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে নি। বরং কাহিনি-চরিত্রের উপস্থাপনায় বাঙালি মুসলমান সমাজের নানান দিককে চিত্রায়িত করেছেন নিপুণ দক্ষতায়। কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্পগুলিতে সেভাবে মুসলমান সমাজের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত হয়নি। আর আল মাহমুদ সেই ব্রাত্য মুসলমান সমাজের চিত্র অঙ্কন করে তৈরী করলেন কথাসাহিত্যের জগতে এক নতুন ধারা। যদিও তাঁর সাহিত্যে হিন্দু সমাজ ছিল ব্রাত্য। অন্যান্য ভাবনাগুলির সঙ্গে তিনি তাঁর গল্পগুলিতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার আমদানি করলেন। গল্পের চরিত্রের মুখে দিলেন তার নিজের মুখের কথা। গদ্য রচনাতে তৈরী করলেন একটা নিজস্ব স্টাইল। আবার প্রকৃতি তাঁর গল্পের আঙ্গিক নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সবদিক মিলিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে আল মাহমুদ ব্যতিক্রমী নাম।

'নীল নাকফুল' গল্পটিতে ছোটগল্পকার চিত্রায়িত করলেন নিঃসঙ্গ প্রেমের অনুরণন। পল্লীবাংলার এক সাধারণ প্রেম কাহিনিকে অমরত্ব দান করলেন লেখক। গল্পের নামকরণ কেন তিনি 'নীল নাকফুল' করলেন, স্বভাবতই পাঠক মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। নাকফুল সাধারণত লাল অথবা সাদা পাথরের হয়। কিন্তু লেখক নীল বললেন কেন? লাল প্রেমের আর সাদা শান্তির প্রতীক। আর নীল রং অসীম শূন্যতার দ্যোতক। আবার অতলস্পর্শী গভীরতাও বোঝাতে পারে। গল্পটিতে ওসমান এবং বানেছার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত। প্রেমের ভাঙনের দৃশ্য উভয় চরিত্রকে অসীম শূন্যতার মাঝে এনে দাঁড় করায়। গল্পের শেষে ওসমানের তরফ থেকে

উপহার হিসেবে বানেছাকে দেওয়া নীল নাকফুল প্রেমের গভীরতার ব্যঞ্জনা বহন করে। 'নীল, অথবা 'নীলচে' শব্দটি গল্পটিতে মোট আটবার ব্যবহার করেছেন গল্পকার। 'নীল' শব্দের এই প্রাধান্য গল্পটিকে সাংকেতিকময় করে তুলেছে। ওসমান ভূমিহীন চাষী। সে প্রত্যেক বছর খাটিঙ্গাতে গল্প কথক আদিলদের ধানী জমিতে চাষবাসের কাজ করতে যেত। খাটিঙ্গার জোতদার হাশে চাচার খামারে ধান ঝাড়াই-মাড়াইয়ের সময় বানেছার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। এরপর প্রেম। তারপর মন থেকে দু'জন দু'জনের স্বামী-স্ত্রী রূপে মেনে নেওয়া। যদিও সেবছর বউকে সঙ্গে করে আনতে পারেনি ওসমান। বানেছাকে কথা দিয়েছিল যে, সে পরের বছর নাকফুল পরিয়ে বৌকে সসম্মানে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের মুসলমান বিবাহিত মেয়েরা এই নাকফুল পরে। তার স্বামী জীবিত থাকলে, কবরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কখনও তা খোলে না। কিন্তু পরের বছর খাটিঙ্গাতে এস ওসমান বানেছাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল তার বানেছা এখন ধনীলোক হামেশ চাচার দ্বিতীয় স্ত্রী। গল্পের শেষে যখন ওসমান বানেছাকে দেওয়ার জন্য উপহারটি নিয়ে হামেশ চাচাকে বলে ঃ "হুজুর আমি ছোট চাচীর লাইগা একটা জিনিস আনছি। তাইনে আনার কইছল গত বছর। আপনার মরজি অইলে জিনিসটা আপনে রাহেন।" এই বলে ওসমান চামড়ার ব্যাগের পকেট থেকে নাকফুলের নীল মোড়কটা বের করে হামেশ চাচার হাতে দিল। নীল নাকফুলের নীল মোড়ক শব্দ ব্যবহার ওসমান-বানেছার প্রেমকে করেছিল নীল। তাদের ভালোবাসা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তার আভাস গল্পকার গল্পের নামকরণের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন। তাই গল্পের বর্ণিত করতনাথ মুরগির গায়ের রঙ নীল, তার মাংসও নীল। এর স্বাদও দুর্দান্ত। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য। ওসমান-বানেছার ভালোবাসা সত্যকার হলেও তা দুষ্প্রাপ্য আর নীলচে রঙ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত। আবার নীল মোড়কে "হালকা নীল পাথর বসানো একটা সোনার নাকফুল।"—বাক্যটি ব্যবহার করে লেখক ওসমান-বানেছার প্রেমকে অমূল্য মর্যাদা প্রদান করেও তা শূন্যতায় পর্যবসিত করলেন। নীল নাকফুলকে কেন্দ্র করে ওসমান-বানেছার প্রেমের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দান করেছে। লেখক অর্থের কাছে প্রেমকে বিকিয়ে দিয়েছেন। তাই বানেছার মতো অতি সাধারণ নারীর প্রেমের মর্যাদা রক্ষা পায় না আলোচ্য গল্পে। প্রেমের স্বরূপ তাই নীল, অন্তঃসারশূন্য। তাই গল্পটির নামকরণ গভীর তাৎপর্যবাহী।

নাকরণের তাৎপর্য বহন করে গল্পের মধ্যে চরিত্রগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গল্পটিতে গল্পকার আল মাহমুদ মূলত পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের মুসলমান সমাজের খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন। যেখানে বিভিন্ন ধরনের চরিত্ররা এসে ভিড় করেছে। ওসমান ভূমিহীন চাষী শ্রেণির প্রতিনিধি। আদিল ভদ্র ঘরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। বানেছা কাজের মেয়েদের প্রতিনিধি। সর্বোপরি হামেশ চাচা জোতদার শ্রেণির প্রতিনিধি। গল্পটিতে ওসমানই একমাত্র প্রধান চরিত্র। আর এই চরিত্রের ভিতরের জট একে একে খুলে দিয়েছে আদিল চরিত্র। প্রধান-অপ্রধান চরিত্র মিলিয়ে মোট দশটি চরিত্র বিদ্যমান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপ্রধান চরিত্রগুলি হঙ্গল—হামেশ চাচা, হামেশ চাচার প্রথম স্ত্রী মোমেনের মা এবং বানেছা। ওসমান-বানেছার প্রেম গল্পের উপজীব্য হলেও বানেছা চরিত্রের উত্থান-পতন বর্ণিত হয়নি। কেবলমাত্র একবার গল্পের শেষে সশরীরে আর উপস্থিতি লক্ষণীয়। মূল চরিত্র ওসমান এবং আদিল। ওসমান ভূমিহীন চাষী। ভূমিহীন চাষীদের সর্দার সে। খাটিঙ্গা গ্রামে আদিলদের ধানী জমি ছিল। সেখানে প্রায় দু'হাজার মণের ওপর ধান ফলত। এই গ্রামের জোতদার হামেশ চাচা ভাগে চাষ করত। প্রত্যেক বছর ধান কাটার মরসুমে ওসমান সহ অন্যান্য চাষীরা নদী পথে খাটিঙ্গাতে আসত চাষের কাজ করতে। ওসমান প্রত্যেকবার এখানে আসত অদিলের পিতার সঙ্গে। এবারে সে আসছে অদিলের সঙ্গে। সে কর্তামায়ের নির্দেশ মতো আদিলের সঙ্গে থাকতে চায়। আদিল ও বিদেশ-বিভুঁইয়ে তার সঙ্গ পছন্দ করল। ভাটি অঞ্চলের ভূমিহীন চাষীদের সব গুণই ওসমানের মধ্যে ছিল। লেখক তার চেহারার বর্ণনা দিলেন ঃ "আন্দাজ করি ওসমানের বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। শক্ত-সমর্থ দশাসই শরীর। হাতের গড়ন চরদখলের লাঠিয়ালদের মতো। খালি গা। পাট-বেপারীদের মতো কোমরে পকেটঅলা চামড়ার মোটা কালো বেল্ট।" স্বভাবতই তাই সে সব চাষীদের সর্দার। মনিব আদিলের জন্য দুষ্প্রাপ্য করত নাথ মুরগি জোগাড় করে

সে এবং নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ায়। এই রান্নার প্রসঙ্গে 'মাইয়া মানুষের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আদিল। সেসময় ওসমান জানায় যে, গত বছর খাটিঙ্গাতে বানেছা নামে এক মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। তারপর বেল্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট নীল পাতলা কাগজের মোড়ক বার করে আদিলের হাতে দিয়ে বলেঃ "এই দেহেন ভাইজান, আমার বউয়ের নাকের সোনা লইয়া যাইতাছি।" বিয়ের পর বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা এই ধরনের নাকফুল পরে। এর পর খাটিঙ্গাতে পৌঁছে আদিলও ওসমানের অনুসন্ধান। অবশেষে হামেশ চাচার বাড়িতে সে অবিষ্কার করে তার প্রেমিকা বানেছাকে ঃ "তুমিও নতুন বউয়ের মতো সরমিন্দা অইলা নিহি ওসমান মিয়া। তুমি চিনো না আমার বানেছা বিবিরে? গত বছর দেখছি মলন দিবার সময় ধান লইয়া কত হাসি ঠাট্টা করছ। অহন আবার শরম কি, অহন তো তোমার চাচী লাগে, সেলাম কর।" তখন ওসমানের হৃদয়কুলে বয়ে যায় প্রবল সুনামি। তারপর সেই নীল নাকফুল হামেশ চাচার হাতে দিয়ে সে বানেছাকে বলে ঃ "কেমন আছেন ছোটচাচী? আমার লইগা দোয়া কইরেন।" এই উক্তিটির মাধ্যমে ওসমান যেন বানেছার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটালেন। কেননা, বানেছা পূর্বেই লক্ষ করেছিল যে ওসমান তাদের অন্দরমহলে উপস্থিত। সে তার প্রাক্তন প্রেমিকের জন্য বেদনাশ্রু ঢাকতে চেয়েছিল ঘোমটা দিয়ে। গল্পকার সামান্য এক চাষীর প্রেমকে মূল্য দিতে চেয়েছেন গল্পের মধ্যে। এক ভূমিহীন গরীব চাষার প্রেমকে লেখক নৈসর্গিক প্রেমের মহত্ত্বে রূপদান করেন। ওসমান-বানেছার প্রেম ছিল নিখাদ। যদিও তারা শেষপর্যন্ত মিলিত হতে পারেনি। হামেশ চাচা বানেছার প্রেম ছিল নিখাদ। যদিও তারা শেষপর্যন্ত মিলিত হতে পারেনি। হামেশ চাচা বানেছার রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন। এখানে লেখক আল মাহমুদ মুসলমান সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের চরিত্রহীনতার চিত্র তুলে ধরলেন। হামেশ চাচার স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও আবার তিনি বিয়ে করলেন। যদিও এই কর্মের জন্য পুত্রসম আদিলের কাছে লজ্জিত তিনি। আদিল চরিত্রটি শেষপর্যন্ত প্রভুসুলভ থাকে না। সে নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায়। জানতে চায় তাদের হৃদয়ের অব্যক্ত কথা। তাই সে ওসমানের মতো ভৃত্যের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে পেরেছিল। এখানেই আদিল চরিত্রটির সার্থকতা।

চরিত্র চিত্রণের সার্থকতায় প্রকৃতিও ভূমিকা গ্রহণ করেছে গল্প-মধ্যে। ওসমানের প্রেমের ব্যর্থতার দৃশ্য গল্পকার প্রকৃতি ও তার চরিত্রকে একাকার করে দেন ঃ "মেঘনার পশ্চিম পারে সূর্য তখন লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে। পড়ন্ত সূর্যের অন্ধকার মিশ্রিত লাল আভায় ওসমানের দৈহিক দৈর্ঘকে আমার কাছে বড় বেশি দীর্ঘকায় বলে মনে হতে লাগল। পেছনে ভেজা বালুময় বিস্তৃত তীরভূমির ওপর তার পায়ের ছাপ এমনভাবে আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখলে মনে হয় একজন ভারী মানুষকে বহন করার চিহ্ন রাখার জন্য ধরণী যেন বেশ একটু নমনীয় হয়েই আছেন।" 'নদী এবং ধানক্ষেত' গল্পে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওসমান যখন আদিলকে বলে ঃ "তয় ভাইজান, এইবার উত্তরের ধানক্ষেতের ভিতর থিকা এই নৌকাত কইরাই একটা মাইয়া মানুষ লইয়া আমু।" তখন মনে হয় এই নদী আর ধানক্ষেত ওসমান-বানেছার প্রেমের মূল কারণ। আবার বানেছাকে হারানোর মূল কারণও তাই। লক্ষণীয়, প্রকৃতি এখানে গল্পটির মূল বিষয়বস্তুকে করেছে প্রভাবিত। শুধুমাত্র প্রকৃতি নয়, লেখক চরিত্রগুলির মুখে বাংলাদেশের সিলেট জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রগুলিকে করেছেন আর ও বেশি জীবন্ত ও প্রাণোজ্জ্বল। বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার ও গল্পটিকে চমকপ্রদ করে তুলেছে। যেমন—"সূর্য তখন লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে" অর্থাৎ লেক ওসমানের ভালোবাসার অস্তকে সূর্যাস্তের প্রতিমায় অঙ্কন করেন। কিংবা হামেশ চাচার "কামরার মাঝামাঝি একটা গাঢ় সবুজ পর্দা টাঙানো।" পর্দার রঙ সবুজ কোন? অন্য রঙ তো লেখক ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু গল্পকার হয়তোবা বানেছার এবং প্রথম স্ত্রীর প্রতি হামেশ চাচার গভীর প্রেমকে বোঝানোর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'নীল' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করে গল্পকাহিনি এবং ওসমানের প্রেমের ভাঙনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান লেখক। আবার মুসলমানি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—'ভাইজান', 'তয় নাও ভাষাও আল্লাহর নামে', 'করতনাথ মুরগির ভোনা', 'কলজের টুকরোগুলো', 'এজিন কাবিন ছাড়া বিয়া', 'কদমবুসি', 'আদম-হাওয়ার ফরজন্দ', 'হামেশ চাচা', 'চাচী','শরম', 'জি হুজুর' প্রভৃতি

শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক মুসলমান সমাজের চিত্রকে নিখুঁত রূপে অঙ্কন করেছেন।

'নীল নাকফুল' ছোট গল্পটি হল যন্ত্রণার ফসল। শূন্যতার আঘাত মহৎ বিশ্বাসের উপরকরণগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিয়েছে। আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল কৌণিক ধারালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ছুঁড়ে দিয়েছেন আলোচ্য গল্পে। গল্পটি নিতান্ত সহজ-সরল ভঙ্গিতে বিন্যস্ত। কাহিনি বিন্যাসও সংক্ষিপ্ত। কোন চরিত্রের জটিলতা নয় এবং দক্ষশিল্পীর মতো নিপুণ তুলির আঁচড়ে চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে আমাদের হৃদয়-ক্যানভাসে। আবারকোন কোন চরিত্রের সামান্য ঘটনা চরিত্রটি সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করে। গল্পকথক আদিল যেভাবে গল্পটি বর্ণনা করেছিল পাঠকগণ পড়তে পড়তে ভাববেন যেন ঘটনাক্রম মহাদিগন্তের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। ওসমানের বানেছা অনুসন্ধান পর্ব যখন হামেশ চাচার অন্দরমহলে এসে শেষ হয়, তখন লেখক গল্পটিরশেষ করেন। কিন্তু থেকে যায় একটা অতৃপ্তির স্বাদ। মনে হয় এরপর ওসমানের জীবনে কী ঘটে? কিংবা বানেছা কী ওসমানের প্রেম সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়? গল্পকার পাঠকমনে রেখে যান বিস্ময়বোধ আর প্রশ্ন চিহ্ন। গল্পবলার মৌলিকত্ব ও লক্ষণীয়। লেখক আদিল চরিত্রের মুখ দিয়ে পুরো কাহিনির ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। ছোটগল্পের নানান বৈশিষ্টগত দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, 'নীল নাকফুল' গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্প। যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। আল মাহমুদ। 'গল্পসমগ্র/১'। অনন্য, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

২। আল মাহমুদ। 'দিনযাপন'। প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৬।

৩। আল মাহমুদ। 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। আদর্শ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৪। সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পাদিত)। 'সাক্ষাৎকার আল মাহমুদ'। ঐতিহ্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৫। ওমর বিশ্বাস (সম্পাদক)। 'কথোপকথন আল মাহমুদ'। কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৫।

৬। নবেন্দু সেন (সম্পাদনা)। 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা'। রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯।

৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'সাহিত্যে ছোট গল্প'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৬।

৮। শিশির কুমার দাশ। 'বাংলা ছোটগল্প'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭।

৯। গোলাম মুরশিদ। 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস'। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩।

১০। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। কালের পুত্তলিকা ঃ বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর ঃ ১৮৯১-২০০০'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

১১। 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ যুগ্ম সংখ্যা, পঁচিশে বৈশাখ ১৪১১। প্রসঙ্গ কথা সাহিত্য। সম্পাদক-জ্যোতির্ময় ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২। 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'। বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৬-২০০৭।

১৩। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রধান সম্পাদক) 'বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। অখণ্ড। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০।

১৪। কাজী রফিকুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা)। 'বাংলা ভাষার আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান'। প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪।

১৫। 'আকাদেমি বানান অভিধান।' পঞ্চম মুদ্রণ। সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।

'মিথ'-এর কাব্যরূপ

পুতুল বৈদ্য

কোন বাঁধা ধরা গণ্ডীর সীমাবদ্ধতায় আল মাহমুদের কবিতা আবদ্ধ নয়। নাড়ার দহনের উত্তাপ গায়ে মেখে কবির কবিতার পথ চলা। তাঁর কবিতা পাঠ করে বাঙালি পাঠক মগ্ন হয়ে যায়, এনে দেয় নতুন ভাবনা। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পাঠক হৃদয়। পড়েছেন, দেখেছেন, স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তৃপ্ত হয়েছেন, শিক্ষা নিয়েছেন পাঠককুল। কখনও মনে হয়েছে তিনি প্রশ্নচিহ্নের মাঝে দাঁড়িয়ে। আল মাহমুদের কবিতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নানা আঙ্গিকে, আঙ্গিকের সুষম চর্চায় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। তাঁর কবিতায় ঠাঁই পেয়েছে অসংখ্য মিথ। মিথ তাঁর কবিতাকে যেমন একটা নির্দিষ্ট অবয়ব দিয়েছে। আমাদের বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্যগুলিকে তিনি তাঁর কবিতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছেন নতুনতর আঙ্গিকে।

কবি আল মাহমুদের কবিতার আঙ্গিকে মিথ যে প্রচলিত গতিধারাকে ভেঙে এক নতুন রূপ পেয়েছে তা এখানে উদ্দিষ্ট। মিথ এই শব্দটি নিয়ে জন সমাজের মাঝে একটা প্রচলিত ধারণা আছে। তবুও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তার তত্ত্বগত আলোচনা। 'মিথ' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল পুরাণকাহিনি, দেব-দেবীর গল্প, অলীক কেচ্ছা, অলৌকিক ধর্মীয়-ঐতিহাসিক কাহিনি। মিথ সম্পর্কে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ মত পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন মিথ্যা কাহিনি যখন মানব জীবন-আচারে সন্নিবিষ্ট হয়ে যুগের পর যুগ প্রবাহিত হয়ে সত্যের বিশ্বাস অর্জন করে, তখন সেই কাহিনিকে বলা হয় মিথ। মিথ মানুষের জীবনে অতীন্দ্রিয়ময় মায়াজাল বিস্তার করে এবং যার ফলশ্রুতি রূপে মানব মনে সুখ অথবা দুঃখের আত্মানুভব জাগরিত হয়। মহাকাল আর মহাবিশ্বের সঙ্গে মানব মনের সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা তথা বিশ্বাসকে সংযোগ স্থাপন করে এই মিথ। সেটা ধর্মীয় চেতনায় হোক কিংবা লোক কাহিনি সঞ্জাত হোক না কেন—মিথ আসলে মানবমনের ভৌগোলিক সীমানাকে মহাজাগতিক অপার রহস্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আর এই অলীক কল্পনার মায়া জগৎ এবং অলৌকিক কাহিনির সন্নিবেশ কাব্যে পরিবেশন করে কবিরা তাঁদের চিন্তনকে করে তোলেন আরও বেশি চেতনাপ্রবাহী, ব্যঞ্জনাগর্ভ। আবার ঐতিহাসিক চরিত্রের অতিরিক্ত-অতিরঞ্জিত লোক কথা ইতিহাসের কঙ্কালসার চেহারায় সংযুক্ত করে মেদ-চর্বি-মাংস-রক্তপ্রবাহ। মানবমনে জাগরিত হয় ঐতিহাসিক চরিত্রের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতার আনন্দ। ঐতিহাসিক ব্যক্তি-চরিত্র সমূহের অসাধারণ বহির্জাগতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চিত্র মানব মনকে অকল্পনীয় অতিপ্রাকৃত দৃশ্যভূমিতে এনে দাঁড় করায়। তখন 'মিথ' নামক কল্পকাহিনির ঘটে চরম সার্থকতা। এই প্রত্নপ্রতীক তথা মিথ এবং ধর্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক Mark P.O. Morford এবং Robert J. Lenardon লিখিত "Classical Mythology" (Seventh Edition, New York oxford, Oxford university Press, 2003) গ্রন্থের 'Myth and Religion" অধ্যায়ে বলেছেন—"Thus Mythology and religion are inextricably entwined. One tale or another once may have been believed at some time by certain people not only factually but also spiritually; Specific creation stories and mythical conceptions of deity may still be considered true today and Provide the basis for devout religious belief in a Contemporary Society. Infact, any collection of meterial for the comparative study of world mythologices will be dominated by the study of texts that are, by nature, religious."

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ একেশ্বরবাদী; আবার কেউ-বা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। একেশ্বরবাদীদের ধর্মকে বলা হয় সেমেটিক আর বহুত্ববাদীদের ধর্মকে নন্-সেমেটিক। নন্-সেমেটিক ধর্মগুলোকে আবার আর্য ও অনার্য দু'শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। মূলত সেমেটিয় ধর্মগুলি হল—ইহুদী,

খ্রিষ্টান, ইসলাম। নন্-সেমেটীয় বোধে বিশ্বাসী মানুষরা বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের অবস্থান। আর সেমেটিকরা মনে করেন সবই প্রভুর সৃষ্টি। যুগে যুগে প্রভুর পাঠানো দূতগণ মানুষের কাছে ধর্ম প্রচার করেছেন। এই দু'ধরণের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে অলৌকিক-পুরাণ কাহিনি। হিন্দু ধর্মের ভগবদ্গীতা—উপনিষদ-বেদ-রামায়ণ-মহাভারত সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কাহিনি বাংলা-কাব্যে সেই আদি যুগ থেকে সন্নিবেশিত হয়ে আসছে। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে রয়েছে হিন্দু ধর্মের নানান দেব-দেবীর কাহিনী। আধুনিক যুগের সূচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যধারায় ঘটল কিছুটা পরিবর্তন। তখন আর কোন দেব-দেবীর সম্পূর্ণ কাহিনি নয়, বরং পরিবর্তে কোন একটা কাহিনির নাম উল্লেখ, কিংবা ঘটনার আঁচ ব্যবহৃত হল পদ্যধারায়। এরপর তিরিশ-চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হল মূলত ইউরোপীয় মিথ। বিশেষত গ্রীক-রোমান দেব-দেবীদের নানান কাহিনি, উপকাহিনি এবং চরিত্রের কথন। যা পরবর্তীতে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশি-নব্বই-বিশশতক এবং একবিংশ শতকের কাব্যধারাকে প্রভাবিত করেছিল। মিথ কবিতার অবয়বে ঘটিয়েছিল অলৌকিক সৌন্দর্যায়ন। কিন্তু, একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি হিন্দু-খ্রিষ্টান-গ্রীক মিথের পাশাপাশি ইসলামিক থিমও ব্যবহার করেছিলেন। যা মূলত তাঁর ইসলামিক কালচারের ফলশ্রুতি। আর এঁরই উত্তরসূরী রূপে ইসলামিক মিথের সার্থক এবং সর্বাত্মক প্রয়োগ করলেন যে কবি, তিনি আল মাহমুদ। যিনি মূলত পঞ্চাশ-ষাটের দশকের ব্যতিক্রমী কবি। তাঁর কবিতায় তিনি হিন্দু-ইহুদী- খ্রিষ্টান-ইসলাম ধর্মের নানান পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনিকে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। আর, তৈরী করলেন নিজস্ব একটা ঘরানা। বাংলা কাব্য ধারার প্রধানতম কবি আল মাহমুদের দুটি কবিতার মিথ আমার আলোচ্য বিষয়। প্রথম কবিতাটি হল 'লোক লোকান্তর' (প্রথম প্রকাশ-১লা পৌষ ১৩৭০) কাব্যগ্রন্থের 'নূহের প্রার্থনা' এবং দ্বিতীয় কবিতাটি হল 'সোনালি কাবিন' (প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৮০) কাব্যগ্রন্থের 'সোনালি কাবিন' সনেটগুচ্ছের প্রথম সনেট। এই কবিতা দুটিতে ইসলামিক মিথের ব্যবহার সার্থকভাবে, প্রয়োগ করেছেন কবি আল মাহমুদ।

কবিতা দুটির বিশ্লেষণের আগে মিথ দুটির কাহিনি জানা দরকার। হযরত ইদরিস (আঃ)-এর বেহেশত্ গমনের পর চারশ' বছর অতিবাহিত হলেওএই সময়ের মধ্যে দুনিয়াতে আল্লাহর তরফ থেকে আর কোন নবীর আগমন হয়নি। যার ফলে এ সময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নিরাকার প্রভুর উপাসনা করার মতো কোন লোক আর রইল না। পৃথিবীতে তখন হিংসা-হানাহানি সর্বোপরি কদর্যময় পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে দুনিয়ায় নূহ নবীর আগমন। তিনি মানুষজনকে ইসলামের শান্তির কথা বোঝাতে থাকলেন। কিন্তু স্বার্থপর-অহংকারী মানুষজন নূহকে বিশ্বাস করল না। এমন কী তাঁর স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র কেননা ও তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। দুনিয়ার ক্লেদর্যতাকে শেষ করার জন্য প্রভুর তরফ থেকে গজবের ঘোষণা হল। নূহ চরম গ্রীষ্ম কালে খরার সময় শুষ্ক ভূমির উপর তৈরী করতে লাগলেন কাঠর বিশালাকার (দৈর্ঘ্য-এক হাজার গজ এবং প্রস্থ-চারশ'গজ) জাহাজ। লোকজন হাসাহাসি করতে লাগল। নূহকে পাগল প্রতিপন্ন করল। নূহ নবী প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ পেলেন যাঁরা তাঁর কথা মেনে চলবে তাঁদের এবং বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর এক জোড়া করে ও উদ্ভিদকুলকে তাঁর নৌকায় স্থান নিতে। প্রবল খরার মধ্যে পৃথিবীর তলদেশ থেকে উষ্ণজলের জোয়ার পৃথিবীকে দিল ডুবিয়ে আর আকাশ হতে অবিরাম ধারার বৃষ্টি ধ্বংস করে ধুয়ে মুছে দিল সমস্ত কদর্যতাকে। মোট ছ'মাস আটদিন নূহ তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে জাহাজে ছিলেন। এরপর জাহাজ জুদি পাহাড়ে ভিড়ল। জাগরিত হল পৃথিবীর বুক। অতঃ পর নূহ একটি কবুতর ছেড়ে দিলেন। কবুতরটি উড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত মাটির উপরে পড়ে আবার ফিরে এলো। তার পায়ের কাদার চিহ্ন দেখে নূহ বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবীর বুক শুষ্ক হয়েছে। জাহাজের সবাই অবতরণ করল। মূলত, এই কাহিনি পর্যন্ত কবি গ্রহণ করেছেন। যদিও নূহের কাহিনি আরও বিস্তৃত।'

দ্বিতীয় কাহিনিটি হল আদমের কাহিনি। ইসলাম মতে আদম হলেন পৃথিবীর আদি পিতা এবং তাঁর স্ত্রী

হলেন বিবি হাওয়া। আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়ার জন্ম। হাওয়া জন্মাবার পরই আদমের স্ত্রী হননি। প্রভু স্বয়ং দু'জনকে বিবাহ দিয়েছিলেন। নিঃস্ব আদম ইসলামিক রীতি অনুযায়ী স্ত্রীকে দেন্‌মোহর স্বরূপ কোন অর্থ দিতে পারেননি। পরিবর্তে কিছু ইসলামিক রীতি পালন করেছিলেন। বিবাহের পর তাঁরা 'জান্নাতুল ফেরদাউস' নামক স্বর্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছিলেন। প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ ছিল যে, তাঁরা স্বর্গের মধ্যে যা ইচ্ছা ভক্ষণ করতে পারেন কিন্তু নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গন্দম ভক্ষণ যেন না করেন। অথচ ইবলিসের প্ররোচনায় তাঁরা গন্দম ভক্ষণ করলেন এবং স্বর্গের মধ্যে উভয়ই বসন হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে গেলেন। তখন দু'জনেই তাঁদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য আর কোন বস্তু খুঁজে না পেয়ে বৃক্ষ পত্রের দ্বারা অঙ্গ ঢাকবার মনস্থির করলেন। একে একে বিভিন্ন বৃক্ষের নিকট গিয়ে পাতা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোন বৃক্ষই—তাদেরকে তা প্রদান করতে রাজি হল না। অবশেষে তাঁরা আঞ্জির অর্থাৎ পেয়ারা গাছেরপাতা দিয়ে ঢাকলেন গুপ্তাঙ্গ এবং চন্দনের পত্র দ্বারা অন্যান্য সর্বাঙ্গ আবৃত করলেন। তাই প্রভু আঞ্জিরকে সুস্বাদু আর চন্দনবৃক্ষকে সুঘ্রাণ প্রদান করলেন। আদম ও হাওয়ার এই দোষের শাস্তি রূপে প্রভু তাঁদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তিনশ' বছর ধরে অন্ধকারের মধ্যেই অতিবাহিত করিয়েছিলেন। কবি আদম-হাওয়ার এই কাহিনিটুকু গ্রহণ করেছে। যদিও এঁদের কাহিনি আরও বিস্তৃত।

এই মিথ আশ্রয়ী কবিতা 'নূহের প্রার্থনা'। আল মাহমুদ নূহ এবং আদমকে উপজীব্য করে এই কবিতায় মিথের প্রচলিত ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি আত্মভাবনাকে একাকার করে দিয়েছেন। নূহের সময়কার বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে কবির জীবনে দেখা বিশ্ব পরিস্থিতিতে একাত্ম করেছেন 'নূহের প্রার্থনা' কবিতায়। কবি দেখেছেন অভিভক্ত ভারতবর্ষকে। যেখানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, সিংগাইর বিলে বোমা পড়া, যুদ্ধের মধ্যেই তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ না খেতে পাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের কঙ্কাল। তারপর দেশভাগের আন্দোলন, পাকিস্তান। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' (সাক্ষাৎকার আলমাহমুদ, সাজ্জাদ বিপ্লব সম্পাদিত, ঐতিহ্য ২০০৩)। আবার দাঙ্গা। দেশ ভাগ। উদ্বাস্তু হল মানুষজন। এরপর পাকিস্তান। গান্ধী-জিন্নাহর হত্যা। উন্নিশ' বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। আর উন্নসত্তরের গণ আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম। কবি আল মাহমুদ স্বপ্নহীন পঞ্চাশের দশকের কবি। নূহ যখন বলেন ঃ

"তখন কেমন হবে, আবার যখন
তরল তিমির ছিঁড়ে ভাসবে এ পৃথিবী প্রথম?"

'তরল তিমির'-এর তাৎপর্য হল নূহের সমকালীন ক্লেদাক্ত দুনিয়া। যেখানে মূলত মানব জাতির অবক্ষয়ের অন্তিম পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। যেখান থেকে প্রভুর ধ্বংসলীলা আর নতুন বিশ্বের সৃষ্টি। এই কাহিনির সঙ্গে কবি নিঃস্বপ্ন, আর্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, উদ্বাস্তু বাংলাদেশের নব নির্মাণের স্বপ্নকে মিশিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে কবিতাটি কেবলমাত্র ইসলামিক মিথের কাহিনিতে স্থির থাকেনা, তা আমাদের দুঃস্বপ্নময় স্মৃতিগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।

এই কাহিনির সঙ্গে কবি প্রেমকেও ছড়িয়ে দিয়েছেন মানব-মানবীর হৃদয়ে, পৃথিবীর পুনর্জন্ম লগ্নে পুণ্যবান পুরুষের চোখে রমণীরা কেমন হবে?

"যখন আবার
শোনা যাবে ঘন্টাধ্বনি উটের গলায়"

এখানে ধূ ধূ মরুভূমির বুকে উট প্রাণের প্রতীক, প্রাণ সঞ্চারের প্রতীক। কবিও ভাবেন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি সত্যি হৃদয়হীন মানবমনে প্রেমের উদ্‌গীরণ ঘটবে? কবি এখানে ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ বাংলাদেশের মানবজাতির হৃদয়ের প্রেমকে বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন। আবার পরক্ষণেই

কবি সতর্ক হয়ে যান। মনে করিয়ে দেন আদমের কালোত্তীর্ণ পাপের কথা ঃ

"আদমের কালোত্তীর্ণ সেই পাপ যেন
হে প্রভু আবার কভু ছদ্মবেশী সাপের মতন
গোপন পিচ্ছিল পথে বেরিয়ে না আসে।"

আদমের নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ফলে স্বর্গচ্যুতির পাপের কথা এখানে বর্ণিত হলেও কবি বোঝাতে চান অন্য প্রসঙ্গ। সদ্যজাত বাংলাদেশের হৃদয়ে যেন জন্ম না নেয় কোন ইবলিস। যে আদমের মতো অন্যায়-পাপ কাজে প্ররোচিত করবে বাংলাদেশবাসীকে। আদমের সেই কালোত্তীর্ণ পাপের বীজাণু যদি এই বিশ্বে রোপিত হয় তাহলে আবার মানব সভ্যতা যুদ্ধ আর ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

এরপর কবিতাটির দ্বিতীয় পর্যায়। নারী এবং পুরুষের কথন। নারীর কথন ঃ

"ভেসে ভেসে তারপর একদিন দুরন্ত বাতাসে
যখন আবার পাবো পুরানো সে মাটির সুরভি
আনন্দে উল্লাসে আমি আমার সে পুরুষের হাতে
আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দেবো নীরব আবেগে।"

কিংবা,

"এতোদিন যৌবনের নামে
যা ছিলো সঞ্চিত এই সঞ্চারিত শরীরের কোষে।
হে নূহ সন্তান দেবো, আপনাকে পুত্র দেবো আমি।"

এখানে যৌবনাবতী নারীরপ্রেমের কথা বর্ণিত। যে নবগঠিত বিশ্বের বুকে প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করতে চায়। অন্য ভাবনায় সদ্যজাত ধ্বংসপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের হৃদয়-ক্ষতে ভালোবাসার আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দিতে চায় সেই নারী। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের বুকে প্রেমের অগ্নুৎপাত ঘটাতে চান তিনি। আর সঞ্চারিত শরীরের কোষে সন্তানের জন্ম কিংবা নূহের সন্তান দেবার কথা প্রকৃতপক্ষে নতুন প্রজন্মের জন্ম দেবার কথা বলা হয়েছে। যে প্রজন্ম পাপের জীবাণুতে জন্মাবে না; বরং ভালোবাসার নিষ্পাপ-পবিত্র জারিত অমৃত রসে সেই প্রজন্মের জন্ম হবে। অপরপক্ষে পুরুষের কথনে পাই ঃ

"তোমাকে জড়াবো বুকে হে প্রেয়সী, তোমাকে কেবল
রক্তের উত্তাপ দেবো, প্রেম দেবো, গান দেবো বেঁধে,
তোমাকে ফসল দেবো, গৃহ দেবো, তৃপ্তি দেবো নারী।
আপনাকে শান্তি দেবো আর নূহ, শক্তি দেবো আমি।"

কবিতার অন্তিমলগ্নে এসে কবি আল মাহমুদ শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষের জয় ঘোষণা করেন। পুরুষটি তার প্রেমিকাকে ভালোবাসার উত্তাপ দেবার সঙ্গে প্রেম-জীবনের গান, সন্তান আর গৃহ দেবার কথা ঘোষণা করে। প্রাসঙ্গিকক্রমে মনে পড়ে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরীপাটনী' কবিতায় ঈশ্বরীপাটনী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। এখানে সন্তান অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে, তাদের নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের জন্য প্রার্থনার কথা বণিত। আলোচ্য কবিতায় ও পুরুষটি তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আগামী প্রজন্ম যেন শান্তিময় মানব সভ্যতার জন্ম দেয়। শান্তির বার্তা যেন বয়ে আনে বিশ্বের বুকে। পুরুষটি যখন নূহকে শান্তি আর শক্তি দেবার কথা বলে তখন নূহের সেই শান্তিময় পৃথিবী

কামনাকে সমর্থন করে। পুরষটি তার প্রেমিকার শরীরে বীর্যবান সন্তানের বীজ রোপন করে পৃথিবীকে আশ্বস্ত করতে চান যে আগামী প্রজন্ম হবে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। পৃথিবীর অনন্ত অন্ধকারকে দূর করে সেই প্রজন্ম নতুন সূর্যোদয়ের ভোর সূচিত করবে। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি আল মাহমুদ সেমেটিক সৌন্দর্য ধারণার সাথে বাঙালি সৌন্দর্য ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন সুন্দর এবং সার্থক রূপে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'সোনালি কাবিন' সনেটগুচ্ছের প্রথম সনেট। এই কবিতায় আদমের কাহিনি অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু একবার ও কবি আদমের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না। শুধুমাত্র তাদের কাহিনিকে সঞ্চারিত করলেন কবিতার শিরা-উপশিরা-ধমনীতে। বলা যায় কবি আলোচ্য কবিতায় লৌকিক রহস্যকে অলৌকিকতায় মিশিয়ে দিয়েছেন। কবিতাটির প্রারম্ভ :

"সোনার দিনার নেই, দেন্ মোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিন বিহীন হাত দু'টি,
আত্ম বিক্রয়ের স্বর্ণ কোন কালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারিদিকে চতুর ভ্রুকুটি।"

সূচনা পর্বেই কবি ইসলামিক বিবাহ রীতি কথা উল্লেখ করেন। দিনার আরব দেশের মুদ্রার নাম। দেন্‌মোহর হল মুসলিম বিয়েয় সময় স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়। আর কাবিন কথাটির অর্থ হল মুসলিম বিবাহে কন্যাকে দেওয়া মোহরান। পৃথিবীর আদি পিতা আদম ছিলেন নিংস্ব কিন্তু ঐশ্বর্যশালী। তাঁর কাছে সোনার দিনার ছিল না, ছিল না কোন পার্থিব ঐশ্বর্য। কিন্তু ছিল নিখাদ ভালোবাসা। যা দিয়ে তিনি হাওয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাই হাওাকে দেন্ মোহর হিসাবে সোনার মূল্যবান দিনার দিতে পারেন নি বটে, দিয়েছিলেন প্রেমের অদম্য প্রাণশক্তি। আর কবির মনেও কোন রকম ব্যবসায়িক ধূর্ততা কিংবা চতুরতা নেই। যা দিয়ে সহজেই ঠকানো যায়। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে কোন কালে তিনি ভালোবাসার পাত্র ভরাতে চাননি। তিনি তাঁর প্রেমিকাকে আদমের প্রেমিকার মতো "কাবিন বিহীন হাত দু'টি' বাড়িয়ে দিতে চান। আভরণহীন কবি আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনোকালে সঞ্চয় করেননি। এখানে আদমের প্রেমিক সত্তার সঙ্গে কবির প্রেমিক সত্তাকে একাত্ম করেছেন কবি আল মাহমুদ। ব্যবসায়িক ছলনা জানেন না আদম। তিনি শুধু জানতেন বিবি হাওয়াকে ভালোবাসতে ঃ

"দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি।"

কবি এখানে দৈহিক মিলনের সুখকে অতিক্রম করে অতিন্দ্রীয় ভালোবাসার জয়কে ঘোষণা করেন। দৈহিক সুখানুভূতির নাম কেবলমাত্র ভালাবাসা হতে পারে না। প্রেমিক প্রেমিকার আত্মিক টান অনুভবের নামান্তর হল ভালোবাসা। এরপরই কবি আবার আদমের প্রসঙ্গ কথা সুষ্পপষ্ট রূপে উল্লেখ করেন ঃ

"বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল পৌরুষ আবৃত করে জলপাইর পাতাও থাকবে না; তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিতে সেই ফল জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনার"।

এখানে কবি আল মাহমুদ আদমের মিথকে ভেঙে নিজের মতো করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। আর এখানে কবি ও কবিতার চরম সার্থকতা। শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের গন্দম ফল খাবার পর আদম ও হাওয়া বিবসন হয়েছিল, এখানে তার কথা বলা হয়েছে। অবশেষে আঞ্জির অর্থাৎ পেয়ারা গাছের পাতা দিয়ে যৌনাঙ্গ আবৃত করেছিলেন দু'জন। কবি কিন্তু এখানে ব্যবহার করলেন জলপাইয়ের পাতা। ভেঙে দিলেন মিথকে। গড়ে তুললেন বাঙালী জীবনের পল্লীবাংলার চিরপরিত পরিবেশকে। সেখানে আদম যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি আর নন, তিনি হয়ে ওঠেন আমাদেরই ঘরের চিরচেনা-প্রেমিক। আর কবিতার শেষে কবি প্রেমিক সত্তার জয়

ঘোষণা করেন। যে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে তাঁরা অন্যায় করেছিলেন; যার ফলে। দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা উপশিরা।' তারপরেও 'পরাজিত নই নারী' অর্থাৎ প্রেমিককূল এবং 'পরাজিত হয় না কবিরা' আলোচ্য কবিতাটি একটি নিখাদ প্রেমের কবিতা। যেখানে কবি ঘোষণা করেন অর্থগত দিক দিয়ে নিঃস্ব হলেও বিশ্বের সমস্ত প্রেমিকগণ হৃদয়গতভাবে প্রবল ঐশ্বর্যবান। আর প্রাসঙ্গিকক্রমে এসেছে আদম হাওয়ার ইসলামিক কাহিনি যা কবি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন আলোচ্য কবিতায়। এখানেই কবি সমকালের কবিদের থেকে স্বতন্ত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। আল মাহমুদ। 'কবিতা সমগ্র' (১) অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা, বইমেলা ২০০০।

২। আল মাহমুদ। 'দিন যাপন'। প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৬।

৩। অল মাহমুদ। 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। আদর্শ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

৪। ইমদাদুল হক মিলন (সম্পাদক)। 'শ্রেষ্ঠ আলমাহমুদ'। অবসর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

৫। ওমর বিশ্বাস (সম্পাদক)। 'কথোপকথন আলমাহমুদ'। কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৫।

৬। সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পাদিত)। 'সাক্ষাৎকার আল মাহমুদ'। ঐতিহ্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৭। ড. ফজলুল হক তুহিন। 'আল মাহমুদের কবিতা ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ'। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

৮। বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। 'বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ'। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯।

৯। আনু হোসেন। 'বাংলাদেশের কবিতা লোকসংস্কৃতির নন্দন তত্ত্ব'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

১০। জীবনানন্দ দাশ। 'কবিতার কথা'। ৮ম সংস্করণ। সিগনেট, কলকাতা, ১৯৯৮।

১১। বিমল গুহ। 'আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান জসীমউদ্‌দীন—জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু-দে'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

১২। মিজানুর রহমান বুলবুল এবং মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান (সম্পাদিত)। 'পবিত্র আল-কোরআনে বর্ণিত পঁচিশজন নবীও রাসুল'। আফতাব ব্রাদার্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

১৩। ডঃ জাকির নায়েক। 'Concept of God in May or Religions' www. banglainternet.com

১৪। Levi-Strauss. 'The Structural Study of Myth'. Source : The Journal of American Flok lore, Vol. 68, No. 270, Myth : A Symposium (Oct-Dec 1955), PP. 428-44.

১৫। Mark P.O. Morford & Robert J. Lenardon. 'Classical Mythology'. Seventh Edition, New York, Oxford university Press, 2003.

১৬। M. H. Abrams. 'A glossory of Literary Terms'. Seventh Edition. Thomson Learning, 1999, USA.

১৭। রাহুল সাংকৃত্যান। 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা'। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, www.amarboi.com.

১৮। 'আবহমান'। ১ম বর্ষ ৩য় সংখযদ্ধা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, ঢাকা।

১৯। 'বৈশাখী'। বৈশাখ ১৪২১, বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা।

২০। 'কবিতা প্রতিমাসে'। কবি আল মাহমুদ সংখ্যা। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা। প্রতিভাস, কলকাতা, জুলাই ২০০৫

২১। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রধান সম্পাদক)। 'বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। অখণ্ড। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০।

২২। কাজী রফিকুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা)। 'বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুকী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান'। প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমী ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪।

২৩। 'আকাদেমি বানান অভিধান'। সপ্তম সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জুলাই ২০০১।

২৪। 'সংসদ বাংলা অভিধান'। পঞ্চম মুদ্রণ। সাহিতয সংসদ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।

২৫। 'Students Favourite Dictionary" (English to Bengali and English). Twenty Fifth Edition Edited by Jyotibhusan Chaki. Reprin July 2000.

Kwe †gwnZ P‡Ævcva¨vq I Zvi wbewPZ KweZvi wbweo-cvV I we‡k-lY

¯ivR Kgvi `vk

†gwnZ P‡Ævcva¨vq gL¨fv‡e bvU¨Kvi, m² fv‡e KweZv| KweZv‡ZB Zvi mwnZ¨-Rxe‡bi nv‡Z Lwo| wZwb ÔKweZvÕ, ÔKwËevmÕ-G wbqg K‡i KweZv wjL‡Zb| wKš †m c_ cwinvi K‡i wZwb bvUK iPbvq gb w`‡jb| GKwaK mvwrKv‡i wZwb evievi D‡j-L K‡i‡Qb, KweZvB Zvi bvUK iPbvi †ciYv| KweZvi mi" Mwj‡Z Zvi g‡bi PjgvbZv m¤úYfv‡e weKwkZ n‡"Q bv e‡jB bwK bvU¨-cKi‡Yi PIov c‡_ Zvi cv evov‡bv| wZwb GKwU mv¶vrKv‡i Rwb‡q‡Qb :

ÒAwg †h ai‡Yi bvUK wjwL Zv‡Z Kweg‡bi Aeva wePiY _v‡K| bvU‡Ki kvm-ckv‡m KweZvi cvY KYv _v‡K| ZvB KweZv Awg †Zv †Q‡o w`jvg bv - KweZv‡K bvU‡Ki g‡a¨ wgwk‡q w`jvg| ... ZvB Avgvi bvUK, Avgvi KweZ‡K AvM‡j †i‡L‡Q|Ó

(KweZv - Avgvi bvU‡K we‡kl BÜb: †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi m‡½ Aši½ K_v e‡j‡Qb DËg `vk, KwËevm, Gwcj-Rb 2005| cbg`Y : Ab¨gb - 8, cKvkKvj - †m‡Þ¤i 2010, c":-39)

KweZv Kxfv‡e bvU‡Ki kvm-ckv‡m Qwo‡q Av‡Q Zvi cgvY wgj‡e Zvi iwPZ GKwU bvU‡Ki wKQUv msjvc Z‡j ai‡j| †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi GKwU we‡kl cwiwPZ GKv¼ bvUK Ôwdwb·Õ| Ôwdwb·Õ-Gi j‡iÝ bvgK GKwU Pvi‡Îi wKQUv msjvc wb‡P D×Z nj:

ÒAÜKvi ^¯wiYx| m‡hi mg¯ kixiUv Mvm Ki‡Q| Gevi m½g| mh fxlY Aemb| e¨wfPvi Ii me kw³ ï‡l wb‡"Q, GKU GKU K‡i aŸsm Ki‡e| mhUv wM‡j †dj‡Q| AvR I‡K nvi‡Z cvi‡e bv| MwYKvi †c‡Ui Dci †_‡K I †b‡g Avm‡e Avi Zwb Pviw`‡K Av‡jv Avi Av‡jv| me wKQi †k‡l me mgq Av‡jv| D×ZvskwU cvV Ki‡j g‡b nq GB bvU¨-msjvcwU †Kv_vI †hb enËi As‡k Kve¨vbf‡ei Kv‡Q FYx n‡q Av‡Q|Ó

1934 mv‡ji 1jv Rb, evsjv‡`‡ki ewikv‡j †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi Rb¨| wcZvi bvg b‡M›`bv_ P‡Ævcva¨vq, gvZv †iYKv †`ex| ewikv‡jiB eR‡gvnb we`¨vj‡q Zvi †jLvcovi mÎcvZ| 1947 mv‡j wZwb KjKvZvq Av‡mb I wPrci e‡qR ¯‹j wZwb Aóg †kwY‡Z fwZ nb| 1952 mv‡j wmwU K‡j‡R (DËi KjKvZvi) evsjv Abv‡m fwZ nb| Gici cvB‡f‡U Gg.G. cvk K‡ib 1958 mv‡j| 1954 mv‡j AvqKi `ß‡i PvKwi Rxe‡bi mÎcvZ| c‡i Rv½ci K‡j‡Ri Aa¨vcK nb 1959 mv‡j| wZwb Avb›`‡gvnb K‡j‡RI cwo‡q‡Qb 1966 mvj †_‡K| 1975 mv‡j Zvi cwiYq nq ïKv P‡Ævcva¨v‡qi m‡½| 1991 mv‡j wZwb m½xZ bvUK AvKv‡`wg ci¯vi, 1998 mv‡j cwðge½ bvU¨ AvKv‡`wg †_‡K `xbeÜ ci¯vi cvb| 2012 mv‡ji 12 Gwcj wZwb Zvi Bn‡jŠwKK Rxe‡bi c`v †U‡b †`b| 1952 mvj †_‡K Zvi KweZv †jLvi mÎcvZ| wZwb ÔKwËevmÕ cwÎKvi Ab¨Zg m¤úv`KI wQ‡jb| Zvi c_g Kve¨Mš' ÔAvlv‡p kve‡YÕ (1956)| GQvov Ô†Mvjv‡ci wei"‡× h×Õ (1961), Ôkevav‡i †R¨vrøvÕ, ÔA¼b wkvÕ (1969), Ôfv‡jvevmv fv‡jvevmvÕ (1993) BZ¨vw` Kve¨Mš we‡klfv‡e D‡j-L‡hvM¨| evsjv KweZvi RMr †_‡K GK cKvi cZ¨fv‡e Zvi GB m‡i AvmvUv wQj evsjv KweZvi Kv‡Q GK Afvebxq wZ| Kwe mbxj M‡½vcva¨vq ZvB Av‡c K‡i e‡j‡Qb:

Ò†gwnZ KweZv †jLv †Q‡o †`Iqvq AciYxq wZ n‡jv Kve¨RM‡Zi| Ii g‡a¨ A‡bK e‡ov Kwe nevi m¤¢vebv jwK‡q wQj| ÔKwËevmÕ cwÎKvq Ii KweZv †m mgq LeB Rbwcq n‡qwQj| Ii ÔAvlv‡p kve‡YÕ, Ô†Mvjv‡ci wei“‡× h×Õ, we‡kl K‡i Ô†Mvjv‡ci wei“‡× h×Õ †m mgqKvi Zi“Y Kwe‡`i g‡a¨ GKUv Av‡jvob mwó K‡iwQj| ÔKwËevmÕ cwÎKv cKvk K‡i Avgiv ZLb KweZvi †ivgvÂUKZvi MÛx fvOvi †Póv KiwQ| bZb wKQ Kivi †gv‡n Avgv‡`i A‡b‡KiB ZLb wQj DP Mjvi w`‡K †SvK, PgKv‡bv kã e¨env‡ii †Póv| †gwn‡Zi KweZv kvš—, wbP Mjvi, wKš' †e`bvZ I AšeZx| nVvr-B †gwnZ KweZvi RMr †_‡K m‡i hvq| Ii GB m‡i hvIqv‡K Awg †g‡b wb‡Z cwiwb, Le Kó †c‡qwQjvg †mw`b|Ó

(wbQK we‡bv`‡bi Rb¨ bvUK †j‡Lwb †gwnZ - mbxj M‡½vcva¨vq, ÔM"c w_‡qUviÕ, 35 el 1g msL¨v, AvM÷-A‡±vei 2012)

GK_v wVK †h bvU¨-RM‡Z Zvi P‡j AvmvUv wQj evsjv bvU¨-mvwn‡Z¨i Kv‡Q GKUv eo evK-e`j| bv n‡j ÔKÚbvjx‡Z mhÕ, ÔgZ¨ msev`Õ, ÔK¨v‡Þb ûiivÕ-i g‡Zv bvUK¸wj‡K †cZvg bv| wKš Avgv‡`i KweZv-wccvm¯v_ci gb Zvi GB bvU¨RM‡Z P‡j AvmvUv‡K †mw`b Le GKUv fv‡jv g‡b gv Ki‡Z cv‡i wb, nq‡Zv AvRI|

Avm‡j †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi KweZvi †h GKUv wbR¯ fvlv, †mUvB Kve¨-cvVK g‡b wecj cZ¨vkvi Rb! w`‡qwQj| wZwb hw` †KejB KweZv wj‡L Zvi †MvUv RxebUv LiP Ki‡Zb, Zvn‡j I Zvi L¨wZ‡Z †Kv_vI NvUwZ coZ bv †eva nq| Kwe wkek¤ cvj †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi †jLwb m¤ú‡K e‡j‡Qb, ÒIi †jLvq Av‡Q Qwei ci Qwe, KícwZgvi m² KvR, Qvqv”QbZv|Ó Kwe ¯‡`kiÄb `Ë e‡j‡Qb, Ò†gwn‡Zi kã wbevPb I mwb‡ek eo wø"Ki, msnZ, gwRZ| kã¸‡jv cwLi g‡Zv Do‡Z Do‡Z hvq, KLbI k‡ãi Ae¯vb A¨vemvW g‡b n‡e| GUvB †gwn‡Zi wbR¯ ÷vBj| ... wPÎKí wbgv‡b Avi Dcgv ¯vc‡b wm×n¯ †gwnZ|Ó mgv‡jvPK mwgZv PµeZx e‡j‡Qb, ÒZvi me KweZvB Dcjwäi fvlv i/cÓ (†gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi KweZv: ¯MZ msjv‡ci Abfe I KjvKwZ, cgv, †gwnZ P‡Ævcva¨vq we‡kl msL¨v, gvP 2013)| †gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi K‡qKwU KweZvi wbweo cvV I we‡k-lY Ki‡jB Zv AviI ¯úó n‡q DV‡e|

†gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi Ô‡Mvjv‡ci wei"‡× h×Õ Kve¨M‡š'i bvg KweZwU Zvi ¯ívqZwbK Kve¨-Rxe‡bi †kôZg ms‡hvRb| hv ¯vfvweK, Zv ¯vfvweKB| ¯vfvweKZv Av‡m Zvi ¯fvevm× c_ a‡iB| ¯vfvweKZvi Kv‡Q Avgv‡`i %Zwi MwYZ, chw³, cwZev`, cwZ‡iva KZ †h Amnvq Zvi cgvY †g‡j GB KweZvq:

msL¨vZxZ ˆmb¨ wb‡q e_v Avùvjb Ki †Mvjv‡ci Kv‡Q
†m dU‡e mgq †nv‡j, AwMi mnvm¨ M‡Ü, gNj igYx|
nqZ ev fv‡jvevmv gvqv a‡i †Mvjvc n‡q‡Q|
e_v †Kvjvnj Ki †Kvi‡Ki Kv‡Q, e_v hvÂv Kiv, GB
cw_exi eû wKQ h‡×i AZxZ, eû ˆmb¨`j †v‡f
mvsNwZK †n‡i †M‡Q GZUK Km‡gi ` c`Z‡j|

GKUv mvgvb¨ wng †h Zvi †KviK L‡j w`‡Z cv‡i, gvbl I Zvi msL¨vZxZ ˆm‡b¨i c‡Póv Zv cv‡i bv - ÒA_P mvgvb¨ wng / `-GKwU mRj ¯ú‡k L‡j †`q †KviK cj-e| / evievi gvb‡liv †n‡i hvq evZv‡mi wkvk‡i Kv‡Q|Ó cKwZi wbR¯ wbq‡gi Kv‡Q gvb‡li wbqg †h KZ `ej †mUvB †`¨wZZ n‡q‡Q GB KweZvq| †Mvjvc GLv‡b cKwZi ¯vfvweK wbq‡gi †mB cùwUZ i/c|

g‡bi eqm Avi †`‡ni eqm GK bq| †`‡ni eq‡mi Zjbvq g‡bi eq‡m hLb cwiYwZ‡eva Av‡m ZLb gb I gb‡b †b‡g Av‡m GK Mfxi m¼U| †mB fvewUB e¨³ n‡q‡Q Ôkevav‡i †R¨vrøvÕ KweZvq| †`‡ni eq‡mi Kv‡Q †hLv‡b †R¨vrøv, g‡bi eq‡mi Kv‡Q †mLv‡b eva‡K¨i AÜKvi| †`‡ni eqm Avi g‡bi eqm mgvšivjfv‡e nvZ a‡i P‡jwb| g‡bi eqm †hLv‡b †cŠ‡Q †M‡Q †kl cv‡š, †`‡ni eqm †mLv‡b Zvi ¯vfweK MwZ‡Z A‡bK wcwQ‡q| Rxe‡bi GB `B cv‡ši ˆeixZ¨gjK Ae¯'vb I Zvi hšYv Ôkevav‡i †R¨vrøvÕ KweZvi gj K_v| †evSvi mwea‡_ mgM KweZvwUB wb‡P D×Z Kiv nj:

eqm †e‡o‡Q weR‡b Avgvi
ev‡owb mg‡q, kq‡b|
ågY Avgv‡i Wv‡Kwb ewn‡i
†R‡MwQ wK †hb Pq‡b|
nÔj bv †Zgb e‡K AvniY
Gj bv evMvb bq‡b!

cwL D‡o hvq;
cwZ‡hvwMZvq
†R¨vrøvI hvq dv¸‡b|
`qv‡i iOb
†K K‡i niY
Ngvj †K GKv Av¸‡b!

eqm †e‡o‡Q weR‡b Avgvi
ev‡owb mg‡q, kq‡b|
Agem¨vq Pv` wd‡i hvq
me †`vl GB bq‡b|

Rxe‡bi Am¤ve¨Zv m¤e n‡q I‡V ÔA¼b wk¶vÕ Kve¨M‡ši Ômij‡iLv AvKvÕ KweZvq| AwekvmUvB wekvm‡hvM¨ n‡q D‡V‡Q GLv‡b| Zvi wbR¯ ˆZwi dgjvq KZ mn‡RB Rxe‡bi RwUj A¼ wg‡j hvq| B"Qv-cwL‡K ev¯‡ei LvPvq aiv AZ mnR bq| wKš g‡bi i‡O Zxe ev¯eZv gvqvi iwOb Avfvq we"QwiZ n‡q I‡V wbZvš †Ljvi Q‡j| ZLb †m cwL Avcb B"Qvq aiv †`q †mB LvPvq:

ai"b GKUv mij‡iLv AvK‡Z wM‡q †e‡K †Mj
evKvB _vK bv ---
†MvUvKZK meR cvZv Gw`‡K †mw`‡K R‡o w`‡jB
Mv‡Qi kvLv|
Gevi GKUv cwL PvB †Zv?
†Mvcb GKUv LvPv G‡b Swj‡q w`b H AvKv Wv‡j
AvcvZZ `iRv PvB bv|
jZvcvZvi nvZQwb‡Z cwL wb‡RB D‡o Avm‡e
KvUg KUg Lvevi Lv‡e|

ZwY Le Pwc Pwc
Zwj w`‡q `iRv-‡Lvjv
LvPvUv‡Z KcvU AvKb|
†MvUv KZK `vM emv‡jB
Kv‡jv wk‡K `iRv eÜ|
wbZvšB †Ljv"Q‡j
Qwe †nvj -
LvPvq GKUv
cwL G‡jv|

ÔA¼bwkvÕ Kve¨M‡ši ÔweR AvKvÕ KweZwUI Amvavi Y| ewn¨K NvZ-cwZNv‡Z ev¯‡ei weR cwZwbqZ †f‡O hv‡"Q| †h weR Ksw µ‡Ui, †h weR e¯MZ †m weR f½i| e¯MZ weR †f‡O †M‡j Le‡ii KvM‡R Zvi msev` I‡V| wKš †h weR Abfwi Zi, ü`‡qi, fv‡jvevmvi †m we‡Ri Lei †WBwj †ccv‡i aiv c‡o bv| Zvi Ksw µU‡bm bv _vKvi Kvi‡Y K¨v‡giv‡ZI e›`x nq bv| Abfwi Zi weR KLbB AvKv hvq bv| KviY Zv e¯MZ bq, ü`‡qi Dcjwäi abt

we‡Ri Qwe? A‡b‡KB †n‡m DV‡e -
ÔAv‡Q bwK?Õ
AvK‡Z †nv‡j e¯Uv‡K †`Lv PvB †Zv!
hv‡`i N‡i †WBwj †ccvi mevB Rv‡bb -
ga¨-kZvãx‡Z wKQ †evgv dvU‡Q|
†e‡Q †e‡Q weR¸‡jv me †f‡O co‡Q|
AvK‡Z n‡j e¯Uv‡K †`Lv PvB †Zv!
mwZ¨ K_v
Av"Qv Ab¨iKg fv‡e weR AvKv hvK
Zwj wb‡q `vgvj-mvgvj †Póv PjK
i‡Oi c¨v‡jU A‡bK †kLvq|
GKUv nv‡Zi wVK Ic‡i Avi GKUv nvZ
Q‡q _vKK ---
†`L‡Z wKš we‡Ri g‡Zv|
`wU †Pv‡Li wVK Ic‡i Avi `‡Uv †PvL
†P‡q _vKK ---
fve‡Z wKš we‡Ri g‡Zv
weR fv‡O bv ---
†WBwj †ccvi me Rv‡b bv,
A‡bK Lei D‡o †eovq Pv‡`i Av‡jvq|
`Lvbv BU †e‡P †M‡jI weR n‡q hvq|
we‡Ri Qwe? ---
A‡b‡KB †n‡m DV‡e|
Avcwb AvKb|

we‡Ri wbgv‡Y †Kv‡bv B‡Ui c‡qvRb nq bv| ü`‡qi iOB cv‡i GB we‡Ri Qwe AvK‡Z|

†gwnZ P‡Ævcva¨v‡qi KweZvi GKUv eo ^ewkó¨ nj, KweZv¸wj‡Z †Zgb †Kv‡bv Kwnbx ev NUbv †bB| welq I Z‡Ëi fv‡iI fvivµvš bq| Kwe-g‡bi wbfZ c‡`‡ki Av‡jv-Qvqv †Ljv Dcjwä we”QwiZ †R¨wZi g‡Zv Zvi KweZvq n‡q I‡V Abfe‡e`¨| Zv‡K cwigvc Kiv hvq bv, we‡k-lY Kiv hvq bv, †KejB Dcjwä w`‡q Av¯v`b Ki‡Z nq| e¨vL¨vZxZ AbfwZB Zvi KweZvi fvlv‡K w`‡q‡Q ¯ZšZv| Zvi Dcgv, i‡cK, wPÎKí¸wj GgbwK kã-‡eva †mB ¯ZšZviB `wjj| D`vniY wnmv‡e cwi‡k‡l e×‡`e em m¤úvw`Z ÔKweZvÕ cwÎKvq cKwkZ Zvi GKwU KweZvi m¤úY Ask Z‡j aiv njt

QU‡Z-QU‡Z G‡mB `iRvUv eÜ KÒ‡i w`j|
evB‡i †m GZY `vD`vD KÒ‡i RjwQj
†ivÏ‡i|
ggZvq D‡Øj `wU †Pbv †Pv‡Li Kv‡Q G‡m
aŸÒ‡m coj †hb fvOv‡Pviv †cvovgwUi cZj ---
^R¨‡ôi KVv‡i gv‡Vi g‡Zv †Piv `vM mviv Mv‡q|

Zvici nvo‡Mvo-‡ei-Kiv Avi Qvj-IVv
`gov‡bv †cqviv Mv‡Qi g‡Zv SwK `vov‡jv
cvZvkY¨|
wkKo¸‡jv wfwLwi †Q‡j‡`i g‡Zv wL‡`q
gwUi AÜKv‡i MovMwo w`‡q gwU‡KB Kvgovq|
Avi †Kv‡bvg‡Z †m-I Rwo‡q ai‡jv Zvi eK
wn‡j-wjZ †c‡gi D‡Øj gZvq|

(ewói mL¨ - †gwnZ P‡Ævcva¨vq,
ÔKweZvÕ, †cŠl 1363)

KweZwUi bvg Ôewói mL¨Õ| mLv bq, mLxI bq - mL¨| mL¨ we‡kl¨I bq| mL¨ eÜZmPK GKUv m¤úK| GB iKg abstract Abfe‡e`¨gjK Ae¯'v‡K Rxeš wPÎj PwiÎ K‡i †Zvjvi GB Awfbe cqvm ` wkíx Kwei n¯ve‡jcb wfb m¤e bq| †mB mv‡_ mv‡_ Av‡Q wZbwU Dcgv-LwPZ wPÎKí -

1| aŸÒ‡m coj †hb fvOv‡Pviv †cvovgwUi cZj ---
^R¨‡ôi KVv‡i gv‡Vi g‡Zv †Piv `vM mviv Mv‡q|
2| Zvici nvo‡Mvo-‡ei-Kiv Avi Qvj-IVv
`gov‡bv †cqviv Mv‡Qi g‡Zv S‡K `vov‡jv
cvZvkY¨|
3| wkKo¸‡jv wfwLwi †Q‡j‡`i g‡Zv wL‡`q
gwUi AÜKv‡i MovMwo w`‡q gwU‡KB Kvgovq|

^R¨‡ôi KVvi, †cqviv Mv‡Qi g‡Zv nvo‡Mvo-†ei-Kiv Avi Qvj-IVv Ae¯v, wfwLwi †Q‡j‡`i g‡Zv wkK‡oi Ae¯vb BZ¨vw` wPÎj cs³ iPbv Kiv GKRb mvaviY Kwei c‡¶ m¤e bq| ZeI Zvi LZL‡Z cvi‡dKwb÷ gb †K‡bv †h KweZvq meK_v bv ej‡Z cvivi hšYvq

e¨w_Z n‡q I‡V, Zv †evSv hvq bv| Avm‡j †h‡Kv‡bv fv‡jv KweiB cavb j¶ †eva nq GB AZß †_‡K hvIqv| †gwnZ P‡Ævcva¨vq †mB Rv‡Zi Kwe| ZvB Zvi GB KweZv iPbv Kivi UvK †_‡K wb‡R‡K mwi‡q †bIqvUv wbtm‡›`‡n evsjv KweZvi Kv‡Q GK weivU ¶wZ|

mnvqK cÎ-cwÎKv

1. Ab¨gb - 8, cKvkKvj - †m‡Þ¤i 2010 wL÷vã|
2. MYbv, AvUPwj-k el, wØZxqmsL¨v, gvP-Gwcj 2012 wL÷vã|
3. M“c w_‡qUvi, 35 el c_g msL¨v, 2012 wL÷vã|
4. cgv, †gwnZ P‡Ævcva¨vq we‡kl msL¨v, 2013 wL÷vã|

অলঙ্কার-এর সহজপাঠ

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

মানুষের ভাষা হল ভাবের বাহন। ভাষার মধ্য দিয়ে ভাব সুন্দর ও সার্থক করে প্রকাশ করার জন্য শব্দ ও অর্থগত যে সব শিল্প কৌশল সাহিত্যে অবলম্বন করা হয় সেগুলিকে একত্রে অলংকার বলা হয়। অলংকার সাহিত্যকে দুভাবে সজ্জিত করে—শব্দ ব্যবহার ও অর্থসৃষ্টিতে। একটি বিশেষ শব্দের কৌশলের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অথবা শব্দের ব্যবহৃত ধ্বনিতে মাধুর্য সৃষ্টি করে রচনা করা হয় শব্দালংকার এবং ভাবের বৈচিত্র সম্পাদন করে অর্থকে তাৎপর্যময় করে তোলে অলংকার তার নাম অর্থালংকার। সুতরাং অলংকার দুই ধরনের—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকার শিল্পের বাইরের বস্তু যা শিল্পের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করে এবং অর্থাংলকার হল সাহিত্যের ভিতরের বস্তু বা অর্থের ভাব সৌন্দর্য্য গড়ে তোলে।

শব্দালঙ্কার ঃ

(১) শ্লেষ ঃ—একটি শব্দকে যখন একাধিক অর্থে একবার ব্যবহার করা হয় তখন যে অলংকার সৃষ্টি বা ব্যঞ্জিত হয় তাকে শ্লেষ অলংকার বলে। যেমন —

ক) 'কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'

—এখানে 'ঈশ্বরগুপ্ত' শব্দটি কেবলমাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এর দুটি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে—'ভগবান অপ্রকাশিত' ও 'কবি ঈশ্বর গুপ্ত অর্থে'। আবার 'প্রভাকর' শব্দটি কেবলমাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এরও দুটি অর্থ দ্যোতিত হচ্ছে—'সূর্য' ও কবি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা'।

খ) 'মধুহীন করো নাগো তব মন কোকোনদে' —এখানে 'মধু' শব্দটি একবার 'কবি মধুসূদন দত্ত' অর্থে প্রকাশ পাচ্ছে, আবার 'মিষ্টরস' তার্থেও প্রকাশ পাচ্ছে।

বলাবাহুল্য শব্দটি না ভেঙে একাধিক অর্থে প্রয়োগ করলে 'অভঙ্গ শ্লেষ' হয়। উপরিউক্ত উদাহরণ দুইটি এই শ্রেণীর। কিন্তু কোন শব্দকে না ভেঙে যখন একটি অর্থ পাওয়া যায় এবং ভাঙলে আরেকটি অর্থ পাওয়া যায় তখন হ 'সভঙ্গ শ্লেষ'। যেমন—'অপরূপ রূপ কেশবে'—এই বাক্যটিতে 'কেশবে' শব্দটি দুটি অর্থ প্রকাশ করছে—একবার শব্দটিকে না ভেঙে অর্থ পাওয়া যায় 'কৃষ্ণ' হিসাবে। অন্যক্ষেত্রে শব্দটিকে ভাঙলে অর্থ দাঁড়ায় 'শবের উপর কে' (শব অর্থাৎ শির)

(২) যমক ঃ —একই শব্দ একাধিক অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হলে 'যমক' অলংকার হয়। যেমন—

ক) 'পাইয়া চরণতরী তরী ভবে আশা' —এখানে 'তরী' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথমটির অর্থ নৌকা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ 'ত্রাণ' বা 'মুক্তি' পাওয়া।

খ) 'কোথা হা অন্ত চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি'—এখানে 'বসন্ত' শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একবার 'ঋতু' অর্থে, অন্যবার 'রোগ' অর্থে।

অনেক সময় যমক অলংকারে দুটি শব্দের মধ্যে একটি নিরর্থক হয়। অবশ্য নিরর্থক শব্দটি সম্পূর্ণ শব্দ না হয়ে শব্দাংশ হয়ে থাকে। যেমন—'আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়ে।'—এখানে 'তারিণী' শব্দে 'রিণী' অংশের সংগে 'ঋণী শব্দটির যমক হয়েছে। কিন্তু 'রিণী' এই শব্দাংশটি অর্থহীন। এই ধরনের উদাহরণকে অনেক যথার্থ যমক বলে মেনে নিতে চান না।

প্রসঙ্গত এই দুই অলংকারের একটা তুলনা করা যেতে পারে। শ্লেষও যমক অলংকারে একই শব্দ একাধিক অর্থে প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্লেষে শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়। এবং যমকে শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। শ্লেষ অলংকারটি দুভাবে হতে পারে কিন্তু যমক অলংকারের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই।

(৩) অনুপ্রাস ঃ—কবিতায় ব্যবহৃত শ্রুতিমধুর ও ধ্বনিমণ্ডিত অলংকারকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে যখন এমন ব্যবহার করা হয় যার ফলে রচনার মধ্যে শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়, তখন হয় অনুপ্রাস অলংকার। অনুপ্রাস অনেক ধরনের আছে। বাংলায় সাধারণত তিন ধরনের অনুপ্রাস দেখা যায়—

(ক) অন্ত্যানুপ্রাস

(খ) বৃত্তানুপ্রাস

(গ) ছেকানুপ্রাস

(ক) অন্ত্যানুপ্রাস ঃ—কবিতার একটি চরণের শেষের ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে যখন পরবর্তী চরণের শেষের ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের মিল রচনা করা হয় তখন হয় অন্ত্যানুপ্রাস। যেমন—

ক) 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।।

—এখানে প্রথম চরণের শেষে ব্যবহৃত 'মান' ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের শেষে ব্যবহৃত 'বান' ধ্বনিগুচ্ছের অনুপ্রাস হয়েছে। অন্ত্যানুপ্রাসের একটি চমৎকার উদাহরণ রচনা করেছেন **বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ**—'আসে গুটি গুটি **বৈয়াকরণ**/ধুলা ভরা দুটি **লইয়া চরণ**।—এখানে প্রথম চরণের 'বৈয়াকরণ' শব্দটির ধ্বনির সঙ্গে পরবর্তী চরণের 'লইয়া চরণ' এই সমগ্র অংশের অনুপ্রাস হয়েছে।

(খ) বৃত্তানুপ্রাস ঃ—একটি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি একাধিক বার ব্যবহৃত হয় অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছ যুক্তভাবে বা আলাদাভাবে অনেকবার ব্যবহৃত হয় তাহলে হয় বৃত্তানুপ্রাস। যেমন—

ক) 'না**হি** চা**হি নিরা**পদে **রা**জভোগ তব'

—এখানে 'হ' ধ্বনিটি দুবার এবং 'র' ধ্বনিটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

খ) '**কেতকী কেশ**বে **কেশ পাশ ক**র **সু**রভি'

—এখানে 'ক' ধ্বনিটি পাঁচবার এবং 'শ' ও 'স' ধ্বনি একত্রে চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) 'নন্দপুর চন্দ্রবীণা বৃন্দাবন অন্ধকার'

—এখানে 'ন্দ' ধ্বনিগুচ্ছ এবং 'ন্ধ' ধ্বনিগুচ্ছ পরস্পর মিল রেখে মোট চারবার ধ্বনিত হয়েছে।

(গ) ছেকানুপ্রাস ঃ—দুটি ব্যঞ্জননধ্বনি যুক্তভাবে বা আলাদাভাবে কেবলমাত্র দুবার ধ্বনিত হলে ছেকানুপ্রাস অলংকার হয়। যেমন— ক) 'এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা'—এখানে 'ন্ধ' ধ্বনি গুচ্ছটি কেবলমাত্র দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধ্বনিগুচ্ছটি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত।

খ) 'শেফালী রায়ের সঙ্গে আমার একফালিও পরিচয় নহে।'—এখানে 'ফালি' ধ্বনিগুচ্ছকে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন স্বরধ্বনির অনুপ্রাস হয় না এমন যথার্থ নয়। বাংলা কাব্যে স্বরধ্বনির অনুপ্রাসের উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। অনুপ্রাস রচনার ক্ষেত্রে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত উদাহরণ ঃ

'ঝরণা ঝরণা সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উদাহরণ ঃ

'দীঘির কালো জলে
সাঁঝের আলো ঝলে।'

—এমনকি রবীন্দ্রনাথ এমন একটি অনুপ্রাস রচনা করেছেন যেখানে পূর্ববর্তী চরণের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে পরবর্তী চরণের প্রতিটি শব্দের অন্ত্যমিল রচিত হয়েছে। যেমন—

'গগনে ছড়ায়ে এলো চুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।'

এই ধরণের অনুপ্রাসকে অনেকে সর্বানুপ্রাস বলে থাকেন।

(৪) বক্রোক্তি ঃ—কোন কথায় বক্তা যা বলতে চাইছেন শ্রোতা যদি তা না ধরে অন্য অর্থ মনে করেন অর্থাৎ বক্তব্যকে বক্তা যদি সরাসরি প্রকাশ না করে বক্রো বা বাঁকাভাবে বা ঘুরিয়ে বলেন তখন হয় বক্রুক্তি অলংকার। এই অলংকার দুই ধরণের—

(১) শ্লেষ বক্রোক্তি এবং (২) কাকু বক্রোক্তি।

শ্লেষ বক্রোক্তি ঃ—এই অলংকারে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে একটি শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। যেমন—

'প্রশ্ন—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?
উত্তর—সুরে না সেবিলে কেবা মুক্ত হয়।'

—এখানে সহজেই আমরা বুঝতে পারি প্রশ্ন করা হল ব্রাহ্মণ হয়ে কেন মদে আসক্ত। কিন্তু উত্তর এল সুরাসক্তে মুক্তি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে দুভাবে ভাঙা হয়েছে—

সুরা + আসক্ত = সুরাসক্ত (সুরা অর্থাৎ মদ)
সুর + আসক্ত = সুরাসক্ত (সুর অর্থাৎ দেবতা)

কাকু বক্রোক্তি ঃ—কাকু শব্দের অর্থ স্বরভঙ্গি। এই অলংকারটি বক্তার বলার ভঙ্গি বা কণ্ঠধ্বনির ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এর ফলে 'হ্যাঁ' অর্থাৎ ইতিবাচক কথা 'না' অর্থাৎ নেতিবাচক হয়ে যায়। আবার বিপরীতও হতে পারে। এ-জাতীয় বক্রোক্তি অলংকারকে কাকু বক্রোক্তি বলে। যেমন—

ক) 'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারি রাঘবে'—এখানে ভিখারী রাঘবকে ভয় না করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নি, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিতে সেই নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

খ) 'বজ্রে যে জনা মরে
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ
সে বংশে কেবা করে'।—এখানে 'কেউ করে না' এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে।

অর্থালংকার

উপমা

উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ তুলনা। দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়। তবে তাদের সাধারণ ধর্ম এক। এমন অবস্থায় তাদের মধ্যে যদি সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে হয় 'উপমা' অলংকার। যেমন—

'চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।' (রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে 'আলো' এবং 'আশা' বিজাতীয় শব্দ, এদের সাধারণ ধর্ম কম্পন। তাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং একটি এটি 'উপমা' অলংকার।

উপমা প্রধানত পাঁচ প্রকারের—

ক) পূর্ণ উপমা।

খ) লুপ্ত উপমা।

গ) মালোপমা।

ঘ) বস্তু প্রতিবস্তুভাবের উপমা।

ঙ) বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উপমা।

(ক) পূর্ণ-উপমা ঃ—যে উপমার তুলনা করার চারটি অঙ্গ অর্থাৎ উপমান, উপমেয়, সাধারণধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় তাকে পূর্ণ উপমা বলে। যেমন—

ক) 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।'

—এখানে 'রাঙ্গা বাস' পরিহিত নারীর সঙ্গে যোগিনীর তুলনা করা হয়েছে। এদের সাধারণ ধর্ম নৈমিত্তিক জীবনের প্রতি বিবাগী হওয়া, এখানে 'আহারে বিরতি', এবং তুলনাবাচক শব্দ 'যেমত'। অর্থাৎ 'রাধিকা' উপমেয়, উপমান 'যোগিনী', 'বৈরাগ্য' সাধারণ ধর্ম এবং 'যেমতি' তুলনাবাচক শব্দ।

উদাহরণ ঃ—খ) 'ননীর মত শয্যা কোমল পাতা'। —এখানে 'শয্যা' উপমেয়, 'ননী' উপমান, তুলনাবাচক শব্দ 'মতন' এবং সাধারণধর্ম 'কোমল'।

(খ) লুপ্ত উপমা ঃ—যে উপমায় উপমেয়কে ঠিক রেখে বা উপমেয়কে বর্তমান রেখে উপমান, তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণধর্ম—এই তিনটির মধ্যে একটি, দুটি অথবা তিনটি লুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে লুপ্ত-উপমা বলে। যেমন—

ক) 'কমল দল জল জীবন টলমল'।

—এখানে তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত হয়েছে।

খ) 'কন্টক গাড়ী কমল সম পদতল।'

—এখানে সাধারণ ধর্ম 'কোমলতা' লুপ্ত।

গ) 'তড়িত বরণী হরিণ নয়নী,
দেখিনু আঙিনা মাঝে।'

—এখানে উপমান, তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম তিনটিই লুপ্ত। কেবল 'তড়িত বরণ' ও 'হরিণ নয়নী' এই উপমেয়কে পাওয়া যাচ্চে।

(গ) মালোপমা ঃ—যে উপমা অলংকারে একটি উপমেয়ের সঙ্গে অনেকগুলি উপমান থাকে, তাকে মালোপমা বলে। যেমন—

'তোমার সে চুল
জড়ানো সুতোর মতন নিশিথের মেঘের মতন।'

—এখানে উপমেয় একটি —'চুল', কিন্তু উপমান দুটি 'জড়ানো সুতো' এবং 'নিশিথের মেঘ'।

(ঘ) বস্তু প্রতিবস্তুভাবের উপমা ঃ —উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের তুলনার সময় যদি সাধারণ ধর্মকে দুভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তাহলে তাদের একটিকে বলা হয় 'বস্তু' অপরটিকে 'প্রতিবস্তু'। এই ধরণের উপমাকে বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা বলে। এই ধরনের অলংকারে তুলনাবাচক শব্দ অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। যেমন—

'নিশাকালে যথা
মুদিত কমলদলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত।'

—এখানে উপমেয় 'প্রেম', উপমান 'সৌরভ'। সাধারণধর্ম দুভাবে বিভিন্নভাষায় প্রকাশিত হয়েছে— 'গুপ্তভাবে এবং 'অন্তরিত'। তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'।

(ঙ) বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উপমা ঃ—যেখানে উপমান এবং উপমেয়ের দুটি পৃথক ধর্ম থাকে অথচ তাদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায় তখন সেই দুটি ধর্মের একটিকে বলা হয় 'বিম্ব' এবং অপরটিকে বলা হয় 'প্রতিবিম্ব'। এইভাবের উপমাকে বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উপমা বলে। যেমন—

' কানুর পিরিত বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া ওঠে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে।।'

—এখানে উপমেয় 'কাণুর পিরিতি' এবং উপমান 'শঙ্খ বণিকের করাত'। এদের দুটি পৃথক সাধারণ ধর্ম—'পাঁজর ফাটিয়া ওঠে' এবং 'আসিতে যাইতে কাটে'। কিন্তু উভয়ের অবস্থাই বেদনাময়। এই ধরণের অলংকারই হল বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা। তুলনাবাচক শব্দ এখানে 'যেমতি'।

রূপক ঃ—উপমেয় ও উপমানের মধ্যে তুলনার ভাবটি অস্বীকার করে দুটির মধ্যে অভেদ সম্পর্ক কল্পনা করা হইলে 'রূপক' অলংকার হয়। যেমন—

'ফুটায় মনে কি মন তোর খুশির শতদল।'

—এখানে উপমেয় 'খুশি' এবং উপমান 'শতদল' উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

রূপক অলংকার প্রধানত চার প্রকার

ক) নিরঙ্গ রূপক

খ) স্বাঙ্গ রূপ

গ) পরম্পরিত রূপক

ঘ) অধিকারূর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রূপক।

নিরঙ্গ রূপক আবার দু প্রকার—'কেবল' এবং 'মালা'।

(ক) নিরঙ্গ কেবল রূপক ঃ—একটি উপমেয়ের সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে এই নিরঙ্গ কেবল রূপক অলংকার হয়। যেমন—

'এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

—এখানে উপমেয় একটি 'মানব' উপমানও একটি 'জমিন' এদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

নিরঙ্গ মালারূপক ঃ—যে নিরঙ্গ রূপকে উপমেয় একটি কিন্তু উপমান একাধিক থাকে তাকে নিরঙ্গ মালা রূপক বলে। যেমন—

ক) 'শেফালী সৌরভ আমি রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।'

—এখানে উপমেয় একটি 'আমি' এবং উপমা তিনটি—'শেফালীর সৌরভ', 'রাত্রি নিশ্বাস' ও 'ভোরের ভৈরবী'।

খ) 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, দূরদৃষ্ট,
দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁচা।'

—এখানে উপমেয় 'আমি' এবং উপমান পাঁচটি —'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দূরদৃষ্টি', 'দুঃস্বপ্ন', 'করলগ্ন কাঁটা'।

স্বাঙ্গ রূপক ঃ—যে রূপক অলংকার উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনার সাথে তাদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেও অভেদ কল্পনা করা হয় তাকে স্বাঙ্গ রূপক বলে। যেমন—

ক) 'বক্ষ বীণায় বেদনার তার

এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার।'

—এখানে 'বক্ষ' উপমেয় এবং উপমান 'বীণা'। কিন্তু 'বক্ষের বেদনার' এবং 'বীণার তারের' অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তাই এটি স্বাঙ্গ রূপক।

খ) 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে,
শোভিল চৌদিকে সুর সুন্দরী রূপে
বামাকুল, মুক্ত কেশ মেঘমালা, ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমুতমন্দ্র হাহাকার রব।'

—এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের সাঙ্গ রূপক হয়েছে। শোকের আধার 'বামাকুল' এবং তার প্রকাশ 'মুক্ত কেশ', 'ঘন নিঃশ্বাস', 'অশ্রুবারি ধারা', ও 'হাহাকার রবের' সঙ্গে 'মেঘমালা', 'প্রবলবায়ু', 'আসার', ও 'জীমুত মন্দ্রের' অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

পরম্পরিত রূপক ঃ—যখন একটি রূপক অলংকার অন্য একটি রূপক অলংকার সৃষ্টির কারণ হয় তখন তাকে পরম্পরিত রূপক বলে। এখানে দুটি রূপকের কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। যেমন—

'শ্যাম সুখ পাখি সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়ন ফাঁদে
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকল বেঁধে।'

—এখানে 'শ্যাম'কে 'সুখপাখি' বলে রূপক করার কারণেই 'নয়ন', 'হৃদয়' ও 'মনকে' যথাক্রমে 'ফাঁদ', 'পিঞ্জর' ও 'শিকল' বলে রূপক করা হয়েছে, এদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের বদলে কার্যকারণ সম্পর্কে আছে।

অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রূপক ঃ—উপমানে কোন অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করে (অধিকারূঢ়) তারপর তাকে যদি উপমেয়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয় তাহলে হয় অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার। যেমন—

'ও জলধর অঙ্গ
ইহথির বিজুরি তরঙ্গ।'

—এখানে 'ও অঙ্গ' অর্থে 'কৃষ্ণ' এবং 'হই' অর্থে 'রাধা'। কিন্তু রাধার সঙ্গে বিজুরি অর্থাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গের অভেদ কল্পনা করার আগে বিদ্যুৎকে স্থির বলে কল্পনা করা হয়েছে যা অসম্ভব।

উৎপ্রেক্ষাঃ—অত্যধিক সাদৃশ্যের জন্য যখন উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় জাগে তখন হয় উৎপ্রেক্ষা অলংকার। উৎপ্রেক্ষা দুরকমের—

১) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও ২) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ঃ—মনের সংশয় যখন 'মেন', 'যথা', প্রভৃতি সম্ভবনাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন হয় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। যেমন—

ক) 'অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর।
রৌদ্রে পোহায়ইছে শুয়ে।'

—এখানে উপমেয় 'বালুচর' এবং উপমান 'দীর্ঘ জলচর', 'যেন' শব্দটি 'বালুচর' অর্থাৎ উপমেয়কে 'দীর্ঘ জলচর' বলে সন্দেহ জাগাচ্ছে।

খ) 'পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের পরে

যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।'

—এখানে 'দু ফোঁটা অশ্রুকে' 'বাল্মীকির শ্লোক' বলে সন্দেহ জাগাচ্ছে।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ঃ—উৎপ্রেক্ষা অলংকারে যখন 'যেন' 'যথা' প্রভৃতি সম্ভবনাবাচক শব্দ থাকে না, সম্ভাবনাময় ভাবটি অণুমান করে নিতে হয়, তখন হয় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার। যেমন—

'একখানি মাঠ শোভে জলমগ্ন মাঠে
গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা গগন ললাটে।'

—এখানে 'যেন' এই সম্ভবনাবাচক শব্দটি নেই, কিন্তু 'জলমগ্ন মাঠের' গ্রামটি 'গগনের ললাটে গঙ্গা মৃত্তিকা বা গঙ্গামাটির ফোঁটা বলে মনে হচ্ছে।

অতিশয়োক্তি ঃ—উপমান যখন উপমেয়কে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে বা গ্রাস করে তখন হয় অতিশয়োক্তি অলংকার। উপমা অলংকারে উপমান ও উপমেয় দুইই থাকে। রূপকে এদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়। ব্যতিরেকে এদের একটিকে অপরটির চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখানো হয়। এবং অপহ্নুতিতে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমান প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। কিন্তু অতিশয়োক্তিতে উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে। যেমন—

'সাগরে যে অগ্নি থাকে, কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

—এখানে উপমান 'সাগর' ও 'অগ্নি' উপমেয় 'বিদ্যাসাগর', ও 'তাঁর মনের তেজ' কিন্তু এখানে দুটি উপমেয়কেই উপমান 'সাগর' ও 'অগ্নি' ঢেকে রেখেছে। এই ধরনের অলংকারকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার।

স্বভাবোক্তি অলংকার ঃ—কবি যখন তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে কোন বস্তুর নিজস্ব লক্ষণগুলিকে আবিষ্কার করে এমনভাবে প্রকাশ করেন যাতে বস্তুটি আপন স্বকীয়তায় সুন্দর হয়ে ওঠে তখন হয় স্বভাবোক্তি অলংকার। তাই স্বভাবোক্তিকে Description of Nature বলা যায় না। যেমন—

'কপোত দম্পতি
বসি শান্ত, অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু চুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন'

—এখানে কবি প্রেম বিহ্বল কপোত কপোতী যে চম্পকের ডালে শান্ত এবং অকম্পিত। কবি দৃষ্টির এই সূক্ষ্মতা স্বভাবোক্তি অলংকারের বৈশিষ্ট্য।

অপহ্নুতি ঃ—উপমেয়কে অস্বীকার করে যখন উপমানকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় তখন হয় অপহ্নুতি অলংকার (অপহ্নব কথাটির অর্থ নিষেধ বা অস্বীকার)। যেমন—

'ও নহে গগন সুনীল সিন্ধু
তারার পুঞ্জ নহে ও ফেনার রাশি।'

—এখানে উপমেয় 'গগন' ও 'তারার পুঞ্জ'কে অস্বীকার করে উপমান 'ফেনার রাশিকে' প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। এই অলংকারে 'না', 'নহে', 'ছলে' ইত্যাদি অস্বীকার বাচক অব্যয় ব্যবহার করা হয়।

ব্যতিরেক অলংকার ঃ—উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করে দেখালে হয় ব্যতিরেক অলংকার। এই অলংকারে তুলনাবাচক 'মত', 'চেয়ে' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন—

'অকলঙ্ক মুখ তব, কলঙ্কী চন্দ্রের মত নহে।'

—এখানে 'মুখ' উপমেয়, 'চাঁদ' উপমান, 'মুখকে অকলঙ্ক বলায় তা কলঙ্কী চাঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনেক সময় তুলনাবাচক শব্দ থাকে না, তার পরিবর্তে 'জিনি', 'নিন্দিত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার এ জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার না করে কৌশলে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বোঝান হয়ে থাকে। যেমন—

ক) 'জিনি অকলঙ্ক বিধুবদন উমার'।

খ) 'বাহু তার মৃণাল নিন্দিত।'

গ) 'কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।'

ভ্রান্তিমান অলংকার ঃ—উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে যখন নিবিড় সাদৃশ্য থাকে তখন উভয়ের প্রভেদ নির্ণয় করতে না পেরে ভূল করে উপমেয়কে উপমান বলে মনে করা হয়। কাব্যে এই ধরণের অলংকারকে বলে ভ্রান্তিমান অলংকার। কোন সাধারণ ভ্রমে এ অলংকার হয় না। যেমন—

'রাত্রিতে দড়িকে সাপ বলে ভূল করা।' —মনে রাখা প্রয়োজন 'ভ্রান্তিমান' ও 'উৎপ্রেক্ষার মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমান বলে যে সংশয় হয় তা সচেতনতা প্রসূত। কিন্তু ভ্রান্তিমানে উপমেয়কে উপমান বলে ভূল করা হয়। কারণ তাদের পার্থক্য সম্পর্কে কোন সচেতনতা থাকে না। যেমন—

'দেখ সখে উৎপলাক্ষী
সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশনে
জলে কুবলয় ভ্রমে
বারবার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন।'

—এখানে 'অক্ষি' উপমেয়, উপমান 'কুবলয়' চোখের সঙ্গে পদ্মের নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চোখকেই 'পদ্ম' বলে ভূল করা হচ্ছে। পদ্মাক্ষি নারী জলে তার চোখে প্রতিবিম্ব দেখে তাকে পদ্ম বলে ভূল করে তুলবার চেষ্টা করছে।

অর্থান্তরন্যাস ঃ—সামান্যের দ্বারা বিশেষ বা বিশেষের দ্বারা সামান্য অথবা কার্য্যের দ্বারা কারণ যদি সমর্থিত হয় তাহলে হয় অর্থান্তরন্যাস অলংকার যেমন—

'হেন সহবাসে
হে পিতৃত্ব বর্বরতা কেননা শিখিবে?
গতি যার নিচসহে নিচ সে দুমতি।'

—এখানে 'নীচ' ব্যক্তির সঙ্গে মিশে নীচ হয়ে যাওয়া সামান্য বা সাধারণ নিয়ম। নীচ 'রামে'র সঙ্গে থেকে 'বিভীষণে' রক্ত নীচ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এই অর্থে এটি অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

দৃষ্টান্ত অলংকার ঃ—এটি একটি তুলনাবাচক অলংকার। এই অলংকারের তিনটি বৈশিষ্ট্য —

১) উপমেয় ও উপমান দুটি পৃথক বাক্যে থাকে।

২) সাধারণ ধর্ম তাৎপর্যে এক না হলেও ভাব সাদৃশ্যে এক মনে হয়।

৩) তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না। যেমন—

'সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।
আঁধার জগত, যায় ঘন আবরিলে
দীননাথে।'

—এখানে 'সভাজন' উপমেয় এবং 'জগত' উপমান দুটি পৃথক বাক্যে রয়েছে। সাধারণ ধর্ম 'দুঃখী' ও 'আঁধার' শব্দ দুটিতে ভাব সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে। যদিও তাদের তাৎপর্য এক নয়। আবার 'রাজা' উপমেয় এবং দীননাথ' উপমান। সাধারণ ধর্ম 'দুঃখ' ও '(ঘন মেঘ)' শব্দ দুটি থেকে আগের মতই একই ভাব ফুটে উঠেছে। অথচ উদ্বৃতাংশটিতে কোন তুলনাবাচক শব্দ নেই।

বিরোধাভ্যাস বা বিরোধ অলংকার ঃ— দুটি বিষয়ের মধ্যে যখন আপতদৃষ্টিতে একটা বৈপরীত্য বা বিরোধ আছে বলে মনে হয়, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে সেই বৈপরীত্য বা বিরোধ আর থাকে না তখন হয় বিরোধাভ্যাস অলংকার। যেমন—

১) 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে"

—অর্থাৎ বড় হতে হলে ছোট হতে হবে এই উক্তির মধ্যে এটা আপাত বিরোধ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এর আর্ন্তনিহিত অর্থও উদ্ঘাটন করলে কোন বিরোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এখানে বলা হয়েছে বড় অর্থাৎ মহৎ হতে গেলে ছোট অর্থাৎ বিনয়ী হওয়া প্রয়োজন।

২) 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" (রবীন্দ্রনাথ)

৩) "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।" (গোলাম মুস্তাফা)

৪) "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লোভিব মুক্তির স্বাদ।" (রবীন্দ্রনাথ)

সন্দেহ অলংকার ঃ—যেখানে উপমান ও উপমেয় উভয় পক্ষেই সংশয় বর্তমান থাকে এবং সে সংশয় কার প্রতিভা থেকে উত্থিত হওয়ায় চমৎকারিত লাভ করে তখন হয় সন্দেহ অলংকার। যেমন—

১) "সোনার হাতের সোনার চুড়ি
কে কার অলংকার।"

—এখানে 'সোনারহাত' ও 'সোনার চুড়ি' উভয়ের মধ্যে কে কার অলংকার।

২) 'কে এই নীলবরণী?
নীল অপরাজিতা একি? কিংবা কাদম্বিনী'.

—এখানে কালীমূর্তিকে দেখে সংশয় জেগেছে যে ইনি কি 'নীলবরণী' নাকি 'অপরাজিতা' না 'মেঘ' বলা বাহুল্য এখানে একটা সন্দেহ মালা রচিত হয়েছে।

নিশ্চয় অলংকার ঃ—অপ্রকৃত বা উপমানকে নিষিদ্ধ বা অস্বীকার করে উপমেয়কে বা প্রকৃতকে প্রতিষ্ঠা করার নাম নিশ্চয় অলংকার। বলা প্রয়োজন এটি অপহ্নুতি অলংকারের বিপরীত। এই অলংকারে উপমেয়ের উপমান ভাব থাকা চাই। নতুবা অলংকার হয় না। কারণ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য না থাকলে উভয়পক্ষে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ সংশয় জাগে না। যেমন—

'অসীম নীরদ নয় ওই গিরি হিমালয়।'

—এখানে 'নীরদ' কে অস্বীকার করে উপমেয় 'হিমালয়' কে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় নিশ্চয় অলংকর হয়েছে।

HINDI VERSION

संथाली भाषा–साहित्य और जीवन का इतिहास

सुरेश सिंह मुंडा

संथाली भाषा संथाल आदिवासी की मातृभाषा है। संथाली भाषा यूरेशिया भाषा परिवार में आती है। यूरेशिया भाषा–परिवार मुख्यतः दो महादेशों में बोली जाती है। इन्हीं के आधार पर यूरेशिया (यूरोप + एशिया) पड़ा है। इस परिवार के आस्ट्रोएशियाटिक की भाषा को आस्ट्रिक या आग्नेय कहा जाता है। आस्ट्रिक शाखा के आदिवासियों की भाषा की सबसे बड़ी शाखा है। यथा संथाली, मुंडारी, हो, खरिया, कुबाड़, सबर, गुतीब, गोरूम, रेमोः गेतः निकोवारी, खासी आदि। इन भाषाओं की कुछ शाखाएँ दक्षिण–पूर्व द्वीप समूह में बोली जाती है, जिन्हें प्रोटोआस्ट्रॉलायड कहा जाता है।

संथाली भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार की महत्वपूर्ण भाषा है। यह भारत के झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्यप्रदेश राज्यों के विभिन्न भागों में अधिक संख्या में बोली जाती है। भारत के अलावा नेपाल, बंगलादेश आदि देशों में भी बोली जाती है। संथालों की अपनी स्वतंत्र भाषिक सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा होने के कारण संथाली भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का एक स्वतंत्र अस्तित्व एवं पहचान है। संथाली भाषा साहित्य के इतिहास में 22 दिसम्बर 2003 मंगलवार एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद किया जायेगा। इसी दिन संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है तथा संविधान की 22वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली।

संथाली साहित्य के इतिहास का काल विभाजन

1. वर्ष या काल के आधार पर।
2. नाम के आधार पर।

1. वर्ष या काल के आधार पर संथाली साहित्य के तीन काल है। आदिकाल, मध्य काल एवं आधुनिक काल।

आदिकाल :–सन् 1854 ई0 के पूर्व के साहित्य को आदिकाल के साहित्य 'होड़' अवतार या लोकयुग का साहित्य है। आदिकाल में संथाल लोग 'होड़' नाम से जाने जाते थे। संथालों के पूर्वज 'होड़' नाम से परिचित थे। आदिकाल का संथाली साहित्य मौखिक है। इसके मौखिक साहित्य में कहानी, गीत, गाथा, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें कुदुम आदि मिलते हैं। जिससे हमलोग साहित्य नाम से परिचित है। मानव समाज के आदिलोक की संस्कृति, परंगपरागत विश्वास, किवंदतियाँ, आचार–विचार गीत तथा कथाएँ मिलते हैं। हिन्दी का लोक शब्द 'फोक' का पर्यायवाची यब्द है। फोक एंग्लो सेक्सन शब्द है, जिसका अर्थ है जन या ग्राम। संस्कृत एवं पाली भाषा में मानव समाज का बोध जन से भी कराया गया है। फोकलोर का शाब्दिक अर्थ है ग्राम के लोगों का ज्ञान। इसी शब्द का वाच्यार्थ लोक ज्ञान या लोक विधा भी है। किसी– किसी शब्द कोश में जनश्रुति या लौकिक दंत

कथा का प्रयोग भी मिलता है। फोकलोर के लिए लोक साहित्य या लोक वाड.मय का प्रयोग होता है। संथाली लोक साहित्य में मानव की परम्परागत भावनाएँ एवं चेतनागत अभिव्यक्तियों का लेखाजोखा निहित है। प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत के संबंध में रहते हैं। संथाली आदि साहित्य लोकजीवन से जुड़ा हुआ है। संथालों के उदभ्व तथा विकास की कथाएँ इनके लोक साहित्य में मिलती हैं। संथालों के उदभ्व एवं विकास के संबध में कहा गया है कि संथालों का जन्म हिहिड़ी में हुआ है। जहॉ मनुष्यों के पूर्वज पिलचू हाड़ाम,पिलचू बुढ़ही निवास करते थें। इन दोनों की उत्पत्ति हंस एवं हंसनी के दो अण्डे से हुई थी, और उन्हीं दोनों ने मानव वंश की नींव डाली है। उदभ्व और विकास के साथ–साथ संथालों के पर्व–त्योहारों,नृत्य शैलियों तथा जीवन दर्शन् का जन्म 'हिहिड़ी–पिपिड़ी'देश में हुआ है।

जैसे – (क) जन्म संस्कार गीत से प्रभावित होता है :–

हिहिड़ पिपिड़ी रे बोन जानाम लेन

खोज कामान रे बोन खोज लेन

हारा रारता रे बोन हारा लेन

सासाड़बेड़ा रेबोन जात तालालेन।

अर्थात्–हमारा जन्म हिहिड़ी पिपिड़ी में हुआ तथा खोज कामान में, हमारा खोजबीन हुआ हाराराता में, हम बड़े हुए सासाड़ बेड़ा, हमारा जात का परिचय हुआ।

(ख) विवाह संस्कार गीत :–

तोका रे जानाम लेन दोड़ दो

धुयसाड़ रे बुसाड़लेन दोड़ दो

चिरु चाम्चा दुगदन राहेड़ रे सोरोलेन हिहिड़ी दाड़ पिपिड़ी रे

अर्थात् – कहॉ जन्म हुआ था विवाह गीत 'दोड़', कहॉ प्रसव हुआ था विवाह गीत दोड़। हिहिड़ में जन्म हुआ विवाह गीत, पिपिड़ी में प्रसव हुआ विवाह गीत।

संथाल आदि साहित्य में कई तरह के पौराणिक मिथ पाए जाते हैं यथा

तत्व शास्त्रीय मिथ, आनुष्ठानिक मिथ,सामाजिक मिथ,आख्यान मिथ आदि।

संथाली आदि कथाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है।

1) प्राकृतिक तत्वों के मानवी कारण।

2) देश, काल, पात्र और घटनाओं के अनुरुप कथा सूत्र का विकास।

3) जादू एवं जादुई शक्तियों की प्रमुखता।

4) संदेशवाहक पशु या पक्षी आदि।

आदिकाल का सहित्य अलिखित रहा है। जिसे अलिखित सहित्य कहा गया है। अलिखित साहित्य के कहानी, गीत, गाथा, कुदुम आदि सुनाने वाले अलग–अलग होते

हैं। इसलिए कहानी, गीत, गाथा, कथा आदि कई रुपों में मिलते हैं।परन्तु उनका सारांश या सार अर्थ समान है। कहानियॉ हास्यपूर्ण मनोरंजक और उपद–शात्मक होती है।अर्थात् आदिसाहित्य लोक जीवन से जुड़ा हुआ है।

मध्यकाल – सन् 1854 ई0 से सन् 1945 ई0 तक का साहित्य मध्यकाल या खेरवाड़ अवतार का साहित्य कहा जाता है। इस काल से ही संथाली साहित्य को लिखित रूप दिया गया है। सन् 1854 में संथाली भाषा के महाकवि, धर्मविद माँझी, डॉ0 रामदास टुडू रसिका, डी. लिट् का जन्म काल है। मध्यकाल का चरण डॉ. टुडू रसिका से संबंधित है। संथाली भाषा साहित्य के रूप में सन् 1882 ई0 में बांग्ला लिपि के माध्यम से प्रकाशित हुई। इसमें संथाली गीतिकाव्य तथा गाथा आदि सम्मिलित है। इन गाथा तथा गीतों से संथालों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त होता है। इस काल में सबसे अधिक विदेशी ईसाई मिशनरियों द्वारा संथाली लोकगीत, लोककथा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का संकलन तथा प्रकाशन हुआ है। रिव. पाऊप आलोक बोडिंग साहब ने संथाली भाषा और साहित्य के विकास पर अनेक पुस्तकें लिखी है।

संथाली साहित्य में मध्यकाल के इतिहास में ईसाई मिशनरियों द्वारा गीत, कहानी तथा व्याकरण पर अधिक काम हुआ है। उन्होंने संथाली लोकगीत, लोक कहानी का संकलन तथा प्रकाशन किया है। भाषा जानने के लिए संथाली व्याकरण पुस्तक का निर्माण किया है। संथाली शिक्षा साहित्य का लेखन मध्यकाल में ही आरंभ हुआ है। इस काल में संथाली लेखकों द्वारा ही रचित कविता, कहानी, नाटक आदि का प्रकाशन हुआ। सबसे पहले काव्य साहित्य में पाऊल जुझार सोरेन रचित 'ओनोड़हे' बाहा डालवा' 'फूलों की डाली' पुस्तक रोमन लिपि में सन् 1936 ई0 में बांग्ला लिपि में प्रकाशित हुई। सिहरी मुर्मू संपादित प्रथम संथाली साहित्यिक पत्रिका 'मारसाल बांग्ला लिपि के माध्यम से पूर्व सिंहभूम राजदोहा गाँव से प्रकाशित हुई है।

आधुनिक काल :– सन् 1945 से अबतक के संथाली साहित्य को आधुनिक काल या संथाली अवतार का साहित्य मानते हैं। इसी काल में संथाली शब्द का अधिक प्रचार–प्रसार हुआ है। आधुनिक काल में संथाली साहित्य का काम तीन दिशाओं में हुआ है। पहला काम–संथाली परम्परागत कहानी, गाथा, कथा, पहेलियाँ, कुदुभ, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का संकलन तथा प्रसारण। दूसरा काम–रचनात्मक लेखन यथा कविता, कहानी, गीत, उपन्यास, नाटक आदि का निर्माण तथा प्रसारण। तीसरा काम–अलोचनात्मक लेखन तथा शोध लेखन एवं प्रसारण हुआ है।

शिष्ट साहित्य– संथाली शिष्ट साहित्य का लेखन मध्यकाल से ही शुरू हुआ है। शिष्ट साहित्य के अन्तर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि आते है। आधुनिक काल के लेखकों द्वारा रचित विभिन्न विधाओं का समावेश है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य के रचनाकारों का नाम ज्ञात होता है। लेकिन लोक साहित्य के रचनाकारों का नाम अज्ञात है।

संथाली काव्य साहित्य :– कविताओं में बौद्धिकता, रसवत्ता, मर्मस्पर्शिता झलकती है। जितने भी पुस्तकें लिखि गई है। उल्लिखित पुस्तकें देवनागरी, बांग्ला, ओलचिकी, ओड़िया तथा रोमन लिपि में लिखि गई है। जहाँ तक इनकी भाषा का संबंध है, वह नई कविता की भाषा, बोलचाल की सामान्य भाषा से थोड़ी सी भिन्न है एवं कुछ कविताओं में स्थानीय भाषा हिन्दी, बांग्ला, ओड़िया तथा असमी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

संथाली नाटक साहित्य – संथाली नाटक या रंगमंच, पचास दशकों से लिखे एवं खेले जाते रहे है। सथालीं साहित्य की प्रगति का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक नाटक ही कर रहे है। संथाली भाषा के माध्यम से देवनागरी, बांग्ला तथा ओलचिकी लिपि में कई नाटक प्रकाशित हुए है।

संथाली उपन्यास – संथाली उपन्यास का लेखन आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। देश को आजादी मिलने के बाद संथाली लेखकों ने कई उपन्यास लिखे है जिससे संथाली साहित्य में नवीन परिवर्तन और विस्तार आया है। संथाली साहित्य उपन्यास में सन् 1956 ई0 प्रस्थान बिन्दु है।

संथाली कहानी – संथाली कहानी का प्रारंभ सन् 1942 ई0 सें पदार्पण होता है। जब 'मारसाल' नामक पत्रिका पूर्वी सिंहभूम से प्रकाशित हुई।

संथाल निबंध – नाटक और उपन्यास के समान संथाली निबंध का लेखन स्वतंत्रता के बाद संथाल समाज में एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के उदय का कारण बना, जिससे संथाली लेखकों ने अनेक विषयों से संबंधित निबंधों को पत्र पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। खासकर उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा, प्रचार–प्रसार राजनीतिक गतिविधि तथा राष्ट्रीय निर्माण के प्रणयन को महत्व दिया है।

व्याकरण और शब्दकोश – संथाली व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण तब हुआ जब ईसाई मिशनरियों का प्रवेश संताल परगना क्षेत्र में होने लगा। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचार–प्रसार के समय भाषा की समस्या को झेला था।

संथाली विविध साहित्य – संथाली के विविध साहित्य में ऐसे साहित्य आते हैं जो संथालों के इतिहास, संस्कृति जीवन, धर्म, रीति–रिवाज तथा पौराणिक कथाओं से से संबंधित है।

पत्रिकाएँ – संथाली साहित्य की तरह संथाली पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई है। लगभग 2000 पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई है। जिसमें 'होड़' सोम्वाद 57 वर्ष, 'पश्चिम बंगाल' 33 वर्ष, 'सिली' 23 वर्ष, 'एमेन साकवा' 20 वर्ष तथा 'चिठि साकाम' 10 वर्ष से लगातार प्रकाशित हो रही हैं।

संथाल संस्कृति :– आदिकाल से ही संथालों ने प्र.ति पूजा को अपने जीवन में विशेष स्थान और महत्व दिया है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधुघाटी की संस्कृति, लिपि, अस्त्र–शस्त्र, आभूषण, कृषि तथा घरेलू उपकरण में समानता है। संथाली संस्कृति

को जानने के लिए सथालों की सामाजिक व्यवस्था तथा पर्व–त्योहारों को जानना आवश्यक है। इस आलेख में सेक्षेप रुप में, संथाल संस्कृति पर विचार किया जा रहा है।

(क) सामाजिक व्यवस्था :– प्रत्येक संथाल गॉव में एक प्रधान 'मॉझी' होते हैं। उनकी सहायता के लिए पौराणिक,गोडेत् तथा जोगमॉझी होते हैं। कई गॉवों को मिलाकर एक 'परगना' होते हैं। संथाल समाज में वंश परंपरागत क्रमशः जोगमॉझी, मॉझी,मासमॉझी परगना,देश परगना होते हैं। ये सब विचार व्यवस्था की देख–रेख करते हैं। 'नायके' गॉव के पुजारी होते हैं। 'लोबेर', अन्तिम विचार व्यवस्था है। 'बिटलाहा' व्यवस्था में समाज से लड़कियों को निष्कासित किया जाता है। संथाल समाज पितृसत्तात्मक है। पैतृक सम्पति का अधिकारी पुरुष चर्ग ही होता है। मॉझी, नायके तथा परगना पद वंशानुक्रम से चलता है।

(ख) धार्मिक व्यवस्था – धार्मिक प्रधान को नायक कहते हैं। संथाल जाति प्रकृति पूजक है और 'सरना' धर्मावलंबी हैं। सरना धर्म में चॉदोबोंगा (सूर्य) माराड. बुरु (देव), जाहेर आयो (देवी) गोंसाय एरा (देवी),गोंसाय (देव) मोंड़ेको–तुरुइको (पंच परमेश्वर) आदि देव– देवियों को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक मानकर पूजते है। ये देव–देवियों निराकार है। गोराम बोंगा (गॉव देवता) तथा दिशोम बोंगा (देश देवता) पारालौकिक शक्तियों से बचाव हेतु पूजे जाते हैं तथा माराड. बुरु, जाहेर आयो देव–देवी सभी की भलाई के लिए पूजे जाते है।

(ग) आर्थिक व्यवस्था – संथाल आदिवाशियों का मुख्य पेशा कृषि है। ये मुख्य रुप से धान की खेती करते हैं। जीविका के साधनों में पशुपालन का भी स्थान है। ये मुर्गी, सूअर, बकरी,गाय तथा बैल आदि पालते हैं। मुर्गी, सूअर ,बकरी ,गाय तथा बैल पूजा करते हैं तथा विवाह के समय गनपन के रुप में लेन–देन करते हैं। संथाल अधिकांश कच्चा मकान बनाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है।

(घ) पर्व त्योहार – संथालों का पर्व प्रत्येक माह में संपन्न होता है। यथा– माघ में माघ बोंगा,फागुन में बाहा बोंगा, चैत में रोहनी, वैशाख में एरोःबोंगा, जेठ में मुचरी, आसाढ़ में असाढ़िया, सावन में गोमहा या करम बोंगा, भाद्र में जानताड़, आश्विन में दांसाय, कार्तिक में सोहराय बोंगा, पौष में सकरात यामकर पर्व सम्पन्न होता है।

(ड.) आभूषण – संथाल आदिवासी परम्परागत आभूषण पहनते हैं। पुरुष वर्ग पाश्चीधूती फुटा धुती, गामछाधुती, दाहड़–पगड़ी पहनते हैं। महिलाऍ साड़ी पहनती हैं। संथाल महिलाऍ अपने जूड़े को गोलाकार रुप मे विशेष टुंग से बॉधती हैं जिसे रोत या सुत कहते है। आधुनिक आभूषण भी प्रयोग में लाते हैं।

(च) संस्कार – संथाल संस्कृति में व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कारों में गुजरना पड़ता है। संस्कारों में मुख्यतः जन्म संस्कार ,चिड़ी संस्कार ,कर्ण छेदन संस्कार, गोदना संस्कार, विवाह संस्कार तथा मृत्यु संस्कार है। संस्कार व्यक्ति के सर्वांगिंण जीवन को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का विकास तथा जीवन सुखमय होता है।

(छ) लोक संगीत – संथोले संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पक्ष है, लोक संगीत। यही लोक

संगीत संथालों के सुख–दुख का सबसे बड़ा संबल है। कठिन से कठिन दुखों के एवं आगत समय आनंद को लोक संगीत से ही अभित्यव्य करते हैं। लोक संगीत से जीवन मे ऊर्जा प्रवाहित होती है। दिन भर कठोर परिश्रम और रत्रि में संगीत के लय में,ताल में डूब जाना संथालों की नियति है और यही इनका कर्म है।कर्म में ही धर्म निहित है। संथालों का लोक संगीत आदिम युग से चला आ रहा है। इसमें इनके बादन ,नर्तन एवं गायन की बड़ी सुंदर मधुर एवं आल्हादकारी परंपरा है। गीत, नृत्य एवं वाद्य संगीत संथालों का जीवन मंत्र है।लोक संगीत में लोक संस्कृति, पर्व–त्योहार तथा सरना धर्म से संबंधित होते है।

संथाली लोक संगीत को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

जैसे– 1. राग। 2.संस्कार। 3.पर्व– त्योहार। 4. विविध।

1) राग – राग के अनुसार, संथाली लोकगीतों में परंपरागत रागों से गीत गाए जाते है। लोक कवियों ने विभिन्न अनुष्ठान, विभिन्न पर्व– त्योहार तथा विभिन्न संस्कार में गीतों के राग तथा नृत्य, वाद्ययंत्र, आभूषण आदि निर्धारित किए हैं। राग के आधार पर निम्न प्रकार है – लॉगड़े, डाहार,बाहा, करम, रिंजा, सोहराय,दांसाय, पाता,धुरुमजाः, डॉठा, भिनसार , सारपा,मातवार, गुलवारी, विवाह, झिंका, सिंगराई,दोड़ आदि है।

2) संस्कार गीत – संथाल जाति प्रकृति पूजक हैं। 'सरना' धर्मावलम्बी हैं। सरना धर्म में,'चांदो बोंगा' 'सूर्य देवता','माराड. बुरु' 'बड़ा देवता''जाहेर आयो' 'मॉ देवता', 'मोड़ेको–तुरुई' को पंच परमेश्वर, आदि देव –देवियों को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, निराकार रुप में पूजते हैं। संथाल संस्कृति में मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक कई संस्कारों से गुजरना पड़ता है। संस्कार व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन को प्रभावित करता है।

संथाल संस्कारों में मुख्यतः जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार प्रमुख हैं। जन्म संस्कार में जन्म से संबंधित गीत छाटयार गीत तथा नामकरण गीत गाया जाता है। विवाह संस्कार में विवाह से संबंधित गीत गाए जातें हैं। टाकाचाल गीत, सिरीबारी गीत, सिंदुरदान गीत, विदाय गीत, बालाय गीत तथा दौड़ गीत प्रमुख है। अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार है। मृत्यु से संबंधित गीत गाए जाते है। इनमें तेलनहान, भाडान, जापला आदि प्रमुख है।

3) पर्व –त्योहार – संथालों का पर्व –त्योहार माह पर निर्धारित है। बारह माह पर बारह पर्व होते है। माघ माह से आरंभ होकर पौष साकरात में समाप्त होते हैं। इनके आधार पर डाहार, बाहा, करम, दांसाय,सोहराय,साकरात प्रमुख है। इसके अतिरिक्त किसी अनुष्ठान, मेला, यात्रा पर भी गीत एवं नृत्य होते हैं। संथाल समाज में लॉगड़े गीत एवं नृत्य अनेक महत्त्वपूर्ण है।

4) विविध – संथाल समाज में मेला, यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान होतें है। इन अनुष्ठान में पातागीत एवं नृत्य का आयोजन होता है। गीत में प्रेम, स्नेह, सुख, दुख आदि से संबंधित होते हैं गीत सामूहिक रुप से होता है। संथाल परिश्रमि होते हैं। परिश्रम वेला

में 'लॉगड़े गीत गाते हैं। लॉगड़े का शाब्दिक अर्थ है लॉगा + एड़े। अर्थात् थकावट को दूर करना। यह गीत एवं नृत्य किए जाते हैं। नृत्य गॉव के आखड़ा में सामूहिक रुप से होता है। मादांपिड द्वारा जब मांदर पर उद्घाटन संकेत ताल 'तोड़ाव' प्रारम्भ होता है, तब पॉव धीरे–धीरे गति में आ जाते हैं। नर्तक एवं नृत्यांगनाओं के पॉव और बदन लयबद्व होकर कभी आगे और पीछे चलते है। संथाली नृत्य में सामूहिक रुप से युवक –युवतियॉ,हाथ पकड़कर नाचते हैं एवं साथ मिलकर गाते है।

संथालों के नृत्य के प्रकार, नृत्य के गुण तथा नृत्य के गीत, तीन प्रकार के हैं।

1. धार्मिक नृत्य 2. वीरयुक्त नृत्य 3. सामाजिक नृत्य।

1. धार्मिक नृत्य – धार्मिक नृत्य किसी देवालय या किसी पवित्र वृक्ष के सामने किए जाते है। जैसे– धार्मिक स्वरुप नृत्य मुख्यतः बाहा, डाहार, रिंजा, करमा आदि हैं।
2. वीरयुक्त नृत्य – यह नृत्य वीरश्री नृत्य है। विभिन्न प्रकार के हथियार लिए हुए नाचते हैं। जैसे– फिरकाल, दोंगड़, पायका दासाय आदि।यह नृत्य केवल पुरुष वर्ग द्वारा ही होता है।
3. समाजिक नृत्य– यह नृत्य सामाजिक आनुष्ठानों में किए जातें हैं। पाता नृत्य, युवक–युवतियों द्वारा सामूहिक रुप से होता है। साड़पा, डाहार नृत्य केवल लड़कियों द्वारा ही होता है।

(ज) संथाली वाद्य यंत्र – आज संगीत की दुनिया में कई तरह के वाद्य यंत्रों की भरमार है। अधिकांश वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो हाथ से बजते हैं परन्तु कुछ ऐसे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो स्वतः बजते हैं। संथाल लोग प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसें– पेड़, बॉस, लकड़ी,जानवरों के सींग, बाल, चमड़ा आदि। इस प्रकार से संथाल वाद्ययंत्र को चार श्रेणी में बॉटा जा सकता है।

1. अनवद्व वाद्य – इसके अंतर्गत मांदर, ढ़ाक, करहा, चोड़चुड़ी, ढ़ोल आदि आते हैं।
2. धनवद्व वाद्य – इसके अंतर्गत करताल, थाल घंटा, झॉझ, घुँघरा आदि हैं।
3. सूषिण वाद्य – बॉसुरी,सखवा, सिंगा आदि आते हैं।
4. वाद्ययंत्र – इसके अन्तर्गत केंदरी , भुवाड़ साड़पा आदि आते है। संथाल समाज में लड़की या स्त्री जाति 'साड़पा' वाद्ययंत्र को छोड़कर अन्य वाद्ययंत्र नहीं बजाती हैं तथा पूजा स्थल 'जाहेर थानाप' में प्रसाद नहीं चढ़ाते है। सामूहिक नृत्य, गीत, पूजा, के रीति–रिवाज तथा जातीय गुणों से संपन्न परम्परा संथालों में देखने को मिलती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संथाली अपनी सहोदराओं या सजातीय भाषाओं में सर्वाधिक प्रन्नोत और प्रगतिशील है। झारखण्ड राज्य में प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्चतम

एम. ए. वर्ग तक तथा पश्चिम बंगाल में, माध्यमिक विद्यालय स्तर तक संथाली भाषा–साहित्य के अध्ययन– अध्यापन का प्रावधान है जबकि आकाशवाणी (और दूरदर्शन) के कोलकाता,रॉची,जमशेदपुर आदि केन्द्र से संथाली की रचनाओं और सातयिक वमाचारों के प्रसारण की व्यवस्था भी है।

संदर्भ सूची

1. वाचिक परम्परा व साहित्य – बी0 एस0 चटर्जी व जयशंकर उपाध्याय (आकृति प्रकाशन)।
2. झारखण्ड एन्साइक्लोपीडिया – खण्ड – 4
3. संताली लोकगीत और जीवन दर्शन – रमेश हेम्ब्रम (शोध आलेख)। आई0डी0 पब्लिशिंग, राँची, झारखण्ड।
4. सिदो और कान्हू जीवन एवं उपलब्धियाँ – जगन्नाथ दास, संजीव कुमार जानकी प्रकाशन, पटना, नई दिल्ली।
5. संताली लोक कथा एक अध्ययन – डॉ0 जनेश्बर माँझी, प्यारा केरकेट्टा, फाउन्डेशन, राँची, झारखण्ड।

सुभद्राकुमारी चौहान के कथा साहित्य में राष्ट्रीय चेतना

डॉ0 संजय कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक,

सुभद्राजी सन् 1930 तक कविता करती रहीं तत्पश्चात् उन्होंने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया। उनकी कहानियों का समय सन् 1930 से 1947 तक का है। यह काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चरम काल था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सारा जनमानस समर्पित होकर एक अपूर्व सामाजिक–राष्ट्रीय चेतना से आप्लावित हो रहा था। इसका प्रभाव सुभद्राजी के कथा साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। देखा जाय तो उनके समग्र साहित्य का प्रेरणा बिन्दु गुलामी से लड़ाई है। गुलामी से उनका संघर्ष जहाँ एक ओर उनकी राष्ट्रीय कविताओं में विशेष रूप से प्रतिबिम्बित होता है वहीं दूसरी ओर उनके कथा–साहित्य में भी परिलक्षित होता है। सुभद्राजी ने कथा–साहित्य की ओर अपने झुकाव को 'मुकुल' की प्रस्तावना में उद्धृत किया है– ''आज संसार के संघर्षणों से उबकर मेरे कवि हृदय ने विश्राम सा ले लिया है।''[1] इस वक्तव्य में उबकर शब्द महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने राजनैतिक संघर्ष के स्तर पर किसी प्रकार की उब महसूस नहीं की थीं। लेकिन अँधी रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों की शिलाओं पर रोज बलि चढ़ने वाली निरपराध आत्माओं की हत्या को वे सह नहीं सकीं और शायद इसीलिए उनकी मनोवृत्ति पद्य से गद्य की ओर हुई। कहानीकार के रूप में उनकी राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रेरित कहानियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं–

क– देश–प्रेम, बलिदान तथा आत्मविश्वास की भावना से प्रेरित कहानियाँ– 'पापी पेट', 'अमराई', 'गुलाब सिंह', 'गौरी'।

ख– वर्तमान परिस्थितियों में असंतोष की भावना से प्रेरित कहानियाँ– 'ताँगेवाला', 'सुभागी'।

ग– स्वर्णिम भविष्य की कल्पना से प्रेरित कहानियाँ– 'राही'

घ– हिन्दू–मुस्लिम एकता, सद्भावना या शुद्धि की भावना से प्रेरित कहानियाँ– 'हींगवाला', 'एकादशी'।

पापी पेट

इस कहानी का आरम्भ सभा में लाठी चार्ज से होता है। लाठी चार्ज होने के कारण सभा तितर–बितर हो जाती है और पुलिस की विजय होती है, किन्तु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास न होकर ग्लानि छायी हुई थी। जिन लोगों ने लाठी–चार्ज किया था उनमें से एक है–सिपाही रामखिलावन। घर जाकर सिपाही रामखिलावन नौकरी पर लात मार देता है। इतना बड़ा पाशविक कृत्य स्वयं करके

आँखे खुल जाती है, ग्लानि और व्यथा से उसका मन भर आता है–''सिपाही रामखिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अन्दर से दरवाजा लगा लिया और लाठी चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के प्रहार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गयी थी। ''... राम–राम यह हत्या! किसके लिए? पेट के लिए? इस पापी पेट को तो जानवर भी भर लेते हैं फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें?.... लानत है ऐसी नौकरी पर।''[2]

कहानी में एक दूसरा पहलू हुक्म देने वालों अधिकारियों का है–''थानेदार बरकतउल्ला लाठी चार्ज के समय चिल्ला–चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे 'मारो सालों को, आये हैं, स्वराज्य लेने।' परन्तु अपने क्वाटर्स में पहुँचते–पहुँचते उनका जोश ठंडा पड़ गया।''[3] उनकी लाठी से उनके बेटे का प्रिय दोस्त गोपू घायल हो जाता है, जिससे उनको मानसिक पीड़ा होती है। इससे बचने के लिए वे तीन माह की छुट्टी ले लेते हैं। कोतवाल बख्तावर सिंह का भी हाल बुरा था। मारे रंज के उनका सिर दुःखने लगा। लेखिका के शब्दों में – ''बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टाड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की कहानियाँ उन्हें याद थीं।... मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलायें, मैंने आज यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा।''[4] नौकरशाही के सबसे बड़े सहायक शासक मजिस्ट्रेट कुन्दनलाल जिनके हुक्म से निहत्थों पर लाठियाँ चली थी, और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें राय बहादुरी का खिताब मिलने वाला था। उनका हृदय भी इस कृत्य को बुरा कहता है–''माना कि आखिर ये लोग स्वराज्य के लिए ही झगड़ रहे हैं। उनका काम परमार्थ का है सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाय? नौकरी छोड़ दी जाय तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए, हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता।''[5]

'पापी पेट' कहानी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हृदय से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक होते हुए भी जीविकोपार्जन के लिए सरकारी कर्मचारी अंग्रेजों के दमन चक्र का साथ देते हैं। अपने भाईयों के कष्ट सहन और त्याग की भावनाओं का प्रभाव उन पर भी पड़ता है, जातीय गौरव का स्फुरण उनके भीतर भी होता है किन्तु वे विवश हैं। उनके भीतर देश–प्रेम की चिंगारी तो है किन्तु आत्म विश्वास और आत्म बलिदान के बिना उस चिंगारी का कोई मूल्य नहीं। इस कहानी में एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि लाठीचार्ज के अमानुषिक कृत्य के पश्चात् सिपाही रामखिलवान नौकरी छोड़ देता है, वहीं उसके उच्च अधिकारी थानेदार बरकतउल्ला, कोतवाल बख्तावर सिंह, मजिस्ट्रेट रायसाहब कुन्दन लाल हृदय में दुष्कृत्य से लज्जित होने पर भी इतना साहस नहीं बटोर पाते हैं कि विदेशी गुलामी का जुआ अपने कंधें से उतार फेंके। सिपाही रामखिलवान के प्रति यह विश्वास देश की साधारण जनता, देश के किसान, मजदूरों के प्रति विश्वास है, जिनके बीच से रामखिलवान आया है। आजादी की अलख जगाने में और अपना सर्वस्व समर्पण कर देने की भावना जितनी आम जनता में थी उतना अन्य वर्ग में नहीं। मध्य एवं उच्च वर्ग के अधिकारियों का व्यवहार उनके सामान्य वर्ग चरित्र के अनुकूल है जो अपने कर्तव्य को जानते हुए भी षोशक सत्ता का साथ देते हैं।

'पापी पेट' की कहानी का अंत जितना दुःखान्त है उतना ही देश–प्रेम की चिंगारी को सुलगा देने वाला भी। रायसाहब कुन्दनलाल का इकलौता बेटा इस लाठी चार्ज की चपेट में आ गया था और अस्पताल पहुँचा दिया गया। सुनते ही रायसाहब पागलों की भाँति भागे और उनके पहुँचने पर स्थिति यह थी कि– ''उसने पहिली ही बार आँखे खोली। उसके मुँह पर हल्की सी मुस्कराहट थी। धीमी आवाज से उसने कहा, वन्दे मा... 'म्' की ध्वनि नहीं निकल पायी, 'म' के साथ ही उसका मुँह खुला रह गया, और आँखें सदा के लिए बन्द हो गयीं।''[6] प्रस्तुत कहानी में देश–प्रेम की उत्कट झलक बालक गोपू में है। गोपू उन तमाम बालकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जान बूझकर अपनी आत्मबलि के लिए आगे बढ़े तथा मरते–मरते जिनके मुख पर स्वतंत्रता की चमक रही, माता की वन्दना रही। अन्य पात्र जिन्हें हम नृशंस अधिकारियों के रूप में देखते हैं, उनके हृदय भी देश–प्रेम से शून्य नहीं है। विवशता केवल पापी पेट की है।

अमराई

'पापी पेट' कहानी के विपरीत 'अमराई' कहानी है, जिसमें राखी के दिन रायसाहब की अमराई में बच्चे राखी का त्योहार मना रहे हैं। बहनें भाइयों को राखी बांधकर कहती हैं–''भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना।''[7] उस अमराई में छोटे–छोटे बच्चे और बच्चियाँ झूला झूलते हुए कजली गा रहे थे। तभी एकाएक एक छोटा बालक गा उठा, ''झंडा उँचा रहे हमारा।'' इस राष्ट्रीय गीत को गाने के कारण आजन्म राजभक्त रायसाहब और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद आदि का बिना विचार किए हुए पुलिस ने बच्चों पर लाठी–चार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के कारण सभी बच्चों को चोटें आयी किन्तु रायसाहब के नाती विजय को ज्यादा चोट आती है, जिसके कारण वह शहीद हो जाता है। बड़े साहब ने रायसाहब को न्यायालय में उनसे जवाब– तलब किया, किन्तु अब उनमें देश भक्ति की आग धधक उठी थी और उन्होंने वहाँ जाकर इन शब्दों के साथ पद से त्यागपत्र दे दिया– ''मेरा तो यह विश्वास हो गया है कि इस शासन–विधान में, जो प्रजा को हितकर नहीं है, अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। हर एक हिन्दुस्तानी का धर्म है कि वह शासन–सुधार के काम में पूरा–पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म–पालन करने के लिए विवश हूँ, और यह मेरी रायसाहिबी और आनरेरी

मजिस्ट्रेटी का त्यागपत्र है।''[8] और दूसरे दिन से ही ठाकुर साहब की अमराई राष्ट्रीय आयोजनों का अड्डा बन गई। इसके चलते शासन की ओर से ठाकुर साहब पर पाँच सौ रूपये के जुर्माने के साथ छः महीने कारावास की सजा दी गयी और 'अमराई' को नीलाम कर दिया गया। साथ ही ऐसा कोई आयोजन न हो इसके लिए वहाँ पुलिस का थाना बनवा दिया गया।

'अमराई' कहानी के बारे डॉ. विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है कि ''अमराई कहानी में जागृत तरुणाई के बलिदान के कारण ठाकुर साहब जैसे वृद्धों में भी दौड़ने वाली नवीन चेतना एवं उत्साह का चित्रण किया गया है।''[9] कहानी का अंत ठाकुर साहब की

गिरफ्तारी और अमराई की नीलामी से हुआ। बालकों के झूला झूलने की अमराई में जब पुलिस चौकी बनती दिखाई पड़ी होगी तो एक ठाकुर की जगह अनेक ठाकुर ऐसे शासन को उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्प दिखायी देने लगे होंगे, इसमें संदेह नहीं। यहाँ छोटे–छोटे बच्चों में देश–प्रेम की वह झाँकी दृष्टिगोचर होती है जो सामयिकता की लहरों में उत्साह से बह गये। ठाकुर साहब के हृदय परिवर्तन का कारण उनके बच्चों के प्रति की गई निर्दयता मात्र नहीं है बल्कि शासन के अमानुषिक कार्यों को आँखों के सामने देखकर उनकी आँखें खुल गई। यहाँ वर्तमान स्थिति से उत्पन्न क्षोभ की भावना का राष्ट्रीय तत्त्व प्रधान है। देशभक्ति तथा आत्म–विश्वास और बलिदान की भावना कहानी के सहायक तत्त्वों के रूप में विद्यमान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश–प्रेम में जब नन्हें मुन्ने बालक घायल होने को तत्पर हो गये तब कौन सी शक्ति उन्हें स्वतंत्र होने से रोक सकती है।

गुलाब सिंह

गुलाब सिंह राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में जबलपुर के एक वीर बालक के बलिदान की कहानी है। भाई–बहन में घनिष्ट प्रेम है। विदेशी शासन ने कांग्रेस का झंडा लेकर जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। वे दोनों भाई–बहन यह सुनकर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। बहन ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाती है। भाई बहन से रोली लगवाकर तथा पान लेकर झंडा उठाकर चल देता है। पुलिस वालों ने जब उस पर गोलियाँ चला दी तब भाई को गिरते देखकर बहन उसके पास दौड़ी चली गयी। भाई ने बहन को झंडा देकर सदा–सदा के लिए उससे विदा ले ली। यह कहानी त्याग और बलिदान की साहसिक कथा है जो राष्ट्रीय जागृति की उत्तम व्यापकता को प्रकट करती है। कहानी के प्रारम्भ में सुभद्राजी ने स्वयं लिखा है कि ''एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाये हुए मनों में भी नयी जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाये हुए पौधे में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है, जो मुर्दा–मन मनुष्यों में नयी उमंग भर देती है। यह उमंगों वाली हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था वहाँ।''[10] आगे उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया– बालक गुलाब सिंह भी इस हवा के साथ उड़ चला। बहन ने ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाया, तीन रंगों से रंगा गया। बहन से टीका लगाकर वह आगे बढ़ा पीछे–पीछे बहन भी चली। ''बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडेवाले को रोका। वह न रुका, और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा उसके हाथ में था।''[11] गोली चल जाने पर किसी की हिम्मत सड़क पर जाने की नहीं हुई किन्तु बहन ने भाई को गिरते हुए देखा, वह दौड़ पड़ी और पुकारा भैया!... ''भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला–तू आई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया। पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिए रही।''[12]

'गुलाब सिंह' कहानी में विदेशी शासन के दमन, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा करने की तरुणाई की अमर प्रतिज्ञा चरितार्थ हुई है। यौवन का

यह पावन संकल्प सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, देश–काल की सीमा से परे है। इस सार्वभौम भाव को लेखिका ने निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है– ''यह कहानी कहाँ की है? किसकी है? हम क्या बतावें! यह फ्रांस की राज्य–क्रान्ति की हो सकती है। यह रूस की राज्य क्रान्ति की हो सकती है। यह हिन्दुस्तान की सन् 42 की क्रान्ति की भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनन्त है। यह जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे जबलपुर में भी हो सकती है।''[13] वास्तव में देश–प्रेम का यह भाव देश–काल से परे है। संकट काल में देश के गौरव की यह भावना चिरन्तन है। इस प्रकार के भाव में केवल घटनाओं का स्वरूप बदलता है, व्यक्तियों के नाम बदलते हैं, शेष सब तो यथावत् रहता है। 'गुलाब सिंह' कहानी में बहादुर तरुण गुलाब सिंह देश–प्रेम का प्रतीक है, उसकी बहन देश–प्रेम और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार का भावना सुभद्राजी के काव्य में भी देखा जा सकता है–

''आँसू छलके, याद आ गयी, राजपूत की वह बाला।
जिसने विदा किया भाई को, देकर तिलक और भाला।।''[14]

श्री विष्णुकांत शास्त्री ने इस कहानी के बारे में अपने विचार निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है– ''गुलाब सिंह' की बहन भी शहीद–शान के साथ भाई को विदा करती है और उसके जूझ जाने पर स्वयं उसका झंडा ले आगे बढ़ती है। आधुनिक युग में भाई–बहन के स्नेह में फौलादी दृढ़ता और बलिदानी वृत्ति भरने का श्रेय सुभद्रा जी को ही है।''[15]

तांगेवाला

'तांगेवाला' कहानी राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत एक सत्यनिष्ठ, थोड़े में बसर करने वाला स्वावलम्बी श्रमिक की कहानी है। तांगेवाला यात्रियों को उनकी सुविधानुसार उनके घर पहुँचा देता है। वह देश–प्रेम का गीत गुनगुनता हुआ झूमा करता है। उसे अपने देशवासियों की फूट पर बहुत दुःख होता है। वह फिरंगियों का कट्टर विरोधी है और उन्हें अपने तांगे पर कभी नहीं बैठने देता तथा भारतीयों की एकता को आधार बनाकर उनसे प्रतिशोध लेने के लिए कटिबद्ध रहता है। संभवत वह भी

सन् 1857 के गदर का कोई प्रच्छन्न रत्न था, तात्या टोपे की वीरता और मारी–मारी फिरती हुई पगली बेगम तक से वह परिचित था तथा जो स्वयं श्रमजीवी बनकर देश–भक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का अलख जगा रहा था।

प्रस्तुत कहानी में सुभद्राजी ने वस्तुतः देश के अनपढ़ और निम्नवर्ग में गिने जाने वाले एक तांगेवाला का देश–प्रेम चित्रित किया है। तांगा हाँकते–हाँकते वह गा उठा– ''हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे।''[16] रास्ते में एक नदी पड़ने पर वह तांगे में बैठे सज्जन से कहता है– ''सन् सत्तावन के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था।''[17] फिर अपने विषय में उसने बतलाया– ''हुजूर, जब से सत्तावन के गदर का इतिहास पढ़ा, और फिरंगी कैसे आये और कैसे

फैल गये सारे हिन्दुस्तान में यह जाना, तब से हुजूर, बदले की भावना से रात–दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की। मेरा बाप डी.सी. की अर्दली में था। मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी।''[18] यहाँ तांगेवाला देश के उन भावुक, प्रबुद्ध तरुणों का प्रतिनिधि है जो विदेशियों की चाकरी की अपेक्षा स्वयं परिश्रम की कमाई को श्रेयस्कर समझते हैं। आगे पुनः तांगेवाले ने यात्री सज्जन से बताया कि वह किसी भी फिरंगी को अपने ताँगे पर नहीं बैठाता, जो एक की जगह दस देते हैं। इसका कारण बताता हुआ कहता है कि– ''सारे हिन्दुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किये हैं? गाँव के गाँव जला दिये, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुँह से बाँध कर उड़ा दिया। अभी कल की बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? घाव ताजा है हुजूर! इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खायी है, इन्हें ताँगे पर कभी न बिठाउँगा।''[19] गाँव–गाँव में फैलने वाली आजादी की भावना और विदेशी सरकार के प्रति घृणा की भावना का विविध रूपों में अनेक कविताओं और कहानियों में सुभद्रा जी ने वर्णन किया है। अपने युग और देश की पुकार को उन्होंने स्वर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों तांगेवाले की भावना के साथ उनकी उन पंक्तियों से साम्य हो रहा है जब वे विजयादशमी से कहती हैं–

''पन्द्रह कोटि असहयोगिनियां, दहला दे ब्रह्माण्ड सखी।
भारत–लक्ष्मी लौटाने को, रच दें लंकाकाण्ड सखी।।''[20]

असहयोग आन्दोलन में जेल जाने वाली और बापू के चरणचिन्हों पर चलने वाली सुभद्राजी मानों तांगेवाले के विचारों से पूर्णतः सहमत है कि एक बार सन् सत्तावन का दृश्य, त्रेता का लंका कांड फिर से दोहराया जाय किन्तु इसके साथ अपनी आन्तरिक अव्यवस्था से पूर्णतः अपरिचित नहीं हैं। देश के पतन का, पराधीनता का मूल कारण उनकी सूक्ष्म बुद्धि से छिपा नहीं है। ताँगे में बैठे सज्जन ने कहा– ''तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिलकुल पंगु कर दिये गये हैं।''[21] प्रत्युत्तर में तांगेवाला देश की परतंत्रता का सच्चा सजीव चित्र खींचता है– ''हमने जबान खोली हमारे ही भाई– बन्धु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आये। हमीं में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एकमत होकर एक साथ काम करे तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन दस अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो बीस धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिन्दुस्तानियों में एका ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते?''[22]

गौरी

प्रस्तुत कहानी में सामाजिक कुप्रथाओं तथा नारी जीवन की समस्याओं का उल्लेख है। कहानी में कहीं–कहीं मातृत्व और वात्सल्य की मोहक झाकियाँ भी है किन्तु कहानी का प्रतिपाद्य देशभक्त विधुर के बच्चों के लिए एक कुमारी का अपूर्व साहस तथा त्याग है। 'गौरी' का विवाह सीताराम जैसे दुहाजू और साधारण व्यक्ति से न करके उसके पिता

उसका विवाह नायब तहसीलदार से तय करते हैं। यद्यपि सीताराम के विषय में उनकी धारणा बहुत अच्छी है–''अरे, नहीं–नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है। पर उसका खादी का कुरता, गाँधी टोपी, फटे–फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है।.... इसके अलावा तीस रुपये कुल उनकी तनखाह है, काँग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। तीन बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाते हैं, कुछ ठिकाना नहीं।''[23] कहानी के मुख्य उद्देश्य का बीजारोपण यहाँ से हो जाता है। माता–पिता की बातचीत को कन्या गौरी छिपकर सुन लेती है। किन्तु– जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने की कुछ श्रद्धा के भाव जाग्रत हो गये। होता भी यही है। इधर गौरी का विवाह तय हुआ नायब तहसीलदार के साथ, उधर उसने पढ़ा– राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार कर लिये गये। गौरी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है किन्तु उसने तत्काल अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गयी और बोली– ''माँ, मैं कानपुर जाउँगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुन्ती ने पूछा। गौरी– वहाँ बच्चे हैं।.... बच्चों को तुम भी जानती हो। उनके पिता को राजद्रोह के मामले साल भर की सजा हो गई। बच्चे छोटे हैं। मैं जाउँगी माँ। मुझे जाना ही पड़ेगा।''[24] गौरी कानपुर चली गई और सीताराम जी सालभर बाद आकर जब देखा तब वे ठगे रह गये, फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा– ''आप? गौरी ने झुककर उनकी पद–धूलि माथे से लगा ली।''[25] इस प्रकार इस कहानी में देश–प्रेम की प्रच्छन्न किन्तु प्रखर धारा के दर्शन होते हैं। गौरी देशभक्त सीताराम जी के बच्चों को संभालकर अपनी देशभक्ति का सच्चा परिचय देती है।

सुभागी

इस कहानी में यद्यपि मुख्य भाव पुलिस की नृशंसता है जिसमें व्यक्तिगत मनमुटाव के कारण सुभागी के पति और सुभागी दोनों को सरकार के विरोधियों के रूप में पकड़ लिया गया है। सुभागी से उसका नौ वर्षीय बालक निर्ममतापूर्वक अलग कर दिया गया है। थानेदार की नीयत सुभागी पर खराब थी, किन्तु सुभागी अपने चरित्र की रक्षा के लिए अटल रहती है, तो थानेदार उसको चोरी के आरोप में फंसाकर जेल करा देता है। यहाँ तक कहानी में पुलिस की ज्यादती–तांडव का चित्रण है, किन्तु मजिस्ट्रेट के कहने पर कि यदि सुभागी यह स्वीकार कर ले कि वह काँग्रेस का कार्य नहीं करेगी तो कहानी की भावधारा घूमकर वर्तमान परिस्थितियों में काँग्रेस के आन्दोलन से जुड़ जाती है। यद्यपि सुभागी काँग्रेसी कार्यकर्ती नहीं है फिर भी वह काँग्रेस के सम्मान के लिए जेल में रहना पसन्द करती है। मजिस्ट्रेट ने जब उससे कहा– ''तुम यह कह दो– आगे से कोई भी कांग्रेस का काम न करोगी और थानेदार साहब के कहने में रहोगी तो तुम्हे छोड़ देते हैं। तो सुभागी का उत्तर था बहिन जी! वैसे तो मैं कभी काँग्रेस का काम नहीं करती पर यह तो माफी मांगना हो जाता न? और इससे काँग्रेस की बदनामी होती।''[26]

इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य उस वर्ग की काँग्रेस के प्रति, महात्मा गाँधी के

प्रति अटूट निष्ठा दिखाना है जिसने कभी भी काँग्रेस का काम नहीं किया किन्तु फिर भी काँग्रेस की बदनामी उसके किसी कार्य से हो, यह उसके लिए असह्य है। 'सुभागी' में जहाँ एक ओर मातृत्व और नारी की लज्जा रक्षा में द्वन्द्व है वही उसका अंत काँग्रेस के प्रति सत्यनिष्ठा में होता है, जो काँग्रेस के प्रति सुभागी के हृदय में है।

राही

इस कहानी में एक स्त्री चोरी करने के अपराध में जेल आती है और देशभक्त अनीता से चोरी का कारण बताती है कि बच्चों की भूख न देखी गयी और उसने अनाज की गठरी चुराने की कोशिश की। इसी प्रकार की चोरी करने के अपराध में राही का पति भी जेल में डाल दिया गया था, किन्तु अधिक मार पड़ने से मर गया। तब देश–भक्त अनीता सोचती है– ''एक ओर तो यह कैदी है, जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ठ उठाती है और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हम जेल आकर 'ए' और 'बी' क्लास के लिए झगड़ते हैं। हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाती है और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद, काँग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेम्बर और क्या–क्या हो जाते हैं।''[27]

देशभक्त अनीता देश की वास्तविक और सच्ची सेवा को इस दिखावे से अलग देखने लगती है। वह फिर सोचती है, क्या इन्हीं देश–भक्तों से देश का वास्तविक कल्याण हो सकता है जो देश प्रेम से

अधिक प्रदर्शन के लोभी है। अवसरवादियों का चित्र उसके सामने आ जाता है और वह सोचने लगती है– ''कल तक जो खद्दर भी न पहिनते थे, बात–बात पर काँग्रेस का मजाक उड़ाते थे, काँग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे काँग्रेस भक्त बन गये। खद्दर पहनने लगे यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति था सत्ताभक्ति!''[28] ग्लानि से अनीता का मन भर जाता है उसकी आत्मा बोल उठी कि– ''वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट–निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हमारी ही भारत माता की संताने हैं। इन हजारों लाखों भूखे–नंगे भाई–बहिनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की।''[29] अनीता स्वर्णिम भविष्य के स्वप्नों में खो जाती है। उसके मन में नये राष्ट्र धर्म का उदय होता है जो मानवता के निकट है, जिसके बिना भारत माता का सर्वांग श्रृँगार संभव नहीं। विचारधारा आगे चलती है– ''राही जैसी भोली–भाली किन्तु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदण्ड क्यों न बनें?[30] वह अपनी कल्पना में जेल से छूटकर वह इन्हीं माँगरोरी लोगों के बीच पहुँच जाती है– ''वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे–छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियाँ सूत कातती है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रूई धुनकते हैं।

शाम को रोज उन्हें धर्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है।''[31] श्री विष्णुकांत शास्त्री लिखते हैं कि ''राही' में उन देशभक्तों का परदाफाश किया गया है जो वस्तुतः सत्ता भक्त हैं और उसी के लिए राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेते हैं और जेलों में आकर उँची क्लासों के लिए झगड़ते हैं। इसमें इन्होंने गाँव की जनता की सेवा करने को ही सच्ची देश–भक्ति का नाम दिया है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महतकर पुण्य हो सकता है, ऐसा वे नहीं मानती। जब तक गाँवों में जाकर रचनात्मक कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भारत की सच्ची उन्नति नहीं हो सकती। यह कथन आज भी अपनी सत्यता प्रमाणित कर रहा है।''[32] स्वर्णिम भविष्य की कल्पना में कहानी लेखिका अपने सामने एक बहुत बड़ी योजना रखती है। गाँवों और पिछड़े लोगों का सुधार किये बिना देश का उद्धार हो नहीं हो सकता, यह बात सुभद्रा जी ने अच्छी तरह अनुभव कर ली थी इसीलिए 'जेल जाना', 'सत्याग्रह करना' उनकी दृष्टि में पर्याप्त न था। उनका लक्ष्य था–

''निर्धन हों धनवान, परिश्रम उनका धन हो।
निर्बल हों बलवान, सत्यमय उनका मन हो।।
हों स्वाधीन गुलाम, हृदय में अपनापन हो।
इसी आन पर कर्मवीर तेरा जीवन हो।।''[33]

हींगवाला

'हींगवाला' कहानी हिन्दू–मुस्लिम एकता और पारस्परिक स्नेह, सद्भाव को चित्रित करती है। खान पेशावर का पठान है जो भारत में हींग का व्यापार करने आया हुआ है। नगर में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दंगा हो गया है, किन्तु वह निर्भीकतापूर्वक हिन्दू मुहल्लों में आता जाता है और अपना व्यापार करता है। हिन्दू महिला सावित्री जो खान से हमेशा हींग लेती है, उससे दंगा होने की चर्चा करती है तो खान उत्तर देता है– सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। जब दशहरा के जुलूस में दंगा हो गया तब वहीं कहीं असहाय अवस्था में नौकर द्वारा छोड़ दिये गये सावित्री के बच्चे उसे मिल गये। खान उन्हें पहचान कर सकुशल सावित्री के घर छोड़ जाता है। यहाँ पर खान द्वारा मानवता का उज्ज्वल पक्ष उद्घाटित हुआ है। सुभद्राजी हिन्दू–मुस्लिम सद्भाव की निश्चित रूप से समर्थक थीं। 'हींगवाला' कहानी के खान का दंगे के समय की मानवता का मंगलमय रूप इस कहानी में प्रदर्शित हुआ है। हींगवाला जिस घर में हींग देता है, उनके बच्चों को हिन्दू–मुस्लिम दंगे में निकालकर ले आता है। बच्चे कहते हैं– ''खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपटकर कहा– नहीं दोस्त नहीं। हम तुम्हारा भाई है, भाई।''[34] हिन्दू–मुस्लिम आपस में दोस्त नहीं, भाई–भाई के समान है। यह प्रतिध्वनि इस कहानी के भीतर से सुनाई देती है। इस देश में रहने वाले सभी भारत माता की संतान है और इस रिश्ते से सभी जातियाँ एक दूसरेके साथ भ्रातृत्व की अधिकारिणी है। कहानी का यह मूलभाव आज भी प्रासंगिक है।

एकादशी

'एकादशी' हिन्दू संगठन एवं शुद्धि की समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। 'एकादशी' कहानी सुभद्राजी को उन राष्ट्रीयतावादियों से अलग कर देती है जिनकी समझ है कि मुस्लिम शोषण करना और हिन्दुत्व को गाली देना प्रगतिशीलता की निशानी है। इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्र–हित के लिए हिन्दू–मुस्लिम एकता आवश्यक है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपना आत्मसम्मान बेच डाले। 'एकादशी' के डॉ. मिश्रा हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही समान समझते थे, तथा शुद्धि संगठन उनके लिए मात्र आडम्बर था। कहानी के प्रारम्भ में डॉ. मिश्रा की भेंट किसी समय एक ब्राह्मण पुजारी की विधवा बालिका से होती है जिसने बच्चों के झुण्ड में मिठाई लेना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। कई वर्ष बाद डॉ. मिश्रा विधवा ब्राह्मण बालिका को एक मुसलमान की पत्नी की रूप में देखते हैं, और मुसलमान के घर में भी एकादशी का व्रत करते देखते हैं। उसी दिन से लेखिका के शब्दों में ''डॉ. मिश्रा भी शुद्धि और संगठन के पक्षपाती हो गये।''[35]

वास्तव में हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए संगठित और बलशाली हिन्दू समाज आवश्यक है क्योंकि समान शालिशील में ही मित्रता होती है। विष्णुकांत शास्त्री जी के शब्दों में– ''मानवता के प्रेम के पुजारियों में जातीय संकीर्णता नहीं हुआ करती, किन्तु अपनी जाति की अवनति के कारणों को निर्मूल करना अपनी जाति को विश्व–हित की दृष्टि से सशक्त एवं संगठित करना भी मानवता प्रेम ही है, संकीर्णता कदापि नहीं। इसी दृष्टि से हिन्दू जाति के संगठन का समर्थन उन्होंने एकादशी में किया है।''[36]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सुभद्राकुमारी चौहान जी के कथा साहित्य में राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रेरित कहानियों की संख्या कम है। किन्तु संख्या में कम होते हुए भी राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रेरित कहानियों में राष्ट्रीयता का प्रखर रूप परिलक्षित होता है। इन कहानियों में सुभद्राजी ने मुख्य रूप से देश–प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, हिन्दू–मुस्लिम एकता और वर्तमान परिस्थितियों में सत्याग्रह, जन–आन्दोलन, काँग्रेस–प्रेम आदि का ओजस्वी वर्णन किया है। उनके कथा साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना प्रस्फुटित हुई है उसका एक–एक क्षण उन्होंने जिया है, भोगा है, स्व अनुभव किया है। कहीं भी उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखायी देता है। उनकी राष्ट्रीय चेतना में वह शक्ति है जो हमें आज भी देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए, सत्यमार्ग पर चलने के लिए एवं अत्याचारों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है।

संदर्भ–सूची

1. मुकुल – प्रस्तावना : सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 5
2. सुभद्रा समग्र – पापी पेट – पृष्ठ 15
3. वही, पृष्ठ 16
4. वही, पृष्ठ 16

5. वही, पृष्ठ 18
6. वही, पृष्ठ 19
7. सुभद्रा समग्र – अमराई– पृष्ठ 89
8. वही, पृष्ठ 91
9. जनभारती – अंक 2 – डॉ. विष्णुकान्त शास्त्री, पृष्ठ 95
10. सीधे–सादे चित्र – गुलाब सिंह – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 63
11. वही, पृष्ठ 65
12. वही, पृष्ठ 65–66
13. वही, पृष्ठ 66
14. मुकुल – बिदा – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 111
15. जनभारती सुभद्रा विशेषांक – अंक दो – श्री विष्णुकांत शास्त्री, पृष्ठ 90
16. सीधे–सादे चित्र – ताँगेवाला – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 23
17. वही, पृष्ठ 23
18. वही, पृष्ठ 24
19. वही, पृष्ठ 24
20. मुकुल – विजयादशमी – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 93
21. सीधे–सादे चित्र – ताँगेवाला – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 25
22. वही, पृष्ठ 25–26
23. सुभद्रा समग्र – गौरी – पृष्ठ 186.
24. वही, पृष्ठ 191
25. वही, पृष्ठ 192
26. सीधे–सादे चित्र– सुभागी – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 106
27. सीधे–सादे चित्र– राही – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 58–59
28. वही, पृष्ठ 59
29. वही, पृष्ठ 60
30. वही, पृष्ठ 60
31. वही, पृष्ठ 60
32. सुभद्राकुमारी चौहान की कहानियाँ – श्री विष्णुकान्त शास्त्री, पृष्ठ 65
33. मुकुल – मेरी टेक – सुभद्राकुमारी चौहान – पृष्ठ 107
34. सीधे–सादे चित्र– हींगवाला– पृष्ठ 55
35. बिखरे मोती – एकादशी – सुभद्राकुमारी चौहान, पृष्ठ 82
36. सुभद्राकुमारी चौहान की कहानियाँ – श्री विष्णुकांत शास्त्री, पृष्ठ 87

सूरदास एवं नंददास के साहित्य में ब्रजभाशा का स्वरूप

निलेश कुमार सिंह,

'ब्रज' शब्द का संस्कृत तत्सम रूप 'व्रज' है जो संस्कृत 'व्रज' धातु से निश्पन्न है।'व्रज' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद संहिता में मिलता है, पर वहां वह ढोरों के चारागाह या बाड़े अथवा पषु समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक साहित्य, रामायण तथा महाभारत काल तक यह शब्द देषवाचक नहीं हो पाया था। हरिवंष तथा श्रीमद्भागवत आदि पौराणिक ग्रंथों में भी इस शब्द का प्रयोग श्रीकृश्ण के पिता नंद के मथुरा के निकट व्रज अर्थात् गोश्ठ विशेश के अर्थ में ही हुआ है। परन्तु मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में 'व्रज' का तद्भव रूप ब्रज या बृज निश्चित ही मथुरा के चारों ओर के प्रदेश के अर्थ में मिलता है। मध्यकालीन लेखकों ने इस प्रदेश की भाशा के लिए भाशा अथवा भाखा षब्द का ही प्रयोग किया है। वैसे यह भाशा या 'भाखा' शब्द का प्रयोग केवल क्षेत्र की भाशा के लिए ही सीमित नहीं था, बल्कि हिन्दी की अन्य साहित्यिक बोलियों के लिए भी प्रयुक्त होता था।

ब्रजभाषा शब्द का प्रयोग निश्चय ही 18वीं षताब्दी से पूर्व नहीं मिलता। ब्रजभाषा नाम की प्रतिष्ठा संभवतः इसके तद्युगीन साहित्य की व्यापक भाषा बन जाने के कारण हुई थी। राजपूताना में भी काव्य की भाषा होने के कारण वहां यह 'पिंगल' कहलाती थी। उर्दू लेखक 'ब्रजभाषा' को प्रायः 'भाखा' कह कर ही पुकारते थे। इस प्रकार ब्रज प्रदेश की बोली और पूरे वृहत्तर हिन्दी–क्षेत्र की सर्वमान्य साहित्य भाषा होने के कारण ही यह 'ब्रजभाषा' कहलाई ।

बंगाली कवियों की 'ब्रजबुली' के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए की वह ब्रजभाषा नहीं थी। वस्तुतः वह मैथिली और बांग्ला के संयुक्त ढांचे पर हिन्दी के (ब्रज– रुप) के स्वीकार से विकसित और 15वीं–16वीं शताब्दी के बंगाल, असम, उड़ीसा के कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त एक कृत्रिम सी भाषा थी।

प्राचीन काल में मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र शुरसेन जनपद का अंग रहा था। वहां प्रचलित प्राकृत तथा अपभ्रंश को 'शौरसेनी' कहा गया है। वहां की स्थानीय बोली और शौरसेनी अपभ्रंश के ही संयोग से ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अन्तर्वेदी, कन्नौजी, जादोबारी, सिकरवारी, कैथेरिया, डॉगी, कालीमल और डुँगवारा आदि ब्रज के स्थानीय बोली रूपांतर है तथा अपने क्षेत्र विशेश तक सीमित है। साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश की भाषा होती है। यह राजस्थानी और अवधी से प्रभावित भी होती है। यह मध्यकालीन कृष्णकाव्य की मुख्य भाषा है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी, नंददास, छीतस्वामी, चतुर्भुजदास, श्रीभट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, हितहरिवंश, ध्रुवदास आदि कृष्ण भक्त कवियों की भाषा 'ब्रजभाषा' है। सूरदास और नन्ददास कृष्णकाव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं :– 'सूरसागर', 'सूरसारावली', 'साहित्य लहरी'। 'सूरसागर' में भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य

की त्रिवेणी प्रवाहित है। सूर वात्सल्य के सम्राट हैं। संस्कृत साहित्य में जो स्थान आदि कवि वाल्मीकि का है, ब्रजभाषा साहित्य में वही स्थान सूरदास को दिया जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य के आरंभिक काल में ही सूरदास ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से जैसा सर्वांगपूर्ण काव्य उपस्थित किया वैसा कई शताब्दियों के साहित्यिक विकास के उपरांत भी कोई कवि नहीं कर सका। यही बात सूरकाव्य की विषेशताओं को चरम सीमा पर पहुँचा देने वाली है।

सूरदास पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। वह इसके प्रथम आचार्य हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'सूरसागर' को चलती हुई ब्रजभाषा में पहली साहित्यिक कृति और प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कहा है। उसकी भाषा को ब्रजभाषा की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा बतलाया है, जो और के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्य–भाषा या अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है। उन्होंने पुनः बल देकर कहा है, सूर की भाषा बिल्कुल बोल–चाल की ब्रजभाषा नहीं है।[1]

सूरदास के पहले इस भाशा को पिंगल कहा जाता था। इसमें चारण कवियों तथा ब्रजभाषा के आरंभिक कवियों ने रचना की। संगीतज्ञ कवियों ने इसी भाषा को अपनाकर उसमें माधुर्य और मसृणता भरी। सूरदास ब्रज प्रदेश के निवासी हैं। अतः उनकी भाषा में सहज ही उसके क्रिया–रूपों, कारकों आदि का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि उनके पदों की भाषा कबीर आदि पूर्ववर्ती कवियों से परिमार्जित है। निरन्तर अभ्यास द्वारा हृदय की आंतरिक उमंग और संवेदना से पूर्ण सूर ने ठेठ भाषा को परिष्कृत किया है। उनकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी लोक भाषा ही है। क्योंकि वह उस युग के सामान्य जन की बोल–चाल की भाषा है। सूर ने भाषा को परिश्कृत किया। यही कारण है कि उनके पदों की भाषा न तो मानस की तरह तत्सम प्रधान है और न जायसी की तरह ठेठ । उनकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी लोक भाषा ही है। क्योंकि वह उस युग के सामान्य जन की बोलचाल की भाषा है।

सूर की भाषा की पहली विषेशता है अभिव्यक्ति के लिए भावानुकूल शब्दों का निर्धारण। शब्द – मैत्री पर उनका विशेश ध्यान था। जो शब्द जहां प्रयोग होना चाहिए, उसका प्रयोग वहीं हुआ है – 'अति मलीन वृषभानुकुमारी।' 'मलीन' शब्द के पीछे की स्मृति, वस्त्रों की दयनीय स्थिति, श्रृंगार का तिरस्कार, पीड़ा आदि भाव व्यक्त हुए हैं। कृष्ण–जन्म पर सबके मन में व्याप्त उछाल को सूर ने 'फूलैं फूलैं' कह कर शब्दों को बांधा है। इसके द्वारा आंतरिक उमंग और बाहरी उल्लास को अभिव्यक्ति दी है। इस अवसर के अन्य शब्द हैं – देत बधाई, दै परस्पर गारि, द्वार सथिया देति, मंगल गाइ, घर–घर बजै निसान आदि। पूरे ब्रज में व्याप्त उल्लास को 'सोभा सिंधु' कहकर उसे व्यापक धरातल पर स्थापित किया गया है। भक्ति, उपदेश, और दार्शनिक अवसरों पर भाषा सुसंस्कृत एवं अलंकारयुक्त हो गई है।

श्रुति अनुप्रास – 'चपला चमचमाति चमकि नभ भहरात।' या 'कर कंकन कंचन

धार मंगल साज लिये।'

यमक – 'ऊधौ योग योग हम नाहीं।'

श्लेश – 'बिनुधर वह उपराग गहयो।'

उपमा – 'लोचन टेक परै सिसु जैसे।'

उत्प्रेक्षा – 'उपमा हरितन देखि लजाने।
कोउ जल में कोउ वन में रहे दूरि कोउ, गगन समाने।'

रूपक – 'तरू बारून उपचार चूर, जल परो पसंद पनारी।'2

सूर के काव्य की भाषा ब्रज प्रदेश की प्रसिद्ध बोली है जो ब्रजभाषा के नाम से अभिहित है, सूर ने अपनी पूर्ववर्ती एवं समकालीन विभाशाओं के अनेकानेक शब्द अपनाये हैं और अंधे होने पर भी भाषा का साहित्यिक श्रृंगार किया है। सूर की भाषा में संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के अतिरिक्त गुजराती, राजस्थानी एवं पंजाबी भाषा के भी शब्द मिलते हैं। इतना ही नहीं खड़ीबोली, अवधी, कन्नौजी, बुन्देलखण्डी आदि बोलियों के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं तुर्की के शब्द भी मिल जाते हैं –

संस्कृत के षब्द :– संस्कृत के तत्सम, अर्द्ध–तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रचुरता है सूरकाव्य में। सूर की रचनाओं में संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं – दधि, मधु, सरस, मयूर, चन्द्रिका, आमिश, रूधिर, अस्थि, चिबूक, द्विज, कपोल, पुरीश, नाभि, कामधेनु, गज, कुंजर, कपोत, उलूक, चक्रवाक, कोक, गरूड़, खद्योत, मधुप, मीन, मकराकृत, भ्रमर, कल्पना, जीविका, त्रास, त्राहि, प्रतिष्ठा, मुखारविंद, कुसुमांजलि, रूद्रादिक आदि।

'सुखं पर्यङ्क ध्रुव देखियत कुसुम कन्द द्रुम छाये।
मधुर मल्लिका कुसुमित कुंजन दंपति लगत सुहाये।।'3

2. संस्कृत के अर्द्ध तत्सम शब्द :– सूर ने राग एवं सुर की दृष्टि से तत्सम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया है कि वे अर्द्ध तत्सम जैसे हो गये हैं – अगिनि, अमित, अस्थान, दरपन, परजंत (पर्यन्त), रतन, पदारथ, परतीति, मरम, रिधि, अस्तुति, निहकम, लछमी, सरवज्ञ, संवाद, करतार, कृतघन, विसकर्मा, सूकर, परबोधत आदि।

3. संस्कृत के तद्भव शब्द :– अंगूठा, अंध्यारी, आंसू, आचरण, उछाह, कोख, काठ, गाड़ें, चौक, जीभ, ताती, पाहन, निनारे, पौरी, बैन, हिय, सतिया, लरी, पाती, औराई, उनहार, आग, उधरी, उबटन, अनाखौंही, आजु, मोती, बिज्जु, वियाहन, मसान, लच्छा, बछल, सांझ, सरिस, लिलार आदि।

ख. गुजराती एवं पंजाबी के शब्द :– सूर के काव्य में संस्कृत के अतिरिक्त तत्कालीन प्रांतीय भाशाओं के शब्द भी मिलते हैं, जिनमें से गुजराती, राजस्थानी तथा पंजाबी भाषाएं प्रमुख हैं यथा– 'पिला', 'वियौ', आदि गुजराती के शब्द हैं तथा 'प्यारी' शब्द महंगी के अर्थ में पंजाबी से आया है।

ग. हिन्दी बोलियों के शब्द :– सूर की भाषा वैसे तो ब्रजभाषा है, परन्तु सूर ने ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जो हिन्दी की विभिन्न बोलियों के हैं यथा – गाया,

आया, लखाया, ओढ़ाया, बताया, लाया है, जाया है, 'चरन कमल चित लाया है' आदि शब्द खड़ीबोली के हैं, छोट, बड़, अस, आहि, इहां, उहां, कीन, दुबार, वियारी, मोर, तोर आदि शब्द अवधी के हैं। हुतो, हुतो, हुती आदि कन्नौजी के शब्द हैं। जानिबी, प्रगटबी आदि बुन्देलखण्डी के शब्दों का प्रयोग किया गया है।

घ. विदेशी भाषा के शब्द :– सूर ने तत्कालीन बोलियों, विभाशाओं और भाषाओं के शब्द के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया है तथा उनके द्वारा अद्‌भुत चमत्कार के साथ–साथ भाव–गांभीर्य की सृष्टि की है – अमल, अमीन, कलई, क़सब, ज़वाब, मुज़रा, मुहक़म, मुहरिर, मौज़, मुसाहिब, कारग़र, ख़बर, ख़ाली, तलफ़, दग़ा, मसकत, मिलिक, सफ़री, मसख़रा, आदि शब्द अरबी भाषा के अपनाये हैं, क़मान, गुमान, चुग़ली, दलाली, दरबार, दीवान, मेहमानी, सरदार, राह, अंदेसा, आज़ाद, आवाज़, असवार, गुनाहग़ार, ग़रद, ज़हर, ज़ोड़, बेसरम, सोर आदि फारसी शब्द है और 'लीन सुरंग कुमैत' कहकर 'कुमैत' तुर्की भाषा का शब्द ग्रहण किया है।

ड़. देशज शब्द :– सूर के पदों में देशज शब्दों की भी भरमार है – ग्रामीण शब्दों का सहज प्रयोग है – झुगली, झाम, ढबरी, ढ़ाढ़ी (गायक), धैया, झुगियां, ढुकी, टुकटुक, बोहनी, मोट, गोड़िया, खुनुस, टकरोरत, दुहकावै, घमर, खरमर, झूमक, ठुनक, धर–धर, झकोर, रूनुक– झुनुक आदि। बोलचाल के शब्द भाव के अनुकूल और माधुर्य पूर्ण है।

1. 'लादि 'खेप' गुनग्यान जोग की ब्रज में आय उतारी।'[4]
2. 'चितै चितै हरि चारू विलोकति मानहुं मांगत हैं 'मनओल'।'[5]

च. मिश्रित शब्द :– देशी एवं विदेशी शब्दों के मिश्रण अथवा देशी प्रत्यय एवं विदेशी शब्दों के योग से सूर ने अनेक शब्दों का प्रयोग किया है– अनलायक, अनाहक, फौजपति, बेपीर, बेहाल, लौन, हरामी जैसे शब्द उक्त कथन के प्रमाण हैं।

सूरदास ने ब्रजभाषा को अर्थ– गौरव प्रदान किया है। अर्थ–गौरव से तात्पर्य अर्थ विस्तार एवं अर्थ–गंभीरता से है। कवि ने नित्य जीवन के शब्दों का प्रयोग संदर्भ विशेष के अर्थ में किया है जिसमें अनेकानेक अर्थनिहित हैं – 'विरद समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाहीं।' यहां 'हरत' शब्द यशोदा की प्रौढ़ावस्था में प्राप्त एकलौते पुत्र की अक्रूर द्वारा उनसे दूर हटाने, जज्जन्य पीड़ा, छटपटाहट, आकुलता और कुछ न कर पाने की असमर्थता एवं असाहयता को व्यक्त करता है। यहां 'हरत' की साभिप्राय प्रयोग हुआ है। अर्थ–गौरव के अतिरिक्त स्वर–झंकार द्वारा भाषा में संगीतमयता लायी गई है। प्रसंगानुसार माधुर्य, प्रसाद और ओज गुणों की अभिव्यक्ति है :–

1. 'नवल निकुंज नवल नवला मिलि
   नवल निकेतनि रूचिर बनाये।
   विलसत विपिन विलास विविधवर
   वारिज वदन विकच सचुपाये।।'[6]
2. 'निसि दिन बरसत नैन हमारे।
   सदा रहति पावस रितु हम पै जब से स्याम सिधारे।'[7]

3. 'भहरात, झहरात दावानल आयो ।
बरत बनपात भहरात, झहरात अररात, तरू महा धरनी गिरायौ।'[8]

सूरदास ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी किया है जिसमें नैसर्गिकता है :–

'सोभित कर नवनीत लिये।
घुटुरूनि चलत रेनु तन मंडित मुखदधि लेप कियो।'[9]

सूरदास ने लक्षणा और व्यंजना षक्ति से ब्रजभाशा को समृद्ध किया है। जिससे भाषा में चमत्कार और अर्थ–गांभीर्य आया है :–

'उधौ ! जाहु, तुमहि हम जाने।
श्याम तुमहिं, हयां नाहि पठाए तुम हौं बीच भुलाने।।'[10]

सूरदास की ब्रजभाषा को मुख्य देन उनकी लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं। इनके प्रयोग से भाशा में सादगी और सहजता आती है साथ ही अर्थवत्ता भी बढ़ती है –नैन आकाश चढ़ायौ, टोना सिर डारति, छांह लै छांह छुवावै, बिना जोर जांधनि के चित्र लिखी काढ़ी, मींजि कर पछताहीं आदि उक्त कथन के प्रमाण हैं। भ्रमरगीत में प्रयुक्त लोकोक्तियां पैनापन, संवेदनशीलता और सटीक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है :– रात कछु सपनौ भयौ, प्रात भई ठकुराई, कहौ कौन पै कढ़त कनूका हठि भुसी पछोरी आदि।

सूर ने लोक उपमानों से जीवनानुभूति को मार्मिकता एवं व्यंजकता प्रदान किया है – काग हंस की संगति, ग्यान ज्यों बास की भांति आदि। उन्होंने लोक विशेषणों का प्रयोग भी किया है – नवरंगी, हरामी, बड़भागिनि, मुंहचाही आदि। लोक प्रतीक – मानिक, कुम्हाड़े, धनियां, खारी, मही आदि के प्रयोग से ब्रजभाषा जीवन्त और सार्थक बनती है। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त ब्रजभाषा युग भाशा बनती है। डॉ0 मनमोहन गौतम का कहना है कि ''सूरदासजी ने ब्रजभाषा को जो स्वरूप दिया, वह स्थिर रूप से परवर्ती साहित्यकारों द्वारा ग्रहण किया गया। इसलिए उनको ब्रजभाषा का 'बाल्मीकि' कहना सर्वथा उचित है।''[11]

सूर ब्रजभाषा के कवि सम्राट हैं। उनकी कविता में मर्मस्पर्शी तीव्रता, जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति, हृदयाकर्शक संगीतात्मकता, अंतःकरण को प्रभावित करने वाली उत्कृश्ट काव्य–कला तथा विलक्षण उद्भावना –शक्ति के दर्शन होते हैं और सूर ने अपने नैसर्गिक संगीत द्वारा ब्रजभूमि एवं ब्रजभाषा को 'स्वर्गादपि गरीयसी' के पद पर प्रतिष्ठित किया है।

नन्ददास, कृष्णकाव्य – परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। 'रासपंचाध्यायी', 'भंवरगीत', 'विरहमंजरी', 'रसमंजरी', 'रूपमंजरी' आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। नन्ददास का काव्य न केवल भावात्मक चेतना की रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु भाषा प्रयोग के लिए भी उनकी महत्ता निर्विवाद है। उनके काव्य में भाव के अनुरूप भाषा–शिल्प का सम्यक् प्रयोग मिलता है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसको उन्होंने 'भाषा' नाम से अभिहित किया।

नंददास के काव्य में भाव और भाषा एक दूसरे से होड़ लेते हुए दिखाई देते हैं।

भाव जितने गंभीर हैं, भाषा उतनी ही संषलिष्ट और प्रवाहमयी। प्रसंगानुकूल भाशा प्रयोग में नन्ददास अत्यन्त निपुण है। इस सम्बन्ध में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह मत बिल्कुल सही है कि ''शब्द–अनुप्रासों की झंकार से नन्ददास ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं कि पाठक अभिभूत हो जाता है। शब्दों की ध्वनि और अर्थ की गंभीरता एक दूसरे से स्पर्द्धा करते हुए प्रकट होते हैं। अष्टछाप के किसी दूसरे कवि ने शब्द गठन और ध्वनि–निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं दिखाई।'' नन्ददास की काव्य–भाषा भावना और अनुभूति पर मीनाकारी करती है –

1. 'पिय के अंग–अंग सिमिटि मिलैं हैं रसिक नैन तब।'
2. 'मंद परस्पर हंसी लसीं तिरछी अंखियन अस।
रूप उदधि इतराति रंगीली मीन पॉति जस।।'12

'सिमिटि' और 'इतराती' दोनों शब्द अर्थगर्भित हैं। 'सिमिटि' का व्यंजनापूर्ण अर्थ केन्द्रीभूत है और 'इतराती' से संयोग–सुख, प्रीति की दृढ़ता और उमंगपूर्ण विनोद भाव प्रकट है।

नन्ददास की भाशा का दूसरा लक्षण है – भाव स्पष्टता। इसके लिए उन्होंने कोमल तथा परिचित शब्दावली का प्रयोग किया है। नंददास ने सजावट और शोभा के लिए 'बानक', लावण्य के लिए 'लुनाई', उन्मत नेत्रों के लिए 'असत कुछ धूम धुमारे' जैसे घरेलू एवं सरस शब्दों का व्यवहार करते हैं।

तीसरी बात यह है कि नन्ददास ने संस्कृत के शब्दों को ब्रजभाषा के रंग में भिंगो दिया है। योग – जोग, सूक्ष्म – सूच्छम, परिक्रिया – परिकला, क्षुधित – छुदित, यौवन – जोवन, व्यथा – विथा आदि उक्त कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। चौथी बात यह है कि नन्ददास ने ब्रजभाषा की ठेठ शब्दावली के बीच कहीं–कहीं पूर्वी हिन्दी के दो– चार रूपों का प्रयोग किया है –

1. 'इह बन दुर्लभ आइबो, इन्दुमति सुनी बात।'
ब्रजभाषा में 'इह' के लिए या, ग्या, जा होता है।
2. 'नीकौ राधे कुँअरि स्याम मेरो अति नीकौ।'
ब्रजभाषा में 'नीको' के स्थान पर अच्छा है।
3. 'कर्म धूरि कौं आनि प्रेम अमृत में साने।'
ब्रजभाषा में 'आनि' की जगह पर 'लाइकें' होता है।13

पाँचवी विशेषता यह है कि नन्ददास की भाशा में अरबी–फारसी के षब्द नहीं के बराबर है, मुस्किल से कुछ शब्द मिलते हैं –

1. 'जाकी रंचक रज गरज अज सें मरिं पचि जात।'
2. 'अहो विप्रधन लोभ न कीजे, या लायक नायक कूं दीजै।'14

नन्ददास ने मुहावरों और कहावतों का सटीक प्रयोग किया है :–

1. 'प्रेम बिना सब पचि मुयै विषय–वासना–रोग।'
2. 'हमरे सुन्दर स्याम प्रेम को मारग सुधौ।'

3. 'घर आयो नाग न पूजिये, बाँबी पूजन जाहिं।'[15]

आलंकारिकता नन्ददास की काव्य भाषा की मुख्य विषेशता है –

1. 'गोपी गुंन गावन लग्यो मोहन गुन गयों भूलि।'–अनुप्रास
2. 'ताहि बतावहु जोग जोग उधौ जेहि पाऐ।' – यमक
3. 'जो गुन उनके नाहिं और गुन भये कहां तें।'–दृष्टान्त'[16]

नन्ददास की भाषा में प्रासंगिकता की पहचान है –

'नास्तिक है जे लोग कहा जानैं निज रूपै।
प्रगट भानु कौं छॉड़ि गहत परछाई धुपै।।'[17]

'भानु' और 'धूपै' का लाक्षणिक प्रयोग हैं।

वचन विदग्धता नन्ददास की भाषा की निजी पहचान है –

'गोकुल में जोरी कोउ, पाई नहिं मुरारि।'
मनो त्रिभंगी आपु हैं करि त्रिभंगी नारि।।'[18]

चित्रात्मकता, संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता उनकी भाशिक कलात्मकता की विषेशताएं हैं– 'नूपुर कंकन किंकिनि करतल मंजुल मुरली।

ताल मृदंग उमंग चंग एकै सुर जुरली।।

नंददास की काव्य–भाषा भाव को षिथिल नहीं होने देती। उनकी पंक्तियों में न तो संयुक्ताक्षर होते हैं और न लम्बे चौड़े समास ही। उनके शब्द–चित्र भी बड़े आकर्षक और मधुर होते हैं। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाने की उनकी कला अत्यंत प्रशंसनीय है। उनकी भाषा में शब्दों की ध्वनि ही अर्थ का निर्देश करती है। उक्त गुणों के कारण ही उनके विषय में कहा जाता है– 'सऔर सब गढ़िया, नन्ददास जड़िया।' नंददास हिन्दी के प्रथम छंदोबद्ध कोष लेखक है। 'अनेकार्थमाला' और 'नागमाला' उक्त कथन के प्रमाण हैं। शब्द–भण्डार के अतिरिक्त नंददास का षब्द संस्थापन भी महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है–'सुन्दर कोमल वचन अनूठे, कहत सुनत समुझत अति मीठे।' इसी कारण 'रासपंचाध्यायी' को हिन्दी का 'गीतगोविन्द' और नंददास को भक्तिकाल का 'जयदेव' कहा जाता है।

समग्रतः एक जनभाषा या बोली को भाषा के स्तर पर प्रतिश्ठित करने का श्रेय कृष्णभक्ति– धारा के सभी कवियों को जाता है, जिसमें सूरदास एवं नंददास का विषेश स्थान है। जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा ब्रजभाषा को एक नयी ऊँचाई एवं गरिमा प्रदान की है।

संदर्भ–सूची–

1. सूरदास–आ0 सुक्ल, पृष्ठ 176
2. सूरसागर सार– डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा, पृश्ठ 82
3. स्वर्ण काव्य मंजूषा– श्रीकृष्ण कुमार सिन्हा, पृष्ठ 133
4. भ्रमरगीत सार– आ0 सुक्ल, पृष्ठ 12
5. स्वर्ण काव्य मंजूषा– श्रीकृष्ण कुमार सिन्हा, पृश्ष्ठ 131

6. वही, पृष्ठ 129
7. भ्रमरगीत सार– आ0 सुक्ल, पृष्ठ 123
8. सूरसागर सार– डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 162
9. सूरदास–आ0 सुक्ल, पृष्ठ 12
10. भ्रमरगीत सार– आ0 सुक्ल, पृष्ठ 50
11. सूर की काव्यकला– डॉ0 मनमोहन गौतम, पृष्ठ 117
12. स्वर्ण काव्य मंजूषा– श्रीकृष्ण कुमार सिन्हा, पृष्ठ 117
13. वही, पृष्ठ 177
14. वही, पृष्ठ 178
15. अष्टछाप के कवि– कृष्णदेव, पृष्ठ 232
16. वही, पृष्ठ 157
17. वही, पृष्ठ 132
18. स्वर्ण काव्य मंजूशा– श्रीकृष्ण कुमार सिन्हा, पृष्ठ 198
19. वही, पृष्ठ 100

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में यथार्थवादी चेतना

डॉ० राजू राम

ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी कविताओं और साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम से दलित चेतना तो जागृत करते ही रहे हैं, समाज की आपसी दूरियाँ भी कम करने का अनथक प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने एक स्थल पर लिखा है – 'दलित कविता सामाजिक आंदोलन का सांस्तिक प्रतिफलन है। अन्य काव्यधाराओं की अपेक्षा दलित कविता का सीधा संबंध मानव जीवन की जमीन से है।'1 कवि में नये सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने की छटपटाहट है। वे एक संसार की कल्पना करते हैं, जिसमें छूत–अछूत, द्वेष, ईर्ष्या की जगह मानवता हो, भाईचारा हो और समानता का भाव हो। इस वैचारिक आंदोलन की वह पूरी तरह वकालत करते हैं। 'ठाकुर का कुआं' शीर्षक कविता में उनकी उक्ति है –

चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की।
तालाब ठाकुर का।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की।
बजरा खेत का, खेत ठाकुर का।
बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की
मूठ पर रखी हथेली अपनी।
फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का
पानी ठाकुर का, खेत–खलिहान ठाकुर के।
गली–मुहल्ले ठाकुर के
फिर अपना क्या? गांव? शहर? देश?2

कविता के शब्द–शब्द में चुभते हुए व्यंग्य हैं। ये व्यंग्य सहृदय पाठक के हृदय में सीधे उतर जाते हैं। जिस समाज में जीने का हक भी अपना नहीं है, कवि के शब्दों में फिर अपना क्या है? डॉ० रजत रानी 'मीनू' को इस कविता के संदर्भों पर डॉ० अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों का प्रभामंडल दिखाई देता है। यह सच भी है। उनके शब्द हैं – 'कवि वाल्मीकि ने डॉ० अंबेडकर के प्रभाव को सामाजिक संदर्भ में गंभीर दायित्व बोध के साथ लिया है। भावुक और सतही विचारों के अंबेडकरी कवियों से वह एकदम विशिष्ट हैं। डॉ० अंबेडकर ने जिन प्रश्नों को समाजशास्त्रीय ढंग से उठाया था 'प्रेमचंद' ने कथात्मकता के रूप में अपनी रचनाओं में दलित दालित्य का चित्रण किया। कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता 'ठाकुर का कुआं' और प्रेमचंद की कहानी' ठुकर का कुआं' अपनी अंतःवस्तु में बहुत नजदीक है। जबकि इनमें कई दशकों का अंतराल है। यह अंतराल आजादी मिलने के बाद का भी है और दलितों की स्थिति में कोई खास अंतर इस दौरान आया दिखाई नहीं पड़ता। सांकेतिक रूप में यह कविता इसी दुखद

पक्ष की ओर ध्यानाकर्षित करती है।'3

अपनी कविता में कवि ने दलित समाज की वास्तविकता की ओर संकेत किया है। वास्तविकता यह है कि पीने के पानी और आत्मसम्मान के नाम पर आज भी दलितों का शोषण बदस्तूर जारी है। डॉ० अंबेडकर ने महाड़ आंदोलन के जरिये पीने के पानी का कूफ़ तो तोड़ दिया था, शिक्षा और संघर्ष का मंत्र भी दिया था पर परंपरावादी सामंती वर्ण–व्यवस्था उसमें लगातार रोड़े अटकाता रहा और डोहिया तथा झज्झर जैसे क्रूर कांड होते रहे। ओमप्रकाश वाल्मीकि समाज की इस व्यवस्था पर सीधे–सीधे प्रश्न करते हैं और उनसे कहते हैं कि

साफ सुथरा रंग तुम्हारा
झुलस कर सांवला पड़ जायेगा।
खो जायेगा आंखों का सलोनापन
तब तुम कागज पर
नहीं लिख पाओगे
सत्यम्! शिवम्!! सुंदरम्!!!
देवी–देवताओं के वंशज तुम
हो जाओगे लूले–लंगड़े और अपाहिज।
जो जीना पड़ जाये युगों–युगों तक
मेरी तरह
तब तुम क्या करोगे?4

दलित कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि हों या जयप्रकाश कर्दम, कंवल भारती हों या श्यौराज सिंह 'बेचैन'–सबने जातीय दंश का यह प्रश्न खड़ा किया है कि यदि मेरी जगह तुम होते तो क्या होता? इसी से आगे वे फिर प्रश्न करते हैं –

यदि तुम्हें मरे जानवर खींचकर
कहा जाये ढोने को।
पूरे परिवार का मैला।
पहनने को दी जाये उतरन
तब तुम क्या करोगे?5

इस तरह ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं से ध्वनित होता है कि उनमें यथार्थवादी दलित विमर्श इस तरह गुंफित है कि वह एक विशाल शक्ति के रूप में दिखाई देता है। वे कविता कविता लेखन के लिए ही नहीं करते बल्कि उससे वह अपने अभीष्ट की सिद्धि भी करते हैं।

श्री वाल्मीकि न सिर्फ पूर्व और वर्त्तमान की व्यवस्था पर प्रहार करते हैं बल्कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सजग भी दिखाई पड़ते हैं। अधिकार मांगने की नहीं बल्कि लड़कर लेने की चिज है इसलिए इनकी दृष्टि में दलित साहित्य दलितों की पीड़ा, उत्पीड़न, शोषण और उनके विरुद्ध उनके आक्रोश (कभी–कभी प्रतिशोध भी) तथा परिवर्तन

के संकल्प का साहित्य है, जो जातिविहीन समाज का सपना पालता है। इन्होंने सदियों की वेदना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है –

कभी नहीं मांगी बालिश्त भर जगह
नहीं मांगा आधा राज भी।
मांग है सिर्फ न्याय
जीने का हक
थोड़ा–सा पीने का पानी।

और वे धूप, हवा, रोशनी, सुख, चैन, किताबें, बचपन और अपनापन की चाह करते हैं, वहीं सवर्णों के व्यवहार और अन्याय पर कराह उठते हैं6 ..... "खामोश आहटें/आने वाले महाभारत की" ध्वनि सुनकर।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाल्मीकि जी अपने जीवन का सच और समाज के सच को मिलाकर एक करुणा का सागर तैयार करते हैं और पाठकों को उस समुद्र में निमग्न होने के लिए छोड़ देते हैं। वाल्मीकि जी ने समाज के समक्ष एक चुनौती रखा है और आने वाली पीढ़ी के लिए यह चुनौती समाधान बनकर उपस्थित होगी।

संदर्भ ग्रंथ –

1. अंगुत्तर (त्रैमासिक) दिसम्बर 1993, पृ० 17
2. सदियों का संताप, ओम प्रकाश वाल्मीकि, पृ० 31
3. हिन्दी दलित कविता, रजतरानी 'मीनू' पृ० 69–70
4. सदियों का संताप, ओम प्रकाश बाल्मीकि, पृ० 300
5. वही, पृ० 31
6. दलित चेतना और स्त्री–विमर्श, विजय कुमार संदेश, पृ० 67

ENGLISH VERSION

ROMANTIC TRADITION AND SHELLEY

DR. GAGAN KUMAR PATHAK

Abstract :-

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical criticism."

T. S. Eliot

The Romantic Revival of the Nineteenth century is reminiscent of the flourishing of romanticism is the Elizabethan age. Shakespeare, the greatest poet-playwright of the Elizabethan age, was essentially a Romantic poet roaming in the Greenland of fauna and flora. But with maturity, we find a discernible change in his attitude as we find in case of Keats and Yeats. Early Keats and Yeats were also enamoured of Nature's intoxicating beauty. Shakespeare's early poems like those of Venus and Adonis and The Phoenix and Turtle, Keats' Band of Passions and of Mirth and Fancy and Yeats' Lake Isle of Innisfree and The Song of the Happy Shepherd, for instance, show their love for nature portraying its beauty. But we notice in them, a gradual progression towards maturity.

Where Coleridge weaves and unweaves dreams, Wordsworth instinctively turns to the common man and common things leaving Thomas Moore in his Utopia. Because of their passion for reformation, Shelley and Byron find larger sympathetic audience - where Shelley stirred them with the oratory of a Brutus, Byron generated commotion among them through cool logic of a Mark Antony.

Like the Elizabethan age, this was essentially an age of poetry. The young enthusiasts Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Moore and Southey took to poetry as naturally as a happy man turns to singing. Poetry was the mode of spontaneous outburst, the medium of expression chiefly being poetry. It was, however, not unalloyed. Gems of prose are studded in poetry by Charles Lamb, Jane Austen, De Quiency and so on.

The age of Romanticism stood in sharp contrast with the 18th century neo-classicism, which was essentially an age of prose. It was an age of restraint and order; an age of polish and refinement in society and art. It was an age of cool logic and reason. The Romantics found themselves at loggers head with the conventionalism of the 18th century. Thus, in a way, it was the climax of reaction towards the neo-classical convention for which, the way was prepared by their precursors.

It is under this background that the genius of the Romantic poets in

general deserves to be estimated with special reference to that of Shelley in particular.

Keywords :-

Optimism, Curiosity, Reformatory Zeal, Coveted Place, Unpremeditated Art, Creative Spark.

Introduction :-

On close reading of the works of Shelley one is apt to listen to his two voices. One is that of a violent reformer voicing a vain rebellion with Byron as manifested in **Revolt of Islam, Queen Mab, The Witch of Atlas** and so on and the other is the one as reflected in **Alastor, Adonais** and his wonderful lyrics. Here he looks like a wanderer "following a vague beautiful vision, forever sad and forever unsatisfied,"1

Shelley had a multifaceted personality. He was a visionary, an enthusiast, a radical and above all a revolutionary. He learnt rapidly and enthusiastically. He studied classics with devotion and absorbed them well. His essay **A Defence of Poetry** shows his study of the classical masters. He also looked towards Nature with awe and admiration so much so that:

"While yet a boy, I sought for ghosts, and sped
Through many a listening chamber, cave and ruin,
And starlit wood, with fearful steps pursuing
Hopes of high talk with the departed dead."

--Hymn to Intellectual Beauty.

Here it is clear that his curiosity and thirst for knowledge right from his childhood drew him to the unknown and mysterious. He was like a Faustus who had bartered away his soul for the sake of knowledge - unquenched in his zeal to catch a falling star. This inner flame of heart endures Shelley's reputation giving him a unique and enduring place in the history of English poetry in general and among his contemporaries in particular.

Discussion :-

Shelley directly inherited the tradition of the early Romantics of the 19th century which was completely soaked in romanticism. Wordsworth, Shelley, Keats, Byron and Coleridge were the chief poets of the Romantic Revival of the 19th century. Shelley had not to innovate or initiate the tradition but he got one. Thus, he perpetuated the tradition with enthusiasm and vigour to the farthest end.

But so far his attitude to Nature and life was concerned; he was not a true descendant of his predecessors. We always discern in his poetry a sense of disquietude, eagerness to accomplish some task. He was haunted by the evil force in life. The French Revolution of 1789 which was an outcome of the exploitation and oppression of the have-nots by the aristocrats served as a powerful stimulus. He presented strongly the oppression let

loose on the humble and the meek. Influenced by this Revolution Shelley developed a kind of hatred towards authority. He rebelled against oppressive social, political, economic and even cultural institutions. Rousseau's precept "Man is born free but he finds himself everywhere in chains" also stirred the young mind of Shelley. It is this reformatory zeal that distinguishes him from most of his contemporaries.

If Wordsworth was important for his sonnets and lyrics, Byron for his romantic satires, Keats for his Hellensism and sensuousness, Coleridge for creating twilight beauty in poetry, Shelley was important for his reformatory zeal betraying the cravings of a restless soul. He says "I am one of those whom nothing will fully satisfy, but who am I to be partially satisfied by all that is practicable."2 Therefore in the art of Shelley there is the sense of urgency. He wants to transmute his experience into art before his creative spark is extinguished. He hardly pauses to think how he can present his feelings and emotion in art form except what critical faculty goes implicitly with the process of creation. Perhaps it is on account of this that he has been criticized on the ground of art. However, if Wordsworth's maturity could be seen in his valuable Sonnets and Keats in his Odes, Shelley displays his adulthood in his plays. That he was gaining experience and wisdom was discernible even in his mature poems like **Ode to the West Wind** where he says:

"Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life, I bleed !"3

But then again a note of optimism is struck in the concluding lines

"O Wind,
If winter comes, can spring be far behind?"4

He says "Let us believe in a kind of optimism in which we are our own gods."5 And then again in **To A Skylark** where his oft-quoted line occurs:

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."6

Such powerful lines cannot be written by a third-rate or minor poet with any maturity at all. Thus to label Shelley as the one who altogether lacked in substance does not appear to be fair.

In respect of subjectivity Shelley again shares his zeitgeist. It was an age in which there was strong under-current of subjectivism. One of the reasons for this might be the lack of objectifying the artistic experience or creating art out of experience not amenable to art. Here one may recollect Matthew Arnold's view when he censors Dryden and Pope as being the masters of poetry. He at best considered them to be great masters of prose. His argument that poetry deals with noble satires dealt generally with ignoble passions of life, like malice, jealousy, hatred, prejudice and so on they cannot be considered poets. But Matthew Arnold here gives vent to his own bias and prejudice. In fact, there is no water tight compartmentalization between subjects apt enough for poetry on the one hand and prose on the

other. Entertaining such a view is bound to prohibit proper appreciation. Despite Arnold's rejection Dryden and Pope remain great poets, and their satire stands as a 'noble trade.' Thus the latter view that Shelley's art, being an outcome of experience not worthy of artistic delineation, does not hold ground.

Lack of objectivity, however, cannot be denied. The romantics in general were so preoccupied with self that they could look beyond their selves only at a later stage. At the early stage they looked at the world with coloured spectacles. Shelley was no exception. He was rather far more subjective than perhaps any of his contemporaries.

The art of theatre, however, needs objectification of the artist's experience and thought. And because the age to which Shelley and Keats belonged was deficient in this respect, drama did not find favourable social milieu. The genius of a Shakespeare is a rarity. Shelley, however, has made a daring attempt to accommodate his essentially lyrical genius into the dramatic form. Shakespeare or even Ben Jonson accomplished this job with utmost perfection. They handled the theme, character and so on adroitly. It does not matter if Shelley could not do so with the degree of perfection Shakespeare or even Eliot did it. But the very attempt at drama by Shelley gives him a coveted place in the history of English drama. Herein lies his individual talent. Jai Shankar Prasad, a Hindi poet of the romantic tradition, occupies singularly coveted place in Hindi literature. He also wrote some Hindi dramas. But they are not very successful - not because he talked irrelevant but because his dramas were deficient from the point of view of stage craft. The footwork and scenic arrangements were so intricate and complicated that they defied theatrical norms. Shelley deserves to be classified with a playwright like 'Prasad' who despite his technical blemishes is widely read, if not staged, and appreciated.

For want of having provided theatrical base the dramas of Prasad and those of Shelley are enacted in the mind. **Prometheus Unbound** has been termed as impressionistic perhaps in the modern theatrical sense. This brings Shelley's **Prometheus Unbound** on par with Eugene O'Neill's **Emperor Jones** for this too is impressionistic because here subjective moods, concepts and mental states are projected into dramatic visibility. Jones here is the archetype of humanity and he is put to death by 'Little Formless Fears.' Coming to Prometheus we find that he too stands for the agonized soul of every man seeking liberation from bondage and is tortured by his own mind. Thus Richard Harter Fogle does not appear to be far from the truth when he says:

"Prometheus Unbound is a drama of the mind in a sense in which Keats' Hyperion for example, is not. Its characters are a step closer to the abstractions of allegory; they have less reality independent of the mind of their creator."7

"Shelley, however, does not find any inherent dichotomy between the

reality of the mind and that of the external world, meaning thereby that mental projection, at bottom, closely corresponds to the external reality. His method is reverse to the method and technique of Keats. Where the former begins with subjective ideas and expresses them with concrete imagery and so on, the latter begins with sensuous perception and goes on to build upon it. Elaborating his method Shelley points out "The imagery which we have employed will be found, in many instances, to have been drawn from the operations of human mind, or from those external actions by which they are expressed. This is unusual in modern poetry…."8

Let us for the time being go back to the age of Shelley when the modern psychological dramas, fiction and stories were not in vogue. The new psychological explorations were not known. The dramatic art was appreciated by the standard set by Shakespeare and his contemporaries. Under this background how could Shelley's dramas where action took place much more on mental than the real plane be appreciated? Shelley had to pay price for this. He was thought to have neglected the story element and that his characters did not come up to the expectation of the audience. There was no blood and thunder in drama. Nor was the drama enacted on the physical plane. These accounts for Shelley having been considered 'abstract' and 'expressionistic' are creating images of finite-infinite relationship. This cast a deep shadow on Shelley as a playwright. The poet in Shelley eclipsed the dramatist in him.

His poetry abounds in rich images drawn mostly from Nature-light, sea, clouds, mountains and so on. This kind of imagery coupled with those "drawn from the operations of human mind" lends peculiar air to his poetry and it is this quality which is thought to have made his poetry vague and abstract. But Humphrey House rightly considers that "Vagueness, profusion, and complexity of the images are among the greatest attractions, it is indeed poetry not perfectly understood; but it is poetry loved with greater intensity and passion than any poetry afterward."9

Virginia Woolf has suggested that the artist is like an oyster, irritate him with a grain of sand, and then he will create pearls. This grain of sand in relation to an artist is the experience. The calm and quietude of his mind gets disturbed and it seeks expression in viable art form. Shelley's poetry is almost 'unpremeditated' whereas Wordsworth's is not. He lies upon his coach 'in vacant or in pensive mood' as the scene of the host of daffodils he has seen dancing and tossing their heads revive in his mind. To him "poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings" to Shelley it is 'unpremeditated' art and that "the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence, like an inconstant wind, awakens to transitory brightness……."10 To Coleridge, however, it is like a burning coal. In this respect Shelley appears to be closer to Coleridge than to Wordsworth. It is this urgency on the part of Shelley to create art which has awakened to 'transitory brightness' in relation to some stimulus. In the process Shelley's

personality inevitably creeps in. In this respect he hardly conforms to Eliot's dictum, "poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality."11

Before Shelley wrote Prometheus Unbound and The Cenci he seems to have read the Greek masters of dramatic art apart from Shakespeare. His observations about them show that he was infected with their art. He speaks very high of them.

"... The Athenians employed language, action, music, painting, the dance, and religious institutions, to produce a common effect in the representation of the highest idealism of passion and power; each division of the art was made perfect in its kind by artist of the most consummate skill."12

And then again he laments:

"We have tragedy without music and dancing; and music and dancing without the highest impersonations of which they are the fit accompaniment, and both without religion and solemnity."13

These passages from Shelley's most important essay A Defence of Poetry show how he admired the ancient masters of dramatic art. Where he appreciates them for their adroit handling of 'idealism of passion and power' achieved not only through action but also through music, painting and dance, he bemoans the lack of these characteristics in modern tragedy-modern in relation to Shelley. According to him religion and solemnity go well with music, painting and dance rituals. In the oriental world also music and dance have been deemed as essential complements of religious offering and rituals. These are the methods employed to please the deity. The Sun temple of Konark, for instance, abounds in amorous sculptures. The drummers and dancers are also inscribed on the temple showing the role they had in religious spheres. The use of chorus in the Greek plays serves this purpose. This explains why Shelley copiously used choruses in Prometheus Unbound and Hellas. T.S. Eliot in his poetic plays also uses the Greek device of chorus showing an affinity with the great masters of drama. Perhaps this is one of the links through which Eliot falls in the European line. He has pointed out that to acquire meaning and significance just perpetuating a tradition or modifying it is not enough. For him an artist has to develop European consciousness.

Conclusion:-

"The essence of Romanticism was that literature must reflect all that is spontaneous and unaffected in nature and in man, and be free to follow its own fancy in its own way ..... In Coleridge we see this independence expressed in Kubla Khan and The Ancient Mariner, two dream pictures. One of the populous Orient, the other of the lonely sea, In Wordsworth this literary independence led him inward to the heart of common things."

Shelley was greatly influenced by the Roman masters. The very Roman locale instilled in him the sense of drama. He wrote to his wife "The charm of the Roman climate helped to clothe his thoughts in greater beauty than they had ever worn before." Adding further he says :

"My Prometheus Unbound is just finished, and in a month or two I shall send it. It is a drama with characters and mechanism of a yet unattempted; and I think the execution is better than any of my former attempts."

It is thus obvious that Shelley was not just a dreamer building his dome in an ivory tower where he sang to himself. Of course, he had come to terms with life. His artistic vision was broadened under Roman influence.

References:-

1. William, J. Long : English Literature, Enlarged Edition, Kalyani Publishers, New Delhi, 1978, pp. 372-73.

2. Ibid., p. 412.

3. Shelley's Letter to Leigh Hunt, Nov. 1819, ed. F.L. Jones, Oxford, 1964.

4. Shelley's Letter to Maria Gisborne, Oct. 1819, ed. F.L. Jones, Oxford, 1964

5. G.M. Ridenour : Shelley : A Collection of Critical Essays, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1980, p. 19.

6. Shelley : Preface to Prometheus Unbound, Shelley : Poetical Works, ed. Thomas Hutchinson, O.U.P., London, 1970, p. 205.

7. Humphry House : The Poet of Adolescence, 'Shelley : A Collection of Critical Essays', ed. George M. Ridenour, Prentice- Hall of India, New Delhi, 1980, p. 48.

8. Shelley : A Defence of Poetry : English Critical Eassys (19th Century), ed. Edmund D. Jones, O.U.P., London, 1965, p. 132.

9. Eliot, T.S. : Selected Essays, Faber & Faber, London, 1951, p. 21.

10. Shelley : A Defence of Poetry, op. cit., p. 114.

11. Ibid., p. 274.

12. Mrs. Shelley : Note on Prometheus Unbound, op. cit., p. 274.

13. Ibid., p. 274.

CHALLENGES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE AT UNDER-GRADUATE LEVEL IN JHARKHAND

VIJAY AIND

Hindi is the Official language of India and English has a status of associate language, but in fact it is the most important language of India. After Hindi it is the most commonly spoken language in India and probably the most read and written language in India. English in India is used not only for communicating with the outside world, but also for inter-state and intrastate communication. Because of the great ethnic and linguistic diversity found within our nation, English acts as an indispensable 'link' language. English symbolizes in Indians' minds, better education, better culture and higher intellect. Indians who know English often mingle it with Indian languages in their conversation. It is also usual among Indians to abruptly move to speak fluent English in the middle of their conversations. English also serves as the communicator among Indians who speak different languages. English is very important in some systems - legal, financial, educational and business in India.

Thanks to the globalization in all the fields, it necessitates the learning of a language which is international. Undoubtedly, English has become a world language rather than the language of only the English speaking countries such as the UK and the USA because the number of the people who use English as a means of communication exceeds much more than the number of the people who speak it as their mother tongue. In the case of English in India, more than two centuries, India has been directly and indirectly had influence of the language, English on all the fields, such as Education, Medical Science, etc. Text materials relating to the subjects of Science, Engineering and Technology as also Medicine are available only in English. Moreover, all over India, there is no single language to unite the whole country. Since, in India, several languages are spoken and also one set of people are reluctant to learn one common Indian language, we have to borrow a new non-Indian language. Considering the above facts, learning English, the universal language, as a Second Language, becomes inseparable branch as also unavoidable in Indian education system.

The liberalization of the Indian economy ushered in all kinds of reasons to learn the language. While earlier in the century students who had specialized in English joined either teaching or the civil services, now a whole new spectrum of job opportunities has opened up. There are now call centres, shopping malls and trade fairs that need trainers to equip their employees with communication skills, there are multinationals who have

been recruiting marketing staff who needed to be taught spoken English, there are medical transcription centres which need efficient translators and reporters. Those desirous of immigration to the west needed professional help for clearing tests like the IELTS. Hence, the avenues where ELT came to be required in India are unlimited today.

The change was first observed at the social, political and economic levels. Suddenly, English ceased to be the badge of status for the upper crust. Earlier, only the upper classes and a few limited size groups were seen using English in everyday life. The middle class reserved it for official purposes or those social occasions where they wished to leave an impression. The lower classes thought the use of English was beyond them and since the government schools of India made no effort to teach any kind of spoken English, this category of people had no exposure to it. However, around the year 1995, the whole paradigm began to change. The liberalization of the economy led to the advent of multinationals resulting in many developments like varied job opportunities that demanded a command of English, more English channels on the television, an increasing number of English publications and international lifestyles becoming a tempting option.

The developments that have taken place in ELT methodology in the West took some time to reach Indian classrooms. The evolution of ELT in India, as in any other EFL country is linked with factors that are not pedagogic alone. Today, English cannot be termed a foreign language in the Indian context, but in times past, it was a foreign language and its teaching had to take cognizance of all factors, pedagogic or otherwise. The two figures tracing the growth of ELT given here are different because ELT pedagogy developed primarily in the West where political and social realities were different and the status of English was fixed whereas, in India, ELT pedagogy depends upon the subtle and not-so-subtle ways in which the status of English keeps changing. No diagrammatic representation can be complete without taking into account the fluid nature of the position of English in Indian society.

In spite of the slower rate of evolution, English Language Teaching in India has been widening in its approach and methods. The result is that there is an increasing tendency, scope and intent of reaching the end of the ELT cone. At its own eccentric pace, ELT in India is today in step with the rest of the world today. Where the issue of methodology is concerned, ELT seems to be in three transient stages according to the different levels of the paradigm and its demands:

1. The first level is that of the institutions run by the government, mainly primary, secondary and high schools. Since the primary goal of these institutions is to provide education at affordable and subsidized levels to the public, ELT teaching cannot be placed at the widest end of the cone for the basic reason that the teachers there do not have much access to latest research and materials for reasons economic as well as geographic. Most of these institutions are the sole providers of education in rural and

remote settings where they can fulfill adequately the basic requirements alone. In the urban locales the planning bodies are now moving towards up gradation through teacher training, syllabus modification and improved resources. In another decade or so, this level of ELT should be more communicative in nature with language and literature fully integrated.

2. At the second level are those institutions that are semi-government or are run by private managing bodies, assisted through government funds. These also include undergraduate colleges and postgraduate universities. Growth and development can be seen here in spurts. In some classrooms, teachers have reached the widest end of the cone, are aware of learner needs and adjust methodology accordingly and use a judicious blend of interaction and communication in the class. In others, an observer feels caught in a time warp with pure talk-chalk lectures that are mostly teacher-centred. The positive observation is that there are practicing teachers between these two poles, who are trying to change their teaching practice and are looking at alternate methodology. Just as there is a mixed bag of teaching practice, the institutions also range from indifferent to proactive. While there are places where even a small audio player is not accessible, there are administrators who have invested heavily in state of the art, perfectly equipped language laboratories.

3. The third level comprises pure private sector academies (Spoken English Courses) that undertake to make learners proficient English users within a stipulated period, of course by charging a fixed amount of fee. Since time means money for them, they are equipped with the latest materials like interactive, multimedia software. Jobs in the academic area are few and far between, so an increasing number of qualified teachers find their way to these places. The teacher profile gets younger and younger, resulting in increasing amounts of innovation and experimentation where methodology is concerned.

There are so many factors that affect the teaching-learning process in India. The students in India can be categorized into two; the one is having the regional language as medium of study from the primary level and the other is having English as the medium of study. Hence, the problem of teaching English as a second language, to the Indian students starts from the pre-schooling.

1. Little insight of the aims of teaching English :

The aim of teaching English in India must be quite different from those which are considered necessary for an English child. Referring to the later L.A.C. Strong writes, "For us to speak English, English is everything, English is what we say and what we think. English is our relationship with other people, our friendship and our truth and untruth, our character, English is not a subject English is our life." What Strong says about the position of English is taught as a foreign language. Hence, the main aim of teaching should be to help children to acquire practical command of it so that it may be useful to them in everyday life.

There have been frequent changes in government policy towards the teaching and learning English in several states. "We have examples of more than one state where, only a few years ago, English was taught as a compulsory language and however low the competence attained, pass mark had to be secured in the English paper in order to get through the high school examination. Today, largely because of the mounting concern caused by an alarmingly high percentage of failures in the subject at different end-of-the year and school leaving examinations, the governments have decreed that success in English should no longer be considered essential for admission in under-graduate courses at the university."1

The primary aim of teaching English at this stage should be to concentrate on the fundamental skills of the language ability of the students namely listening, speaking, reading and writing. It is of paramount importance that the teacher should know what his task is and what he is trying to achieve by teaching English. In the syllabuses of colleges, we do not have a specific plan of what to teach and when to teach, as it is there in syllabus of school. It is for the teacher to decide how and when to teach a particular teaching item. Thus, they want to cover the whole course without reading its aims and objectives. They believe to go on with their job of teaching without knowing the difficulties of the learner. The teacher should be fully aware of the fact that his student's proficiency in English is not up to mark owing to the deteriorating standard of teaching in schools. Our objectives of teaching English should be practical and in keeping with the standard of proficiency achieved by our students. We should emphasize that the main aims of teaching English is to develop the ability of students to read and understand books, journals and reference material in English.

2. Dearth of competent Teachers :

Apart from a One-year course in teacher training for schoolteachers, no formal teacher training is given to new recruits or practising teachers. There are orientation courses and refresher courses for teachers in general, but no course deals with ELT. It is only recently that the British Council has introduced CELTA and other such programmes; these are quite expensive, teachers do not want to spend money on them and their institutions rarely sponsor them. The teacher of English is incompetent to realize the need for and significance of English in the new perspective. They fail to revise their aims in the new setting and also to teach English most effectively within a short time. We Teachers should realize that a lot of responsibility rests on our shoulders T.P.Reddi in his presidential Address said in October 1977, "We, the teachers of English, are keenly alive to responsibility that rests on us. We have to see that English is taught at all levels and taught well and its standards are properly maintained".2

The teachers of English of colleges do not keep themselves abreast with the recent developments in the field of linguistics and theories of learning and teaching, without which they cannot teach their students

effectively. The problem of dearth of competent teachers arises due to the lack of teachers who are specialized in the method of Teaching English.

3. Defective textbooks and curriculum :

The next important problem of teaching English in colleges is bad Textbooks. There is a mistaken idea that the standard of English is raised by the prescription of difficult books. Speed in reading can be achieved only through the provision of books which students can read with comprehension. Where books are beyond the ready comprehension of students, distaste for reading is created. This unfortunate attitude is one of the obstacles which the college teacher has to overcome. University syllabus does not fully satisfy the present objectives of the teaching of English. Books are often prescribed which reflect English life and culture and are less understood and appreciated by students. Books containing common vocabulary and common themes would have been more useful. The prose book about physical and social sciences may be more useful. The purpose of any prose book is to enable the students to develop the stock of words and thus such words can be used in our daily lives are certainly more useful. For e.g. the introduction of Shakespeare's plays at degree level is not practical, because to teach Shakespeare to the students who are not sound in linguistic skills is nothing but to try to make a super structure on the sandy foundations.

4. Traditional system of Examination :

The examination system is more achievement oriented rather than performance oriented, leading to an emphasis on grades and positions rather than issues of fluency or proficiency. Indirectly, the teacher remains in many classrooms even today, the facilitator of examinations rather than of linguistic or communicative proficiency. One of the factors responsible for the deterioration is the pattern of question-setting. It is easy to predict what questions would be asked on what books in which examinations. The students simply have to memorize. The teacher also teaches only those aspects which are important for the examinations. Students, teachers are not given proper orientation and teachers are to be blamed for this. Students of English Honours are expected to be proficient in spoken English as well. They are unable to posses the ability to develop the power of written and oral expression in a classroom situation. Some marks should be reserved for internal tests also, which is also lacking in the evaluation system. It has been seen that such teachers who are engaged in private tuition or associated with coaching classes or institutions on commercial lines encourage the penetration of corrupt and dishonest practices into the academic life on the campus. It is mostly these teachers who reduce centralized evaluation of answer books to a state of farce. They can never be serious examiners. They even evaluate their part of answer books without caring for the merit and the demerit of the answer scripts. Such examiners should be debarred permanently from examination and evaluation work.

5. Obsolete Methods of Teaching :

The methods and techniques used by the Teacher are faulty and out of date. The programme of teaching is carried out by inefficient methods in classroom. Of course, good teachers are more important than good methods, but an efficient teacher can improve remarkably the quality of teaching by applying good methods and techniques of teachings. Most teachers in Jharkhand use the grammar translation method. For e.g. A teacher comes to class, picks up a textbook of the prescribed syllabus, opens it and starts reading himself and then tells the meaning of some lines or all lines in Hindi. Everything cannot be translated as it is in Hindi. Some teachers are very conservative in their approach and they are not ready to learn any new methods and techniques of Teaching English. In other places we often witness teachers using the lecture method and they are very much comfortable using it and they ignore the other methods of teaching.

6. Insufficient provision of audio-visual aids :

Many teachers are unable to teach English effectively because they face a lot of problems due to the lack of Teaching-Aids. There are very few audio-visual aids available and it is insufficient for the teachers to use it effectively. Some are so costly that the colleges can only afford to buy a few and the power cuts in the state makes the situation even worse.

7. Shortage of time :

In most of the colleges, classes are not held due to the lack of adequate number of teaching staff. Sometimes teachers rush for the syllabus completion. They are in lack of time for doing other activities including different methods of teaching English like Role play, Play-way, Dramatization, etc. in the class. Most of the Teachers practice the Grammar Translation method and out of the 50 minutes of the period we discover half the time i.e. 25 minutes are gone in translation and students gets just 25 minutes or less to listen to English Language. There may be a better understanding of the passage being studied this way, but the students, in fact, learn less English then they would have done if the teacher had taught the passage by techniques which use questions, illustrations and simple practice drills. The teacher also doesn't have time to carry out the interaction with the students in English. Moreover teachers are engaged in the invigilation and evaluation works.

8. Unsatisfactory supervision :

The next problem is due to the unsatisfactory supervision by the teachers. The teachers in most of the colleges are least bothered about the students. They only guide the clever students, who are always very active in the class, and for others they develop a negative attitude. Most of the teachers fail to supervise the student's homework or their potentials. The teacher should try to help the students who are weak and should try to sort out their learning disabilities by supervising them from time to time.

9. Crowded classes :

The size of the classes everywhere was considerably large and thus, student's participation in the class work was quite impossible. The ratio of students in relation to teachers was not proportional. This is one of the reasons why individual attention is not possible to the students. For individual attention, there is a provision of Tutorial classes but the number of students in Tutorials also is again very large, because most of the college can afford neither so many rooms for this purpose, nor so many teachers to conduct effective teaching of English. It should also be recognized that the practical work in the teaching of English demands that the number of students in the class be limited.

10. Inability of the Teacher to understand the difference between the teaching of literature and the teaching of language skills :

One of the reasons for the declining standards of teaching English is the inability of teachers to understand the difference between the teaching of literature and the teaching of language skills. Everybody knows that the study of a language is not an end in itself, it is a means to develop one's power of expression and comprehension can be achieved by mastering stylistic elements of the language. According to A.K.Sharma:

"English language teaching in India, you will agree with me, has suffered a lot - so much that our students who pass intermediate or degree examinations with English either as a compulsory or as an elective subject, can neither speak nor write correct English. May be, because the emphasis in our schools and colleges has always been on the conceptual content and the stylistic content has been neglected so far".3

11. Teacher's and student's Regional Dialect affecting proper pronunciation :

This is a very crucial problem with most of the teachers teaching English. When the teachers try to speak English, they carry their own regional dialects into English. They have difficulty in pronunciations and are not cautious about the stress and intonation of their own speech. They teach incorrect phonetic transcriptions, pronunciations, stress and intonations to the students.

Thus, there is much to be done to improve the standard of ELT in the state. The following are some of the suggestions and measures in this regard:

The policy regarding the place and position of English in the school and college curriculum should be well defined, utilizing the different methods of Teaching in the classroom teaching-learning process:

The teacher while teaching English should use the different methods of teaching English to the students. The different methods will make the teaching and the learning of the students effective. Some of the methods of teaching English are as follows: The Grammar Translation Method, The Direct Method, The Oral Approach/ Situational Language Teaching.

The teacher should keep in mind the aims of teaching English:

The teacher should always emphasize on the aims of teaching English.

These aims are :

1. To enable the students to understand English when spoken,
2. To enable him to speak English,
3. To enable him to read English,
4. To enable him to write English.

Special efforts should be made to ensure that teachers get proper teaching facilities, including space, books, and teaching aids (audio-visual aids). The school and the college libraries should subscribe good journals which may enable them to know the latest developments in the field of linguistics and English Language Teaching. The number of students should be limited in the classroom so that individual attention can be given to each student. Text books should be introduced which cater to the need of the students. Last but not the least workshops and refresher courses in the field of ELT should be organized to make the teachers competent and up-to-date with the changes in the field of ELT.

CONCLUSION

The whole academic process is so unwieldy that it fails to respond to learner needs; learner response is too often ignored. The ELT cone of India is broadening at the base today because of factors that have little to do with the ELT classroom in academic institutions. The irony of the situation is that while academicians label these learning centres 'shops' or 'commercial institutes' it is these establishments that are a major influence behind the changing face of the ELT paradigm in India.

REFERENCE

1. Report of the study group of Teaching English, 1971, page 6.
2. Ram Kumar Sharma, Problems And Solutions Of Teaching English, New Delhi: Janaki Prakashan, 1999, p. 16
3. 4. See Ram Kumar Sharma, Problems And Solutions Of Teaching English, New Delhi: Janaki Prakashan, 66-67.

HUMANITARIAN COMPASSION AND HUMANISTIC CONVICTION IN MULK RAJ ANAND'S NOVELS: UNTOUCHABLE AND COOLIE.

MANTOSH KR. PANDEY

"For Arts sake, I shall not take a toil to write even a single sentence"- G.B Shaw in preface to 'Pleasant plays'.

Mulk Raj Anand, a writer with deeper social commitment, shines as a luminary in the firmament of Indo- Anglian fiction. He has won the accolade as an undisputed champion, a messiah of the underdogs in Pre -Independence India. Anand vents out deep concern of the plight of the havenot in colonial India where the human are treated out of their economic and social identity and backdrop. A staunch socialist, Anand emerges with greater sense of respect for Rousseau's opinion- " Man is born free but every where he is in Chains" 1. He proves that the human predicament is not an inborn property but an outcome of social evil thrust upon by the materialistic, utilitarian society without values.

"The 20th century is a great turning point in human history and through out main struggle remains the search for individual values, in so far they are increasingly open to reinterpretation and discussion, it is necessary to explore the sensibilities of all human beings whether in the factory, in the village squire, or in the drawing room.... 2.

Anand became a novelist with a mission and his theory of novel is naturally in line with his commitment to his creed. Explaining his choice of his form in preference to others, Anand says—"The form of creating writing which is the novel, came to me much more naturally than any other form, because through this I could live through the experience of other people and realize the silent passions burst out in their hearts, what immediate and ultimate sorrows possess them, where they want to go and how they grapple in their ways, with their destinies". 3.

Realistic portrayal of the wretched plight of the struggling and the suffering masses is the forte of Anand in his world of fiction. His fictional world abound with the essential human sympathy. Anand is a veritable humanist and his thorough knowledge of the suffering masses and their helplessness gives him enough space to paint a life of the deprived and unprivileged with vividness of description. None of the contemporary writers of fiction produced realistic or naturalistic fiction after the manner of a Balzac or Kafka or Zola. It was Anand's aim to stray lower still then even Sharat Chandra or Premchand, to show to the west that there was more in the orient then could be inferred from Omar Khayyam or Tagore.

Anand seems to shower his sympathy with the down-trodden, those who are victims of the discriminatory socio-economic situation of colonial India. Anand's novels form a fictional Chronicle in which his eclectic humanism and his humanitarian compassion of the underdog are persistent

themes. Both these themes receive perhaps their best fictional treatment in Anand's most compact novel, Untouchable (1935) where he describes an eventful day in the life young sweeper named Bakha. This particular day brings him his daily torments, humiliations but at the end it also offers three alternative solutions to his problem- the embracing of Christianity as suggested by missionary, social-reform as suggested by Gandhiji and a mechanized sanitation. The novels ends with Bakha thinking of everything he had heard, though he could not understand it all. The problem of caste and poverty, squalor and backwardness, ignorance and superstition, admits of no easy solution.

In his two chronicles-Coolie (1936) and Two leaves and A Bud (1937) Anand turns to the fate of another class of the deprived. Coolie is the pathetic story of Munoo, an orphan from the Kangra hills who leaves home in search of a livelihood.

Munoo's several roles as of a domestic servant, a coolie, a factory worker and rickshaw puller take him to various places from Bombay to Shimla until he meets his tragic doom. The novel is an indignant comment on the tragic denial to a peasant of the fundamental right to happiness. Munoo and many more of his likes deserve deep human sympathy for their being exploited by the evils of industrialism, capitalism, and colonialism.

It is Anand's humanist conviction and humanitarian compassion that have fired his imagination and gives uncomfortable scenes such as Bhakha of Untouchable touching the caste Hindu and playing the penalty, Munno's traumatic realization that he is born to be exploited. The dilemma of the untouchables, whose causes Anand champions, can be beautifully epitomized in Arnold's poetic lines:

"Wavering between two worlds,
one dead, other powerless to be born
With nowhere to rest my head
Like these on earth I wait forlorn".4

Humanism, for Anand, is affirmation of Man, Man not as an ideal construct, an abstraction, but as the sum of his world. It is a humane approach to the human condition that constitutes the quintessence of Anand's artistic acumen and vision. All the novels of Anand depict his human sympathy for the unprivileged and oppressed. It is Anand's earnest human concern for the down and out that projects Anand as a supreme artist and undisputed doyen of Indo-Anglian fiction. In Anand's own words: "I hope I can teach even a few people of my generation that tenderness is our asset". This statement is self-explanatory to prove that Anand is replete with tender, compassionate feelings for humans without partiality of any sort.

REFERENCES :

1. Rousseau, Jacques: Social contract
2. Anand ,Mulk Raj: Apology for Heroism (Bombay Kutub popular , 1957 pg.79)
3. Anand, MulkRaj : Apology for Heroism 1946 pg. 138.
4. Arnold, Matthew: Stanzas from the Grand Chartreuse.

Dr. BHABANI BHATTACHAARYA AS A NOVELIST

KAMRUDDIN MIYAN

Dr. Bhabani Bhattacharya is one of the greatest Indo-Anglian novelists of the present times. He has attained world-wide renown and his books have appeared in twenty-six languages, sixteen of which are European .He has won the coveted Sahitya Academy Award for 1967 for his latest novel 'Shadow from Ladakh'which is a deserving and deserved honour done to the genius of Bhattacharya Speaking of the award,he remarks: "It is good to be known abroad, Even so, I must confess that I would like to be known to my countrymen too.The award redresses a balance. So far I have been better known in the U.S.and Europe than in my own country," It is a pity that Indians recognize the worth of Indian writers only after due recognition from the west. It has been our tradition to recognize talent only after it is vociferously applauded in other countries.

All the novels of Bhattacharya present a true picture of India and its teeming millions surging with life and substance. He does not believe in the dictum of art for art's sake .All writing for him has social purpose.His outlook is highly constructive and purposeful.Smt. Lila Ray writes, "As we read his writing we hear the dialogue between man and his situation, between man and ideas he lives by."

It is a strange coincidence to be a Bengali, born in Bhagalpur,a town in Bihar, writing in an alien language and living in Maharashtra (Godhuli', Nagpur) He is a doctorate from London University on historical research.He has worked for several years as press attaché to the Indian Embassy in Washington. Writing is his first love and full-time career.He has been ispired in his literary pursuits by wife, Salila, who is herself a short-story writer, He has recently joined the research centre of the University of Haweli.

His works include Tagore's traslations entiled "The Golden Boat", "Indian Cavalcade",a collection of historical sketches, "Towards Universal Man" a commemoration volume published on the eve of the birth centenary of Tagore, "Steel-Hawk" a collection of fifteen short stories , 'Gandhi,the writer:His image as it grew', a highly stimulating and provocative study released on the occasion of the birth centenary of Mahatma Gandhi and five novels- "So Many Hungers" (1947), "Music for Mohini"(1952), "He who rides a Tiger"(1954), "A Goddess named Gold"(1960) and "Shadow from Ladakh"(1967).He is at present working on another political subject-the impact of China over Asia.It will be continuation of his 'Shadow from Ladakh' in theme and treatment.

His wide range of experience in and around the world and his close

association with men,manners and their personalaties have enabled him to grasp the innate significance of humanity and all this finds expression in the characters of his novels and short-stories,carved out with a pen that never wavers.The reader lives with the character of the stories and marvel at the author's keen observation of the day-to-day incident of life.Bhattacharya informal behaviour of the people,their rustic world and their small and simple viewsabput the great things that take place around them. He holds the view that "Indian writing in English has been a decisive factor in redressing the balance of false presentation by foreign story-teller who with their limited possibilities of true experience have seen only the surface of our way of life, failing to reach deeper into our spirit.

His earlier novels have their root in rural Vidarbha.He remains an unequalled master in interpreting rural Indian. Particularly in the novel 'A Goddess named Gold' the worlds of fable and reality that delve deep in the minds of our rural folk are skilfully and artistically blended. It contains,lise his other novel 'He who rides a tiger', some superb description of rural folk. Sudhakar Joshi feels, "His novels have a penetrating and sympathetic analysis of the simple but unsurmountable problems in Indian life. His themes generally revolve round poverty, hungrer, pestilence, traditionalism, caste, Indian's strugglea gainst poverty,industrialization and the resulting controversy of Gandhian panacca versus rapid industrialisation ," In an interview with Joshi,Bhattacharya replies, "Most of my characters have shaped themselves from the real earth. The end of the story in my case is never the one in which I had in my mind in the beginning. Even the original plan itself gets modified due to certain which my characters develop during the course of events"

L.N. Gupta writes; "Pure intellectuals watch the crowds but do not force themselves on them. They visit slums and absorb the misery of their dwellers in their being. They tour the famine-stricken areas. They look into the shriveled faces and sunken eyes of the sufferer. They share their distress. But they do not use amplifiers to blare their benefaction. They suffer quietly. The process involves a cycle of seething tensions. The end product is a major work,say a great novel in the case of a fiction writer. It is a monument to it's times. Such is the case with Bhabani Bhatacharya."

Dr. C. Paul verghese rightly remarks that "Food is the primary requisite of human dignity: hunger debases and dehumanizes man. That is why hunger is the theme of a large nimber of Indo-Anglian novels.Bhattacharya has dealt quite forcefully with the theme of hunger and the concomitant theme of human degradation in the his novels ' So Many Hunger' and 'He who rides a Tiger"

The Bengali femine which had so devastatingly swept his own orovince,Bengal,in 1943,was the background to his first novel 'So Many Hunger', He was so profoundly moved by the famine that he wrote it piecing the story together from newspaper clipping. It was published in 1947 and

became a best seller in various translation.L. N. Gupta states, " It was a terrible indictment of the British Raj for all their crimes which aggregated into the disastrous famine of Bengali in 1943."

It was a man made famine that took a toll of too million innocent men,women and children. The story centres round the Basu family,the peasant family,the girl Kajoli, her mothet and her brother. Samarendra Basu thinks of organising the concern Bengal Rice Limited and the unscrupulous Sir Lakshiminath helps the company extend its branches to every far off corner of the province. It is this man's genius that has so well spread the grease of corruption and stored the accumulated foodgains. The wells of pity seem to have almost dried up and only the jackals and the vultures have been vigorous and jubilant.

Bhattacharya paints the naked horror of it all with a pitiless precision and cumulative detail : Dr. Srinivasa lyengar states, "So many Hungers is no doubt an impeachment of man's inhumanity to man.but it is also a dramatic study of a set of human beings caught in a unique and tragic predicament." The story has been effectively told and the tragic pathos of the real mass-starvation described in the guise of fiction moves the reader deeply. The novel describes as the "Times Literary Supplement" puts it, "afactual and vivid account of one of the most shocking disasters in history."

" His second novel, 'Music for Mohini', deals with caste distinction and poverty. L. N. Gupta remarks, 'Music for Mohini' blows up the citadel of old tradition and superstitions which menace India' progress." Reviewing this novel, The New York Times observed, It blends the story of an attractive girl's marriage with the eternal problems of that caste-ridden land and its divorcement from various kinds of imperial rele. And the main brick-bats are not hurled at Britain.' The Chicago Tribune showered its praise on this novel by stating that "India as presented by Rudyard Kipling Rabindranath Tagore and others has become to us a multiple image. Now these diverse pictures are brought into focus by a native son. In a splendid novel that may rank with Pearl Buck's 'The Good Earth,' Bhabani Bhattacharya gives us modern India."

In this novel, a young girl of seventeen is married in the traditional manner after observing the auspicious sign and comparing the horoscope. Mohini goes to her new home. Jaydev the quiet scholar who lives in his ancestral village.and Mohini,the young city-bred wife of his, adapts herself very well to her new environment, are the two forces that put the village on the path of progress and modernization. The superstitious old mother of jaydev realises in the end her mistake and reconciles herself to the changing time. The character of Mohini and Jaydev and Heeralal are well drawn with sculpturesque precision and facile expression.

The third novel 'He who rides a tiger' is an attack on both who profited on people's mistery during the famine and those who exploited them as caste tyrants. It is a legend of freedom, a legend to inspire and awaken.

Here he discusses a variation on the theme of hunger. It has a fascinating beginning. The story runs rapidly surging with emotion and agitation. Its sharp and vivid characterization and untained realism make this novel a very interesting one. It is a grim satire on Hindu orthodoxy. Dr. lyenger says, "The tempo of life in Calcutta-the complex of urban vices and urban sophistication, the pressure of mass movements and mass hysteria, the reign of superstition and mumbo jumbo-gives the novel an entire and piquant quality all its own."

This novel is based on an ancient saying "He who rides a tiger cannot dismount." A humble village blacksmith, named Kalo takes his revenge on a rigid, caste-ridden society and makes a living for himself and his daughter by faking a miracle that begings as a fraud and ends as a legend-and passing himself off as a Brahmin priest. The story end with a note of triumph for the soul over flesh. Eventually, when the fraud is detected,other low caste people hail him as their brother. Reviewing this novel, Orville Prescott of The New York Times says, "He who Rides A Tiger is a skilful and entertaining and an illuminating fictional glimpse inside the corner of India. Bhattacharya writes of Indians and the social,cultural and religious world in which they live with an authority and understanding that no Western writer can hope to match."

Meera's grandfather, a wandering minstrel, gives her an amulet and tells her that it will acquire the power to turn the base metals into gold, if she does an act of real kindness She rescues a child. Seth Samsunderji seeks to profit out of India's new found freedom and enters into a business deal with Meera on a fifty-fifty basis. Meera gets disgusted with it finally and throws the amulet into the river. The minstrel return soon and explain that freedom is the real touchstone.

Bhattachrya's latest novel 'Shadow from Ladakh' tells an extremely gripping story of unsurpassed drama on a broad and revealing canvas. It tells what India needs for survival-a meeting point between Gandhian social ethics and tremendous forces of science and technology. It deals with India's conflict with China and her response to the challenge. The theme present a considerable amount of truth of a politically conscious Indian family.

It provides an insight into the contrasting contemporary life of India symboliised by Satyajit who regards Indian village life as the ideal life and by the westernized American trained Bhaskar the forward-looking Chief Engineer in a steel plant,who feels India' future lies in industrialisation, ends on a week note of coexistences of these two ideologies, Bhaskar wants to dispossess Gandhigram, because it is a hindrance to India's industrialisation. He brings every pressure to bear,but to his surprise,the community of the believers in non-violence stands firm under its great leader Satyajit, and he himself falls in love with Satyajit's daughter, Sunita, a bare-foot white-saried girl..."

Dr. Bhabani Bhattacharya, in his novel, present various kinds of hunger:hunger for food, hunger for wealth, hunger for power,hunger for sex etc.

We can end with what Dr. C. Paul Verghese rightly feels -"Bhattacharya has the vision of a welfare society and his concerns are clear and unambiguous; they are political, economic and social. In other words, the dignity of man both in national and international contexts is uppermost in his mind. In this he follows thr tradition of European social realism as does Mulk Raj Anaand for his art is always the communication of certain social and political ideals and the artistic form,the means of winning over his readers to his views. But the lack of depth in his treatment of problems in human relations is a weakness of his art."

REFERENCES :

1. BHAKHTIYAR, IQBAL. The novel in modern India : Symposium,with a general survey by K.R. Srinivasa Iyenger (1964}

2. CHATTERJI. SUNITI KUMAR. The languages and literature of modern India (1963)

3. FRAZER. R.W. Literary History of India (1998)

4. GORAK. V.K. (Ed) The Literature in the India languages (1954)

5. GUPTA RAMESHWAR (Ed) The Banasthali Patrika: Two Special Numbers on Indo-Anglian Literature (1969)

6. SANTHANAM. K. (Ed) An Anthology of Indian Literature (1970)

7. NARSIMHAN.C.D. (Ed) Indian Literature of past fifty years (1970)

ENVIRONMENTAL AWARENESS IN CLASSICAL SANSKRIT LITERATURE

RAJEEV PRADHAN

India is a land of rich classical heritage. It is a land of many great thinkers and writers. Sanskrit is one of the ancient languages of the world and also known as the mother of many languages. The collection of literature in Sanskrit is priceless and its contribution to preserve and promote the Indian-ness is remarkable. Its contribution to Philosophy, Psychology, Literature and almost all other discipline is irrefutable. It is a perennial river of knowledge catering to a variety of situation leading to the creation of an ideal society.

The world today is facing a serious problem of Environmental pollution. The pressure of increasing population, growth of industries, urbanization, energy intensive life style, loss of forest cover, lack of environmental awareness, untreated effluent discharge from industries and municipalities, use of non-biodegradable pesticides/fungicides/ herbicides/insecticides, use of chemical fertilizers instead of organic manures, etc are causing pollution. The pollution which disturbs ecological balance is called Environmental pollution. The classical Sanskrit literature can contribute and help tremendously for the protection of environment.

In the recent days, environmental science and ecology are treated as a discipline of modern science under which the study of environment and its constituents are done with minute details. As a modern science, environmental science is established in the 20th century but its origin can be seen long back in the Vedic and ancient Sanskrit literature. The concepts of environment differ from age to age because it depends upon the condition prevalent at that particular time. The Environment Protection Act, 1986 defines environment as which includes water, air and land and the inter-relationship which exists among and between water, air, land and human beings, other living creatures, plants and micro-organism. It is clear from above definition that environment consists of two components, biotic (living organism) and abiotic (non-living materials). The living organism can be grouped into three types as those living mainly on the land, in water and in air. The non-living materials of the environment are land, air, water etc.

In the modern Sanskrit, the word Paryavarana is used for the environment, meaning which is all around in our surroundings. But in the Atharvaveda words Vritavrita, Abhivarah, Avritah, Parivrita etc. are used for the environment. Vedic view on environment is well defined in one verse of the Atharvaveda, referred as Chandamsi meaning covering available everywhere; therefore utilize wisely the three elements which are varied, visible and full of qualities. These are water, air and plants or herbs. It

proves the knowledge of Vedic seers about the basic elements of the environment because water, air and plants exist in the world from the very beginning.

According to a theory established in the Upanishads the world constitutes from the five elements- Earth, Water, Air, Fire and Sky. Of these, the three elements, Earth, Water and Air are prone to pollution, while the rest remain unaffected. The nature has maintained a status of balance between and among these constituents and living creatures. A disturbance in percentage of any constituent of the environment beyond the certain limits disturbs the natural balance and as a result of that causes a lot of problems to the living creatures in the universe. Different constituents of the environment exist with a set of relationship with one another. The relationship of human being with environment is very natural as he cannot live without it. From the very beginning of creation a man wants to know about it for self protection and benefit. In the olden days man used to live harmoniously with the nature. He even treated the forces of nature as divine beings like Agni Deva, Varuna Deva, Vayu Deva etc. and glorified their existence and prayed for their intervention in nature's fury. But in the modern age man indulge in the over-exploitation of nature's bounties and began polluting natural elements in the name of development and modernization.

As the present generation is a nexus between the past and the future generation, it is a duty of mankind to leave a good legacy to posterity. If the attitude of the modern man continues to be the same, the survival of humanity itself will become a big question. Therefore development should be healthy and at an affordable cost and it should not create obstacle in the healthy and prosperous development of future generation. So, in order to achieve sustainable development, one should give up one's greed and learn to live in peace with the nature. This is how our ancestors, even in the vedic times learned to live. Veda, the very first book of mankind is considered to be the greatest treatise on the environment teaches a healthy relationship between man and the nature. This relationship should be as sacrosanct as between mother and child. The earth was looked upon as a universal mother whereas all the living beings are treated as her children. In Vedic times rituals were encouraged and performed with a view to keep the environment pure and perfect. The flora and fauna were considered to be the two important facets of Mother Nature. The Vedas have glorified the greenery and identified with divinity. According to the sastra plantation is a sacred dharma and destruction of trees is a great sin.

All the poets of Sanskrit literature, with no exception are great lovers of nature. They not only loved nature but also identified themselves with it. There are many instances in the Sanskrit literature where poets express their love for flora and fauna. In the 11 canto of raghuvamsa a lion speaks to Dilipa explaining the significance of a tree. Oh, King! The tree which you see yonder is a Devadaru Tree brought up by Siva like his son, his wife

Parvathi nourished it by providing pots of water as she nourished her own son Kumaraswamy with her breast milk. It established that there was a motherly affection towards the trees in the ancient time. In the Kumarasambhavam, Kalidasa went a step further by saying that even a poisonous tree should not be cut down by the person who raised it. Similarly the sage Kanva, while sending Shakuntala to her husband's house, reminds the tree about the service rendered by her to them and seeks permission from each for her departure. Our culture went to the extent of saying that no loss of trees under any circumstances should be permitted. Even in extraordinary circumstances the destruction of trees or plants should be compensated for. As an example the loss of plants occurring for a cremation should be replenished by cultivating the same number of saplings by the person who performs the funeral rites. The plantation of trees is highly encouraged in our culture. One should raise big trees which bear fruits. Even if it does not offer fruits it at least gives shade.

Now let us see the other aspect of environment, Air pollution. The Vedic seers knew the importance of air for life. They understood all about air in the atmosphere and also about the air inside the body. The Taittiriya Upanishad throws light on five types of wind inside the body: Prana, Vrana, Apana, Udana and Samano Air resides in the body as life. Concept and significance of air is highlighted in Vedic verses. Rigveda mentions, O Air! You are our father, the protector. Air has medicinal values as medicated air is the physician that annihilates pollution and imparts health and hilarity, life and liveliness to people of the world. Hilly areas are full of medicated air consisted of herbal elements. Another verse describes characteristics of air as soul of all deities. It exists in all as life-breath. It can move everywhere. We cannot see it. Only one can hear its sound. We pray to air God. Ancient Indians, therefore, emphasized that the unpolluted, pure air is source of good health, happiness and long life.

It is clear that classical Sanskrit literature teaches us to live in harmony with environment is not merely physical but is far wider and much comprehensive. From times immemorial the bond between man and nature has been extremely strong. Now it is our responsibility to maintain the equilibrium and see that nature is not disturbed or interfered.

Address of Writers :

1. Dr. Sovana Ghosh, Asst. Prof., Dhrubachand Halder College, Barasat, South 24 Parganas, W.B.
2. Saugata Mukhopadhyay, Asst. Teacher., Bolpore, Birbhum, W.B.
3. Dr. Sharmila Banerjee, Asst. Prof., S. S. L. N. T. Mahila Mahavidyalaya, Dhanbad, Jharkhand
4. Swapan Kumar Ash, Asst. Prof., Fakirchand College, Diamond Harbar, South 24 Parganas, W.B.
5. Pijush Kanti Adhakari, Asst. Prof., Hazi Desarat College,South 24 Parganas, W.B.
6. Debasish Mallick, Associate Prof., Chandannagar Govt. College. Chandannagar, Hooghly. W.B.
7. Dr. Mistu Samanta, Asst. Prof., Bardwan Raj College, W.B.
8. Dr. Prakash Kumar Maity, Prof. & HOD, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
9. Dr. Uttam Giri, Asst. Prof., Zakir Husain Delhi College, Delhi
10. Soma Mukherjee, Asst. Teacher, North 24 Parganas, W.B.
11. Nashiruddin Purkit, Asst. Prof.(Part time), Jamtala College, South 24 Parganas, W.B.
12. Putul Baidya, Asst. Prof.(Part time), Dhrubachand Halder College, Barasat, South 24 Parganas, W.B.
13. Swaraj Das, Asst. Prof. (Part time), Fakirchand College, Diamond Harbar, South 24 Parganas, W.B.
14. Dr. Jaygopal Mandal, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
15. Suresh Singh Munda, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
16. Dr. Sanjay Kumar Singh, Asst. Prof., P. K. R. M. College, Dhanbad, Jharkhand.
17. Dr. Nilesh Kumar Singh, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
18. Dr. Raju Ram, Asst. Prof., St. Columbas College, Hazaribag, Jharkhand.

19. Dr. Gagan Kumar Pathak, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
20. Vijay Aind, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
21. Mantosh Kr. Pandey, Asst. Prof., P. K. R. M. College, Dhanbad, Jharkhand.
22. Kamruddin Miyan, Asst. Prof., R. S. P. College, Jharia, Dhanbad, Jharkhand.
23. Rajeev Pradhan, Asst. Prof., P. K. R. M. College, Dhanbad, Jharkhand.